KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2001	Place of Publication : ৫৪ সাদার্ন এভিনিউ, কল-২৬
Collection : KLMLGK	Publisher : নীহার গুহ্যরায়
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ১/১ ১/২ ১/৩-৪	Year of Publication : বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৮ // Aug 2001 শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৮ // Dec 2001 কার্তিক-চৈত্র ১৪০৮ // May 2002
	Condition : Brittle Good
Editor : আবদুর রাজ্জাক	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
গবেষণা কেন্দ্র
১৮ আর, টামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বর্ষ ৬১ সংখ্যা ১ বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৮

নাস্তিক শ্রোতার দ্বারা রবীন্দ্রসঙ্গীতের রসাস্বাদন এবং অতৃপ্তি নিয়ে শিবনারায়ণ রায়ের প্রবন্ধ — 'রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নাস্তিক শ্রোতা'।

সুমিতা চক্রবর্তীর সন্দর্ভ — 'ভাষাচিত্র থেকে ভাষা চলচ্চিত্র : অমিয় চক্রবর্তীর নির্মাণ'।

ধারাবাহিক 'আলোছায়ার পথিক' : এবার মহৎ শিল্পী এবং ব্যক্তি-মানুষ রূপে শম্ভু মিত্রের জটিল মনোজগতের খোঁজখবর দিয়েছেন তাপস সেন।

ধারাবাহিক 'বঙ্গসংহার' : জানুয়ারি ১৯৫০, বরিশালে হিন্দুহত্যা, প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম নিধন, পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে বিধান রায়ের মতান্তর — এবার এসবেরই তথ্যসমৃদ্ধ কাহিনি শুনিয়েছেন সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত।

সদ্যপ্রয়াত অমিয়ভূষণ মজুমদার প্রসঙ্গ : তাঁর আখ্যান সমূহের উৎসমূল ও বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন বিজিতকুমার দত্ত।

'আশাপূর্ণার ছোটগল্প : মেয়েদের আত্মদর্শনের দর্পণ' — সুচিত্রা সেনের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ।

'ছকের বাইরে খোপের বাইরে : ইলিয়াসের গল্পসমগ্র' — মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গদ্যশৈলী ও সাহিত্য ভাবনা নিয়ে অর্পণ মিত্রের নিবন্ধ।

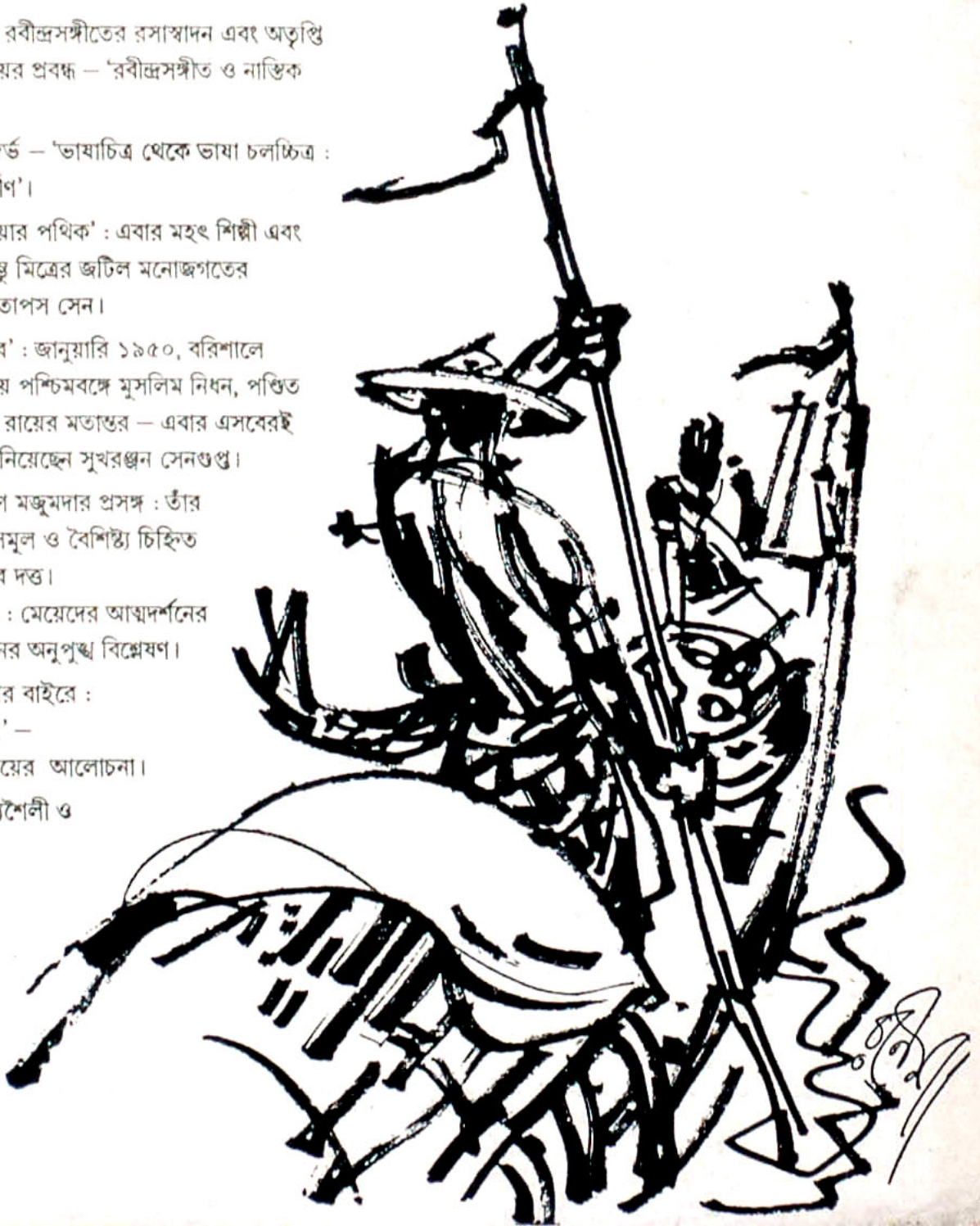

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সারস্বত কেন্দ্র

নজরুল জন্মশতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির শ্রদ্ধার্ঘ্য

কাজী নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র

৫ খণ্ডে গ্রাহকমূল্য ৬০০ টাকা

অবিলম্বে গ্রাহক হোন

প্রথম খণ্ড ডিসেম্বরের শেষে প্রকাশিত হবে·

গ্রাহক হওয়ার সময়সীমা

১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর ২০০০

সম্প্রতি প্রকাশিত

কাজী নজরুল ইসলাম

জন্মশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ

প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটিতে বিশিষ্টসাহিত্যিক ও গবেষকদের স্মৃতিকথা ও মূল্যায়নধর্মী ১২১টি রচনা এবং নজরুলকে নিবেদিত বহু লেখা সংকলিত মূল্য : ২৫০ টাকা।

নজরুল জীবনী ১৮০

ড. অরুণকুমার বসু

শুদ্ধ বাংলা

শিখতে গেলে পাশে রাখুন

আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান

২য় সং প্রকাশিত ১৬০

আকাদেমি বানান অভিধান ৭০

পরিভাষা প্রশাসন (৩য় সং) ২৫

বাংলা বানানবিধি (৩য় সং) ৫

পাঁওত্যালি-বাংলা সমশব্দ অভিধান ১০০

ক্ষুদিরাম দাস

সাহিত্যের শব্দার্থকোশ ৪০

সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাষাতত্ত্বের পরিভাষা ১৮

সুভাষ ভট্টাচার্য

এছাড়াও বাংলা আকাদেমি বইঘরগুলি থেকে পাবেন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, নাট্য আকাদেমি, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, রাজ্য চারুকলা পর্ষদ, নন্দন, রবীন্দ্র সদন, গণমাধ্যম কেন্দ্র, উচ্চশিক্ষা বিভাগ, প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, যুবকল্যাণ বিভাগ এবং তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের বিতরণ শাখা প্রকাশিত সব বই ও পত্রপত্রিকা পাওয়া যায়

ব্যবসায়িক যোগাযোগ : আকাদেমি ভবন (রবীন্দ্রসদন-নন্দন চত্বর) কল-২০, আকাদেমি ভাণ্ডার, ফুলবাগান মোড় কল-১০ফোন : ২৩৩-৯৯৭৮,১৯৮৫,৩৫৩-০৪০৭, ফ্যাক্স : ২২৩-০৯৪৬
ই-মেল : bakademi@vsnl.com

স্মারক নং ৩০৬৪/২০০১/তথ্য ও সংস্কৃতি

বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৮
বর্ষ ৬১ সংখ্যা ১

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০

প্রবন্ধ

❖ "কাঁদন-হাসির আলোছায়া সারা অলসবেলা" ঃ রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নাস্তিক শ্রোতা — শিবনারায়ণ রায় — ৯

❖ ভাষা-চিত্র থেকে ভাষা-চলচ্চিত্র : অমিয় চক্রবর্তীর নির্মাণ — সুমিতা চক্রবর্তী — ১৫

কবিতা

❖ স্বর্গ — অর্ধেন্দু চক্রবর্তী — ২৫

❖ মোহিনী ফণা ও উজ্জ্বল রমণী — বেণু দত্তরায় — ২৬

❖ ঘনিষ্ঠ লোকায়তে — তুলসী মুখোপাধ্যায় — ২৭

❖ নতুন, পুরনো — সুজিত সরকার — ২৮

❖ শব্দকথা — পঙ্কজ সাহা — ২৯

❖ জলের ভেতর — আশিস গিরি — ৩০

❖ সাঁকো পেরিয়ে — অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায় — ৩১

❖ চাকরিমঙ্গলকাব্য — মেঘ মুখোপাধ্যায় — ৩২

ধারাবাহিক আত্মকথা

❖ আলোছায়ার পথিক — তাপস সেন — ৩৩

ছোটগল্প

❖ নদীবালার পোকারা — হেদায়েতুল্লাহ — ৩৮

❖ প্রভু ভৃত্য — কুমার রাণা — ৪১

ধারাবাহিক সম্বর্ত

❖ বঙ্গসংহার এবং — সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত — ৪৬

প্রবন্ধ

❖ অমিয়ভূষণের আখ্যানের উৎস-সন্ধানে — বিজিতকুমার দত্ত — ৫৫

❖ সুধীন্দ্রনাথের গদ্যশৈলী ও সাহিত্যভাবনা — অর্পণ মিত্র — ৬০

❖ আশাপূর্ণার ছোটগল্প : মেয়েদের আত্মদর্শনের দর্পণ — সুচিত্রা সেন — ৬৪

গ্রন্থসমালোচনামূলক নিবন্ধ — ৭৩

❖ ছকের বাইরে খোঁপের বাইরে : ইলিয়াসের গল্পসমগ্র — মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থসমালোচনা — ৭৬

❖ সুরজিৎ দাশগুপ্ত ❖ দিলীপ মুস্তাফী ❖ মুকুল গুহ ❖ ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
❖ রণেন্দ্রনাথ দেব ❖ অভিজিৎ দত্ত ❖ পার্থ ঘোষ ❖ রুচিরা সেনগুপ্ত
❖ তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায় ❖ শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

❖ **চিঠিপত্র** — ৯৬

মূল্য: ১৫ টাকা
ডাকে: ১৮ টাকা

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক ইম্প্রেশন হাউস, ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা - ৯ থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা – ১৩ থেকে প্রকাশিত

দূরভাষ : ২৩৭-৩৭৭০

শিল্প পরিকল্পনা: রণেন আয়ন দত্ত
অক্ষর বিন্যাসে – নয়া উদ্যোগ, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা – ৬

সম্পাদক : আবদুর রাউফ

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী

বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করছে। উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল অরণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে। অতি ব্যবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই। ফলশ্রুতি হিসাবে এই গৃহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন কলকারখানার বর্জ্যপদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল স্রোতকে রুদ্ধ করা, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে।

কিন্তু আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত?

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা এবং বন্যার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহের বাতাস হয়ে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য এবং এ সমস্তই ঘটছে আমাদের অপরিণামদর্শিতা, লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য।

উন্নয়ণমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হানি না ঘটিয়ে। নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই। প্রস্তুত হতে হবে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই.সি.এ ৩০৬৪/২০০১

"কাঁদন-হাসির আলোছায়া সারা অলসবেলা" ঃ রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নাস্তিক শ্রোতা

শিবনারায়ণ রায়

তিনি প্রয়াত হবার কিছুকাল আগে পর্যন্ত রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যতম মুখ্য ব্যাখ্যাতা দার্শনিক আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে কয়েক দশক ধরে নানা বিষয় নিয়ে আমার আলাপ আলোচনার সৌভাগ্য হয়েছিল। এই আলোচনায় কখনও কখনও উপস্থিত থাকতেন তাঁর মনস্বিনী দয়িতা গৌরী আইয়ুব। আইয়ুব-এর হৃদয় এবং বুদ্ধি রবীন্দ্রসঙ্গীতে পরিপ্লুত ছিল। আইয়ুব-দম্পতি জানতেন আরও অনেকের মতো আমিও বঙ্গীয় রেনেশাঁসের সর্বোত্তম প্রতিভার একজন গভীর অনুরাগী বটে, কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমি তাঁর সমালোচক। আলোচনাসূত্রে নানা প্রসঙ্গের ভিতরে আইয়ুব আমাকে কয়েকবার একটি বিশেষ প্রশ্ন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করেছিলেন। আমি তাঁকে সেই প্রশ্নের উত্তরে সে সময়ে আমার যে বক্তব্যটি বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করি, আমার ধারণা সেটি তাঁকে সম্ভবত তৃপ্ত করেনি। প্রসঙ্গটি নিয়ে আমি আমার অন্য কোনও কোনও প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। এখানে ওই বিষয়টি নিয়ে আরেকবার সংক্ষেপে সামান্য আলোচনার চেষ্টা করব, সময়াভাবে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা সম্ভব হবে না।

প্রশ্নটি ছিল স্রষ্টার জীবনদর্শনের সঙ্গে ভোক্তার জীবনদর্শনের মিল অথবা অমিল শিল্প-সম্ভোগে কতখানি সহায়ক অথবা আদৌ প্রতিবন্ধক। সূচনাতে টি. এস. এলিয়টের বিখ্যাত প্রবন্ধটি ছিল আমাদের আলোচনার নৈর্ব্যক্তিক সূত্র। তবে বেশ কয়েক বার ভাবনার আদানপ্রদানের পরে শেষ অবধি আইয়ুব আমাকে কথাটা এই ভাবে বলেছিলেন, "আমি জানি যে আপনি নাস্তিক, র‍্যাডিক্যাল মানবতন্ত্রী, কিন্তু একই সঙ্গে আপনি শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতে গভীরভাবে অনুরাগী। ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে রবীন্দ্রনাথ যখন গীতবিতানের গানগুলিকে বিন্যস্ত করেন, তাদের একটি খুব বড় অংশকে চিহ্নিত করেছিলেন পূজা নামে। পূজার ভাবটি তাঁর আরও অনেক গানের ভিতরে অনুভব করি। এখন নাস্তিক হলেও সব মিলিয়ে আপনি নিজে রবীন্দ্রসঙ্গীতে কীভাবে সাড়া দেন? আপনার সুদৃঢ় জীবনদর্শন কি ওই সঙ্গীত উপভোগে কোনও দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করে?"

প্রশ্নের উত্তরে আমি যে কথাটি তাঁকে বলেছিলাম সেটি ছিল মোটামুটি এই — "রবীন্দ্রনাথের অনেক গানই আমার চেতনায় দীর্ঘস্থায়ী অনুরণন তোলে, কিন্তু সব গান নয়। বস্তুত গীতবিতানে সংকলিত বহু গানই আমাকে স্পর্শ করে না, এমনকী কিছু গান আমার চিত্তকে বিমুখ করে।" কেন এমনটা হয় সেটা স্পষ্ট করার জন্য আমাকে আইয়ুবের সঙ্গে কয়েক বার আলোচনায় বসতে হয়েছিল। এখানে সে জন্য অতি সংক্ষেপে কয়েকটি গোড়ার কথা উল্লেখ করা দরকার।

।। দুই ।।

বিভিন্ন শিল্প নিয়ে যাঁরা চর্চা করেছেন তাঁদের ভিতরে অনেকেই স্বীকার করেন যে মানুষের সৃজনসামর্থ্যের বিশুদ্ধতম প্রকাশ ঘটে সঙ্গীতে, কারণ সঙ্গীতের মর্মার্থ ও আবেদন স্বয়ংসম্পূর্ণ, তার জন্য সঙ্গীতের বাইরে অন্যত্র অর্থ সন্ধানের প্রয়োজন পড়ে না। কবিরা কখনও কখনও তাঁদের কবিতায় সঙ্গীতের এই বিশুদ্ধ আত্মসিদ্ধি অর্জনের সাধনা করেন বটে (যেমন ব্যর্থ প্রযত্নে মালার্মে করেছিলেন), কিন্তু তা নিষ্ফল হতে বাধ্য, কারণ কবিতা ভাষা নির্ভর, এবং ভাষা অভিধাসূত্রে অপরের বা পরোক্ষের নির্দেশবাহী। সঙ্গীত যেখানে অক্লান্তভাবে ধ্বনির আরোহ অবরোহ, স্বরগ্রাম, সুরতরঙ্গ, তাল মাত্রা ইত্যাদির উপাদানে একটি আত্মসম্পূর্ণ জগৎ সৃষ্টি করে সেখানে সে একেবারেই স্বয়ংসিদ্ধ। রসিক শ্রোতা আপনাকে নিঃশর্তে সেই পরিপূর্ণতার আবেদনে সমর্পণ করেন। যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এটি খুবই স্পষ্ট। শ্রোতার বিশ্বাস বা জীবনদর্শন নয়, সূক্ষ্ম এবং অনুশীলিত সুরজ্ঞানই এ ক্ষেত্রে সংবেদনার শর্ত। এ ভাবেই আমরা মোট্‌সার্টের সিম্ফনি, বাখের ব্রান্ডেনবুর্গ কন্‌চের্টো, অথবা বিলাসেৎ খানের সেতারে রাগরাগিণীর আলাপ শুনি।

কিন্তু বিশুদ্ধ যন্ত্রসঙ্গীত ছাড়াও কণ্ঠ-নির্ভর সঙ্গীত, যাকে এ দেশে সাধারণত মার্গসংগীত বা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বা রাগপ্রধান কণ্ঠসঙ্গীত বলা হয়, সেখানে কথার সামান্য স্থান থাকলেও শ্রোতার চেতনা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রকৃতপক্ষে আপ্লুত হয় সুরবিস্তারের প্রবাহে। অপরপক্ষে কণ্ঠনির্ভর সঙ্গীতের একটা বিরাট জগৎ আগাগোড়াই জনজীবনে প্রতিষ্ঠিত ও সম্প্রসারিত যেখানে কথার আবেদন সুরের সমতুল্য, হয়ত-বা অধিকাংশ শ্রোতার মনে কথার আবেদন সুরের চাইতেও প্রবলতর। ভাষার সম্পদকে বাদ দিলে কীর্তন, কাওয়ালি, গজল, মীরার ভজন, বাংলা টপ্পা, রামপ্রসাদী, বাউল গান, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, বিভিন্ন লোকগীতি সবই নিতান্ত দীনসত্ত্ব হয়ে পড়ে। এ সব ক্ষেত্রে গানের রচয়িতা, গায়ক এবং শ্রোতা সকলে ভাষা, স্বর এবং অনেকটা ধ্যানধারণগত ঐক্যের সূত্রে একই অভিজ্ঞতার স্রোতে প্রবাহিত হন।

এখন যে সঙ্গীত বিশুদ্ধ সুরলহরীতে আত্মসম্পূর্ণ সেখানে শ্রোতার জীবনদর্শন বা বিশ্বাসাদি সংবেদনে কোনও বাধাই সৃষ্টি করে না। কিন্তু যে সঙ্গীতে ভাষা সুরের সঙ্গে সমান, অথবা তার চাইতে অধিকতর প্রাধান্য পায় সেখানে রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন "ভাবের অনুষঙ্গ" তাকে স্বতন্ত্র মূল্য না দিয়ে উপায় নেই। যিনি বৈষ্ণব তিনি যে ভাবে কৃষ্ণকীর্তন শ্রবণে ভাববিহ্বল হয়ে ওঠেন, যিনি শাক্ত শ্যামাসঙ্গীত তাঁকে যে ভাবে আপ্লুত করে, যিনি ব্রাহ্ম ব্রহ্মসঙ্গীত তাঁর হৃদয়ে যে ভাবে শান্ত নিবেদনের সঞ্চার ঘটায়, কোনও ইসলামপন্থী বা জুডাপন্থী বা নাস্তিকের মনে এই সব বিভিন্ন সঙ্গীত তুলনীয় অনুরণন না তোলাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও গুটি দুই কথা স্মরণীয়।

প্রথমত, বক্তব্য বাদ দিয়েও সঙ্গীত মাত্রেরই ধ্বনিগত নিজস্ব আবেদন বিদ্যমান। এটি স্পষ্ট হয় যখন উৎকৃষ্ট সুরবিন্যাসে ধৃত অপরিচিত কোনও ভাষার কোনও গান আমরা শুনি। যদিও সে গানে কথা মোটেই অপ্রধান নয় তবু তার বাক্যার্থে প্রবেশ না করেও শুধু তার গীতরসে আমরা সম্পূরিত হয়ে উঠি। এলেন রায়ের সংগ্রহ থেকে শালিয়াপিন এবং কারুসোর গলার অনেক গান শুনেছি ভাষাগত অপরিচয়ের কারণে যাদের অর্থ আমার অজ্ঞাত কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয়ের পথে যারা আমার চেতনাকে আপ্লুত করেছে। দ্বিতীয়ত, সব শিল্পবস্তুরই মুখ্য উপাদান কল্পনা, এবং কল্পনাজাত রূপসম্ভোগের ক্ষেত্রে ভোক্তার বাস্তববোধ এবং বিশ্বাসকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতেই হয়। কাব্য-আলোচনা প্রসঙ্গে এই সূত্রের নির্দেশ করেছিলেন কবি সমালোচক কোলরিজ। 'Suspension of disbelief' অর্থাৎ অবিশ্বাসের সাময়িক নিলম্বন কাব্যসম্ভোগের একটি আবশ্যিক শর্ত। যে ধরনের সঙ্গীতে ভাষার আবেদন কাব্যদেহের মতোই অচ্ছেদ্য সেখানেও এই সূত্র প্রযোজ্য। এ ক্ষেত্রে অবিশ্বাসের নিলম্বন বা স্থগিতায়নে সহায়ক হয় সুরের যাদু। তবে বাক্যার্থের আবেদন যদি এতটাই প্রবল হয় যে সুরের আবেদনকে তা আড়াল করে তখন অন্তত সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই সূত্র আর খাটে না।

।। তিন ।।

এই ভূমিকার পরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথায় আসি। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ধরে দেশি বিদেশি নানা সুরবিন্যাস ও রাগরাগিণী নিয়ে বিচিত্র পরীক্ষা নীরিক্ষা করেছেন বটে, কিন্তু মুখ্যত তিনি কবি। তাঁর নিজের দ্বারা বিন্যস্ত গীতবিতানের প্রামাণিক সংস্করণের ভূমিকায় তিনি স্বয়ং জানিয়েছিলেন যে "সুরের সহযোগিতা না পেলেও পাঠকেরা গীতিকাব্যরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন" (বিজ্ঞাপন ভাদ্র ১৩৪৫)। ফলত তাঁর গানের ভাষাগত সম্পন্নতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধু তাঁর সুরের উপরে ঝোঁক দিলে তাঁর সঙ্গীত অনেকটাই দীনসত্ত্ব হয়ে পড়ে। বাংলাগানের যে বিশিষ্ট ধারাটি থেকে বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালি, রামপ্রসাদী, আগমনী, ভাওয়াইয়া, নানা ধরনের লোকগীতি ইত্যাদির উদ্ভব —ভাষানির্ভর অর্থ ব্যঞ্জনার যে সম্পদ বাংলা গানকে মার্গসংগীত, শাস্ত্রীয় সংগীত, ওস্তাদি গানের ধারা থেকে পৃথক করেছে — রবীন্দ্রসঙ্গীত আসলে সেই ধারারই মহাসমৃদ্ধ শাখা। কালোয়াতের গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের আলাপ, বিস্তার, কর্তক, গিটকিরি বাঙালির কানে একেবারেই অসহ্য।

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনে দু'হাজারের বেশি গান রচনা করেছিলেন। এতে তাঁর অসাধারণ সৃজনপ্রতিভার পরিচয় মেলে।

কিন্তু সম্ভবত গোঁড়া রবীন্দ্রভক্তও দাবি করবেন না যে এদের মধ্যে প্রত্যেকটিই শিল্পকর্ম হিসাবে উতরেছে। রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠেছিল; জীবনের মধ্যভাগে তা পরিপূর্ণ স্বকীয়তা অর্জন করে। যেমন গল্পে, কবিতায়, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে, তেমনই গানের ক্ষেত্রেও এই সময় থেকেই তার পূর্ণবিকশিত রূপ দেখতে পাই। তারপরও চার দশক ধরে তাঁর ধ্যানধারণায় এবং শিল্পকর্মে নানা রূপান্তর ঘটে। গানের ক্ষেত্রেও নানা রকমের পরীক্ষা ও পটপরিবর্তন সঙ্গীতানুরাগী মাত্রই লক্ষ করে থাকবেন। তবে একটা ব্যাপারে বোধ হয় কোনও সংশয়ের অবকাশ নেই — যে গানগুলিতে কথা এবং সুর সম্পূর্ণভাবে একাত্মা হয়ে উঠেছে সেখানে তিনি নিরুপম এবং সেগুলিই তাঁর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত। বিশ্বভারতীর স্বত্বাধিকারকাল সমাপ্ত হয়ে গেলে হয়ত কোনও যথার্থ সঙ্গীতবেত্তা এবং কাব্যরসিক এই শ্রেষ্ঠ গানগুলি নির্বাচন করে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত সংকলন প্রকাশ করবেন। কোন কোন গান সেই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হবে তা নিয়ে সব রসজ্ঞ অবশ্যই এক মত হবেন না। তবে সম্ভবত তাঁরা অনেকেই এ বিষয়ে এক মত হবেন যে রবীন্দ্রনাথের রচিত এমন বহু গান গীতবিতানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ভাষার দিক থেকে যারা দুর্বল, সুরের দিক থেকেও যাদের আবেদন গভীরতা নেই। কিন্তু এদের বাদ দিলেও যে সব গানে কথা এবং সুরের পরিপূর্ণ মিলন ঘটেছে, তাদের সংখ্যাও এত বেশি যে আমাদের সারা জীবন মানস সম্পদে সম্পূরিত করার পক্ষে তারা যথেষ্ট।

আইয়ুবকে বলেছিলাম, অনেক গান আমার মনে অনুরণন তোলে, বহু গান আমাকে স্পর্শ করে না, কিছু গান আমাকে বিমুখ করে। রবীন্দ্রনাথ গীতবিতানে গানগুলির যে ভাবে বিষয়বিন্যাস করেছিলেন তাকে অনুসরণ করে মোটামুটি ভাবে এ কথা বলতে পারি, ওই সংকলনে যে অংশের নাম "আনুষ্ঠানিক" (পৃঃ ৬০৭-৬১৪) এবং শেষ ভাগে "জাতীয় সংগীত" থেকে "পরিশিষ্ট ৪" (পৃঃ ৮১৩-৯৫৫) পর্যন্ত যে অংশ অন্তর্ভুক্ত, তার অধিকাংশ গানেই মহাশিল্পী রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোনও পরিচয় মেলে না। "দুটি হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিল যদি" কিংবা "ঢাকো রে মুখ, চন্দ্রমা, জলদে"— রবীন্দ্রনাথ যে এ ধরনের পদ্যপংক্তিকেও গান বলে চালিয়েছিলেন, বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আদি পর্বের বেশ কিছু গানের ভাষা খুবই দুর্বল, এবং সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুর ভাষার দুর্বলতা দূর করেনি। আসলে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গানের অধিকাংশই "প্রেম" এবং "প্রকৃতি" এই দুটি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। বাছাই করতে গেলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভরে যাবে — সুরের সঙ্গে কথার হরগৌরী মিলনের ফলে রবীন্দ্রনাথের অনেক সেরা কবিতার চাইতেও গভীরভাবে এই সব গান চেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে — জীবনে দুর্লভ আনন্দের ও বেদনার স্বাদ এনে দেয়। ভালবাসার রূপের কি শেষ আছে। সন তারিখ দিয়ে যে প্রিয়াকে চিহ্নিত করা যায় না আমার দুঃখবেদনাকে সেই তো নিশীথিনীসম সৌরভে ভরে তোলে। যে নবযৌবনার হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভেসে যায় তারই জন্য আকুল হয়ে উঠি। যদিও জানি আমার বসন্তের গান সে ভুলে যাবে, তবু যে এ গানের বেদনাতে তার আঁখি ছলছল হয়েছিল, এই তো আমার অনেক পাওয়া। আর যাকে না চাহিলে পাওয়া যায় আঁধার রাতে তো তারই প্রতীক্ষায় জেগে থাকি। আমার তো আর সময় নেই, এবারে সে কি শেষের প্রহর পূর্ণ করে দেবে? আমি যে সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়। এ কি ব্যাকুলতা আকাশে, বাতাসে, এ কি অতল জলের আহ্বান। হায় যখন সকল মুকুল ঝরে গেছে তখন এমন করে কেন এল ডাক! প্রথম যৌবন থেকে আজ বিদায়বেলার সায়াহ্নকাল পর্যন্ত ভালবাসার যে অফুরন্ত ঐশ্বর্য আর বৈচিত্র আমার চেতনায় উদ্‌ঘাটিত হল, রবীন্দ্রনাথের গানই তো ছিল তার সোনার চাবিকাঠি।

আর প্রকৃতি। আধুনিক সভ্যতা প্রকৃতির সঙ্গে নগরবাসী মানুষের নাড়ির বন্ধন ছেদ করে তার জীবনকে বিরস, বিবর্ণ, বিস্বাদ, এই মহাবিশ্বের রূপসমারোহের প্রতি বীতস্পৃহ করে তুলেছে। যেমন খিন্ন, শীর্ণ, ধূমাছিত আমাদের অন্তর্লোক, তেমনই আগ্রাসী লোভ আর নির্দয় শোষণে ব্যাধিগ্রস্ত আমাদের পরিবেশ। রবীন্দ্রনাথ এই নিরাশ্বাস কলকাতা শহরেই জন্মেছিলেন, কিন্তু তাঁর গানের যাদুস্পর্শে তিনি উন্মুক্ত করে দিলেন প্রাণময়, রূপময়, ছন্দময় বিশ্বপ্রকৃতির অফুরন্ত ঐশ্বর্য। "একি আকুলতা ভুবনে! একি চঞ্চলতা পবনে!" অন্তর বিস্ময়ে জেগে উঠল। ঘন কালো কেশ আকুল করে দিয়ে কে এসে দাঁড়াল নবধারা জলে, কার জটার গভীরে রবিকে লুকিয়ে কোন বার্তা ধ্বনিত হল মেঘমন্দ্রারে, হৃদয়ে শুনতে পাই কার ডমরুর গুরু গুরু মন্ত্র। আমাদের প্রতিটি ইন্দ্রিয় সাড়া দিয়ে উঠল ঋতুরঙ্গের অকুণ্ঠ আমন্ত্রণে। রবীন্দ্রনাথের গানের ভিতর দিয়ে শুধু বর্ষাই আমাদের হংসবলাকার পাখায় উড়িয়ে নিয়ে গেল না; প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল গ্রীষ্মের মধ্যদিনের রূপ যখন প্রান্তর প্রান্তের কোণে বসে একাকী রাখালের বেনু বাদন শোনে ধ্যানমগ্ন চোখে রুদ্রদেবতা। বসন্তে তো রঙের ঝরনা হৃদয় সুধায় ভরে, সুরের আবির নাচের আবির হাওয়াকে হানে, কিন্তু নয়ন ঢাকা হেমন্তলক্ষ্মীও যে সোনার ধানে ভরে দেয় ধরার আঁচল, দীপালিকায় আলো জ্বালাবার ডাক দিয়ে যায়। আর ঋতুরঙ্গে শীতও মোটেই অপাংক্তেয় নয়। পাকা ফসলে ভরে ওঠে ডালা; জলে স্থলে বেজে ওঠে জাদুকরের ভেরি, আমলকির ডালে শীতের হাওয়ার নাচন লাগে। আমরা নতুন করে আবিষ্কার

করি বিশ্বপ্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্য, আমাদের অন্তিত্বে সঞ্চারিত হয় রূপময় আনন্দরস। প্রেম এবং প্রকৃতি — রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের কেন্দ্রে তাদের প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। ফলে জগৎকে আমি যেমন গভীরভাবে ভালবাসতে শিখেছি, যে মানবতন্ত্রী জীবনদর্শনে আমি প্রত্যয়ী তাও ক্রমে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে।

কিন্তু সমস্যা সেই গানের সম্ভার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যেগুলিকে পূজা নাম দিয়ে গীতবিতানের প্রথম দিকে স্থান দিয়েছেন। অবশ্য রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগতে পূজা আর প্রেমকে অনেক সময়েই আলাদা করা যায় না। যেহেতু রবীন্দ্রকল্পিত দেবতা কখনও প্রেমিক, কখনও সখা, কখনও সহযাত্রী পথিক, তাদের উদ্দেশ্যে রচিত গানকে পূজা পর্বের সংকীর্ণ বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত করতে আমার বাধে। হয়ত রবীন্দ্রনাথের ভক্তিপুষ্ট চেতনায় দেবতা প্রেমিক হলেও পূজ্য। যেহেতু আমার মনে ভক্তিভাবের নিতান্তই অপ্রতুল, প্রেমিক দেবতা আমার কল্পনায় সহজে প্রতিভাত বটে, কিন্তু পূজ্য দেবতার ক্ষেত্রে আমার অবিশ্বাসের সন্নিবর্তন বা স্থগন প্রায় অসাধ্য। ফলে পূজা পর্বের গানগুলির মধ্যে বেশ কিছু গান আমার চেতনায় অনুরণন তুললেও, এমন অন্য কিছু গানও আছে যা শ্রবণে আমার মন বিমুখ হয়ে ওঠে।

পূজা পর্বে অবশ্য এমন অনেক গান আছে যাতে না পূজার না প্রার্থনার কোনও আভাস পাই, যা জগতের সঙ্গে গীতকারের সুগভীর আত্মীয়তার চেতনা থেকে উৎসারিত। দিশাহারা আকাশভরা সুরের ফুলের দিকে গানের তরী খুলে দেবার জন্য দরকার কি কোনও পূজনীয় দেবতার? যারা আমাদের ভালবাসার ধন তাদের নতুন করে পাব বলেই কি ক্ষণে ক্ষণে হারাই না? একা বসে আপন মনের ছায়াতলে যার নাম নানা ছলে বলি প্রিয় হওয়াই কি তার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাকে কি উপাস্য দেবতা হতেই হবে? যে কমলটি অন্য মনে ফুটেছিল সে তো আমারই হৃদয়উপবনের ফুল। পথ-চাওয়াতেই যার আনন্দ সে তো সারাদিন আঁখি মেলে দুয়ারে একা বসেই খুশি! কি দরকার তার অর্হণা, ভজনার? সবুজ-নীলে সোনায় মিলে সুধা ছড়ানো নদীপারের আষাঢ়ের প্রভাতখানিকে আপন প্রাণে টেনে নেওয়াই তো চরম পরিপূর্ণতা। যে সঙ্গিনীর বরমাল্য পেয়ে আমার অঙ্গ অন্তহীন আনন্দে গড়ে উঠল, ঢেউ-এর ছন্দে, ফুলের গন্ধে, সুরের সোহাগে, রঙের রসধারায় যে আমাকে পরিপূর্ণ করেছে, তাকে পেয়ে আমি ধন্য আর কি প্রার্থনা থাকতে পারে? হায় কোন সে প্রেমিক যার পায়ের চিহ্ন আমার ভাঙা পথের রাঙা ধুলায় পড়ে আছে — কখন সে এসে চলে গেল আমি টের পাইনি। কেনই বা আকাশ ভরে এত গান যদি প্রেম দিলে না প্রাণে?

এই সব অথবা এই ধরনের আশ্চর্য সব গান যখন শুনি তখন মনের ভিতরে কোনও বাধাই তো টের পাই না। এমনকী এমন কিছু পূজা পর্বের গানও আছে যেখানে গীতকারের ধর্মচেতনা খুবই প্রত্যক্ষ কিন্তু যেখানে ভাষা এবং সুরের নিখুঁত মিল অবিশ্বাসকে স্তব্ধ করে রাখে। "তুমি যে সুরের আগুন", "আলোকের ঝর্ণাধারায়", "শ্রাবণের ধারার মতো", "সকল জনমভরে", "যখন তুমি বাঁধছিলে তার", "আমার মুক্তি আলোয় আলোয়", "একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে", "এই তো তোমার আলোক ধেনু", "ওই মরণের সাগরপারে চুপে চুপে", " তোমার খোলা হাওয়া", "আমার পথে পথে পাথর ছড়ানো", "মধুর তোমার শেষ যে না পাই", তালিকা আরও বড় করা যেত — কিন্তু আসল কথা এই সব প্রতিটি গান শুধু ভাব এবং সুরের সার্থক মিলনেরয় তারই সঙ্গে চিত্রলতার বৈভবে যা কল্পিত তাকে প্রত্যক্ষ করে তোলে। সংশয়ের অবকাশ রাখে না।

কিন্তু পূজা পর্বের অনেক কবিতাই এভাবে সমৃদ্ধ নয়। কোথাও ভাষার দুর্বলতা কোথাও সুরের সঙ্গে ভাবের অসঙ্গতি, এবং আমার দিক থেকে যেটি সব চাইতে প্রধান আপত্তি, কোথাও পূজা, প্রার্থনা অথবা কর্তব্য নির্দেশের প্রাবল্য গানের আবেদনকে স্পষ্টতই ব্যাহত করেছে। কয়েকটি উদাহরণ দিই। "আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে", "তাপহরণ তোমার চরণ অসীমশরণ দীনজনার", "তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ", "তুমি বন্ধু, তুমি নাথ", "অন্ধজনে দেহ আলো", "পদপ্রান্তে রাখ সেবকে", "হৃদয়নন্দন বনে", "আনন্দ তুমি স্বামী, মঙ্গল তুমি", " কে যায় অমৃতধামযাত্রী", "পাঁড়াও মম অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডমাঝে", "জাগো নির্মল নেত্রে রাত্রির পরপারে", "মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্তদ্বারে", "তুমি আমাদের পিতা", "প্রেমানন্দে রাখো পূর্ণ", "স্বামী তুমি এসো আজ", "চিরবন্ধু চিরনির্ভর চিরশান্তি", "আমি দীন, অতি দীন", "জয় জয় পরমা নিস্কৃতি হে", "হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই", "বরিষ ধরামাঝে শান্তির বারি", "নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা", "অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী", "বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা" — তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই -- আমার অনুমান পূজা পর্বের এই জাতীয় গানগুলি রবীন্দ্রপ্রেমিক আইয়ুবকেও সম্ভবত বিব্রত করত। এদের ক্ষেত্রে আমি অন্তত suspension of disbelief - এর স্বপক্ষে কোনও যুক্তি দেখি না। বিশ্বাসভিত্তিক বাধা ছাড়াও শিল্পবোধজাত আপত্তিও এ ক্ষেত্রে উপভোগের পথে দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধক।

।। চার ।।

কিন্তু আলোচনায় এখানেই ছেদ টানতে চাই না। আগেই বলেছি রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কবি, গানের ক্ষেত্রেও এ কথা সমান ভাবে সত্য। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন তাঁর অন্য সব রচনা যদি

একদিন বিস্মৃত হয় তাহলেও বাঙালি হৃদয়ে তাঁর গানের আসনটি স্থায়ী হবে। শহরে মফস্বলে এখনও পর্যন্ত যেভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের নিত্য নূতন গায়ক-গায়িকার উদ্ভব, টেপ রেকর্ড এবং সি.ডি.র প্রসার, রবীন্দ্রপক্ষে অনুষ্ঠান উৎসবের ধুমধাম দেখা যায় তাতে মনে হতে পারে মহাকবির এই প্রত্যাশা হয়ত অসঙ্গত ছিল না। কিন্তু যখন সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করি গ্রামেগঞ্জে, চাষি-জোলা মাঝি-মিস্ত্রির ঘরে অথবা কলকারখানার মজুরদের বস্তিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের শ্রোতা এখনও পর্যন্ত নিতান্তই দুর্লভ, যে শহরে অনুষ্ঠানাদিতেও ফিল্মি সঙ্গীত এবং পপ সঙ্গীতের ঠেলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়ছে, তখন আর কবির প্রত্যাশা সংশয়ার্ধ ঠেকে না।

আসলে রবীন্দ্রসঙ্গীত উপভোগের অবম শর্ত অনুশীলিত কাব্যবোধ, এবং সাহিত্যচর্চা ছাড়া তা গড়ে উঠতে পারে না। সুর এবং ভাবের পূর্ণ মিলনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরাকাষ্ঠা বটে, কিন্তু তাঁর সব সাহিত্যকর্মেরই মুখ্য আবেদন তাঁর ভাষার যাদু। এই যাদুর প্রভাব তার ওপরেই শুধু পড়তে পারে যার অন্তত কিছুটা সাহিত্যরুচি আছে। আবার এ যাদু এমনিতর যে সার্থক অনুবাদে তার রেশ ভাষাগত রূপান্তরেও বেশ কিছুটা রয়ে যায় ' কারণ ভাষার মারফত যে ভাব ও অনুভব অপরগোচর হয় তার উৎস যদিও ব্যক্তিগত তার অর্থগ্রাহ্যতা অনেক ক্ষেত্রেই সর্বজনীন। রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত ইংরেজি রূপান্তরে গীতাঞ্জলি তাই পশ্চিমে বহু পাঠক-পাঠিকার হৃদয় হরণ করেছিল। তাঁরা ভাব ও ভাষার ঐশ্বর্যেই মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাঁদের সে উপভোগে সুরের কোনও অংশ ছিল না। এই আশ্চর্য ঘটনার গূঢ়ার্থ আমার কাছে স্পষ্ট হয় গত বছর লন্ডনে যখন রবীন্দ্রপ্রতিভা বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনায় যোগ দেবার ফলে আমি পুলকিত বিস্ময়ে আবিষ্কার করি যে রবীন্দ্রনাথের বহু গান এবং কবিতার ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় তর্জমার দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়ে লক্ষণীয় সংখ্যক পশ্চিমি সুরকার পশ্চিমি রীতিতেই তাঁদের বেশ কিছু সঙ্গীত রচনা করেছেন। তাঁরা কেউই রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশিষ্ট স্বরলিপি অনুসরণ করেননি। তাঁর বিভিন্ন গানের অন্তর্নিহিত ভাবটিকে আপন আপন অনুভবে তাঁরা গ্রহণ করেছেন এবং বিশুদ্ধ পশ্চিমি রীতিতেই সেই ভাবটিকে তাঁরা সঙ্গীতে রূপ দিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে একটি দুর্লভ অভিজ্ঞতার কথা বলি। বেশ কয়েক বছর আগে স্যান্টা বার্বারায় অধ্যাপনাকালে একটি ডাবল অ্যালবাম লং প্লেয়িং রেকর্ড আবিষ্কার করি। সেটিতে একজন ফরাসি অভিনেত্রী মহাকবি শার্ল ব্যোদলেয়র-এর ল্য ফ্লার দু ম্যাল থেকে কিছু অংশের ইংরেজি অনুবাদ আবৃত্তি করেছেন, আর সে আবৃত্তি শুনে অশ্রুপ্লুত চোখে ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ তার সরোদ যন্ত্রে শুদ্ধ ভারতীয় রীতিতে একটি রাগ রচনা করেছেন। পূব এবং পশ্চিম, কবিতা এবং যন্ত্রসঙ্গীত, দুই মহৎ প্রতিভার এই সার্থক মিলন আমার জীবনে একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

সুর নয় ভাবের সূত্রে রবীন্দ্রসঙ্গীত পশ্চিমের সুরকারদের কতটা অনুপ্রেরিত করেছে তা নিয়ে যাঁরা বিশেষভাবে গবেষণা করেছেন তাঁদের ভিতরে অধ্যাপক রোকুস ডি গ্রুট আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীতভবনের অধ্যক্ষ। একাধারে সঙ্গীতস্রষ্টা ও সুপণ্ডিত, সহৃদয় এবং নিরহঙ্কার এই মানুষটি তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠের শেষে যে নির্মীয়মান তালিকাটি আমাকে দিলেন তা থেকে জানা গেল মুখ্যত গীতাঞ্জলি এবং গার্ডনার-এর ডাচ অনুবাদের ওপরে নির্ভর করে এতাবৎ হল্যান্ডে শতাধিক musical composition রচিত হয়েছে। পূজার চাইতে প্রেমের গানই বেশি — মনে হয় গার্ডনারের ভালবাসার কবিতাগুলি সঙ্গীত স্রষ্টাদের বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। পিয়ানো, ফ্লুট, ভায়োল, ক্লাভিয়েরে, চেলো, হার্প প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যযন্ত্র বিভিন্ন সঙ্গীতে কখনও একত্রে কখনও স্বতন্ত্র ভাবে কেন্দ্রীয় ভাবটিকে রূপ দিতে সাহায্য করে। বিষয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে কোনও গায়ক বা ব্যারিটোন, কোনও গায়িকা বা সোপ্রানো। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবসম্পদ বা কাব্যসৌন্দর্য যে সব ডাচ সুরকারকে রূপ সৃষ্টিতে অনুপ্রেরিত করেছে তাঁদের ভিতরে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য আলেইডুস কোত্সেন (১৮৭৭-১৯৬২), ফ্রে ফোকে (১৯১০-১৯৮৯), বের্থে গেউএর (১৮৮৮-১৯৬৪), হান্স্ শোউবান (১৯২০-১৯৬৭) এবং বের্নার্ড ফান ডেন সিগটেন হোর্স্ট মেইয়ার (১৮৮৮-১৯৫৩)।

একই বিষয় নিয়ে দ্বিতীয় যে বিশেষজ্ঞটি বেশ কিছুকাল ধরে গবেষণা করছেন এ দেশে তিনি একেবারে অপরিচিত নন। কার্লো কোম্পোলা মিশগানে ওকল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভাষা এবং ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক; তুলনামূলক সাহিত্য এবং সংস্কৃতি নিয়েও চর্চা করেছেন। তিনি ওই আন্তর্জাতিক আলোচনাসভায় তাঁর যে নির্মীয়মান তালিকাটি পেশ করলেন তাতে ১৪৭ জন পশ্চিমি সুরকারের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এঁরা সকলেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুবাদের দ্বারা আলোড়িত হয়ে তার ভাব বস্তুরভিত্তিতে পশ্চিমি রীতিতে আপন আপন সঙ্গীতরূপ রচনা করেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর নয়, তার তর্জমাকৃত কাব্যরূপই তাঁদের অনুপ্রেরিত করেছে। এই সুরস্রষ্টাদের মধ্যে আছেন ইতালিয়ান, সুয়েডিশ, পোলিশ, ফরাসি, রাশিয়ান, চেক, জার্মান, পর্তুগিজ, ডাচ, হাঙ্গেরিয়ান, রুমেনিয়ান, সুইস, অস্ট্রিয়ান, মেক্সিক্যান-স্প্যানিশ, ক্যানাডিয়ান, আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান, ইংরেজ অর্থাৎ বস্তুত পশ্চিমে এমন প্রায় কোনও দেশ নেই যেখানে কোনও না কোনও সঙ্গীতকার রবীন্দ্রনাথের গানের কথা থেকে প্রেরণা না পেয়েছেন। প্রত্যেক সুরকারের ক্ষেত্রে তাঁর মাতৃভূমি নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তবে তালিকায় যতটা নির্দেশ আছে তা থেকে জানি এই সুরকারদের

ভিতরে ফরাসিদের সংখ্যা ১৩, ইতালিয়ানদের সংখ্যা ১০, জার্মান ৬, রাশিয়ান ৬, ইংরেজ ১১ এবং আমেরিকান ১১। তালিকাটি স্বীকৃতভাবেই অসমাপ্ত এবং চর্চার কেন্দ্র রতেস্টারে হওয়ার ফলে ইঙ্গমার্কিন প্রতিনিধিত্ব সংখ্যায় কিছুটা ভারি। কিন্তু আসলে যেটা ভরসার কথা সেটা হল যে পশ্চিমবঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভবিষ্যৎ যাই হোক না কেন, ওই সঙ্গীতের বীজ শতাব্দীকাল ধরে বিশ্বের দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, এবং তার যেটি প্রাণকেন্দ্র, তার ভাব ও ভাষা, সেটি দূর দূর দেশে নবনব সঙ্গীতরূপের উদ্ভাবন ঘটিয়ে চলেছে। যদি কখনও সময় এবং সুযোগ ঘটে হয়ত ভবিষ্যতে এই আশ্চর্য বিষয়টি নিয়ে আরেকটু বিশদভাবে আলোচনা করা যাবে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের দ্বারা উদ্বুদ্ধ মৌলিক এই পশ্চিমি কম্পোজিশ্যানগুলির কপি সংগ্রহে বিশ্বভারতীর সঙ্গীতভবন এবং রবীন্দ্রভবন কিছুটা উদ্যোগী হবেন — এটি কি নিতান্তই দুরাশা?

।। পুনশ্চ ।।

এ বছর মে মাসে রবীন্দ্রনাথের উপরে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে পক্ষ কালের জন্য হল্যান্ডে যাই। ওই আলোচনা অনুষ্ঠানে মূল ভাষণ দেবার দায়িত্ব আমার উপরে পড়েছিল। আমার মূল ভাষণটির শিরোনাম ছিল : From the 'Broken Nest' to Visvabharati. অনুষ্ঠানটির মুখ্য উদ্যোক্তা ছিলেন পূর্বোক্ত অধ্যাপক রোকুস ডি গ্রুট। অনুষ্ঠানটির সূচনায় ভারত থেকে নিমন্ত্রিত একটি শিল্পীগোষ্ঠী নির্বাচিত কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। পাঁচদিন ব্যাপী আলোচনার শেষে অধ্যাপক ডি গ্রুটের পরিচালনায় রবিবার ১৩ই মে রাত সাড়ে আটটায় ট্রপিকইনস্টিউট থিয়েটারের প্রধান সঙ্গীতশালায় দু'ঘন্টা ব্যাপী একটি কনসার্ট অনুষ্ঠান হয়। চমৎকৃত হয়ে সকলে শুনি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবের ভিত্তিতে পশ্চিমি রীতিতে কয়েকজন ডাচ সুরকারের রচিত কয়েকটি কম্পোজিশন, এবং ডাচ অনুবাদে কিছু কণ্ঠসংগীত। পিয়ানোয় ছিলেন মারিএন ফান নিউকার্কেন, ফ্লুট এবং অল্টোফ্লুটে হ্যারি স্টারেভেলড, কণ্ঠসঙ্গীতে মেত্জো-সোপ্রানো মারিএকে কোস্টার এবং ব্যরিটোন চালর্স ফান ট্যাসেল। অধিকাংশই প্রেমের গান, ইংরেজি গীতাঞ্জলি এর দ গার্ডনারের ডাচ অনুবাদের ভিত্তিতে রচিত। ডি গ্রুট নিজেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথায় পশ্চিমি রীতিতে সুর দিয়েছেন। সব মিলিয়ে খুবই অভিনব এবং উপভোগ্য অভিজ্ঞতা। শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রসঙ্গীতের দেশকালজয়ী আবেদন ওই দু'ঘন্টায় প্রত্যক্ষীভূত হয়ে উঠল।

প্রবন্ধ

ভাষা-চিত্র থেকে ভাষা-চলচ্চিত্র : অমিয় চক্রবর্তীর নির্মাণ

সুমিতা চক্রবর্তী

আদি যুগের মানুষ শব্দ উচ্চারণ করেছিল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে ধ্বনি-সমবায়ের দ্যোতনায় নির্দিষ্ট করবার প্রয়োজনে। প্রতিটি শব্দই চিহ্নিত করেছে কোনও বস্তু অথবা প্রাণীকে। যেমন জল, পাথর, আকাশ, হরিণ। তখন প্রতিটি শব্দই ছিল মূর্তি-সম্ভব, চিত্র-সম্ভব। কিন্তু তার পরেই অনুভূত হল যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার সামগ্রিকতাকে কেবলই চিত্র-সম্ভব মূর্ততায় ধরা যায় না। চক্ষু এবং ত্বক ছাড়া অপর ইন্দ্রিয়গুলির সংবেদনকেও সাবয়ব রূপে অনুভব করা যায় অথচ সেগুলির ছবি আঁকা যাবে না। তবু শরীরী প্রত্যক্ষতায় অনুভূত হয় বলে ঠাণ্ডা, গরম, মিষ্টি, হাওয়া, সুর — ইত্যাদি অনুভববাচক অভিজ্ঞতার জন্য আবিষ্কৃত হল শব্দ। এই শব্দগুলি থেকে প্রাপ্ত যে দ্যোতনা তাকে ছবিতে ফোটাতে গেলে আশ্রয় নিতে হয় পরোক্ষ চিত্রণের। অর্থাৎ উষ্ণতা বোঝাতে গেলে শরীরে তাঁকে দিতে হবে ঘামের বিন্দু; পাত্রের উপরে তাঁকে দিতে হবে ধোঁয়ার রেখা। স্বাদ কিংবা শ্রুতির সংবেদনাকে সরল ছবিতে এঁকে দেওয়ার কোনও উপায় নেই। কাজেই শব্দের সঙ্গে বস্তুচিত্র যে সর্বদাই সংলগ্ন নয় — এই বোধ মানুষ অধিগত করেছিল ভাষা সৃষ্টির প্রথম যুগেই।

জীবনযাপন কোনও অর্থেই অনড় নয়। নিশ্চলতা প্রাণহীনতার নামান্তর। কাজেই বাঁচার সঙ্গে সচলতা অবিচ্ছিন্ন। তাই ভাষা আবিষ্কারের প্রথম যুগেই মানুষকে ক্রিয়াগুলির নামকরণ করতে হল। হাঁটা, খাওয়া, সাঁতার, শিকার, লড়াই — ইত্যাদি শব্দ আবিষ্কৃত হল যেখানে শব্দটির ক্রিয়া অর্থাৎ গতি (মুভমেন্ট) বোঝাচ্ছে। অতএব ভাষা আবিষ্কারের আদি যুগে আমরা তিন জাতীয় শব্দ পেয়ে যাচ্ছি — নিছক বস্তুবাচক; ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ-সূচক কিন্তু যার বস্তু রূপ নেই; এবং ক্রিয়াত্মক শব্দ যার বস্তুচিত্ররূপ সর্বদাই শব্দটির সঙ্গে লগ্ন থাকে।

সভ্যতার উন্নততর যুগে আরও এক ধরনের শব্দ আবিষ্কৃত হল যেখানে ধ্বনিগ্রাহ্য করতে হল অতীন্দ্রিয় উপলব্ধিকে। যেমন — সুখ, দুঃখ, শান্তি, ভালবাসা, ভক্তি ইত্যাদি। এই শব্দগুলির ক্ষেত্রে কিন্তু একটি কৌতূহল জাগানো বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়। এই শব্দগুলির অনুভব-বলয় অত্যন্ত ব্যক্তিগত হয়ে থাকে। প্রত্যেক মানুষের মনে 'শান্তি' বা 'দুঃখ' ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত স্মৃতি। ফলে সেখানেও অবিচ্ছিন্নভাবে সংলগ্ন হয়ে যায় কোনও-না-কোনও বস্তুচিত্রগুলি। যেমন 'শান্তি' — শব্দটি উচ্চারণ করলে আজকের শিক্ষিত বাঙালির অনেকেরই মনে জেগে উঠবে 'বনলতা সেন' কবিতাগ্রন্থের প্রচ্ছদে আঁকা সত্যজিৎ রায়ের ছবিটি। আবার ভারতের অনেক মানুষের কাছে 'শান্তি' শব্দে চোখের সামনে ভেসে উঠবে এক থালা ভাতের ছবি। আবার যে-শব্দগুলির স্পর্শগ্রাহ্য বস্তুরূপ নেই অথচ ইন্দ্রিয় সংবেদনা-রূপ আছে — যেমন হাওয়া, কান্না, কেকাধ্বনি, গোলাপ-গন্ধ — সেখানেও পরোক্ষভাবে স্মৃতি-মুদ্রিত চিত্ররূপ শ্রোতার মনে জাগবে। 'হাওয়া' বললে আমরা গাছের পাতার নড়াচড়া, উড়ন্ত চুল, কালবৈশাখীর ঝড় অথবা, জীবনানন্দের 'হাওয়ার রাত' কবিতায় যেমন — স্বাতী তারার কোল ঘেঁসে শাদা বকের মতো ভেসে চলা মশারির ছবি দেখতে পাব।

তা হলে দেখছি প্রত্যেকটি শব্দের সঙ্গে কখনও প্রত্যক্ষে, কখনও পরোক্ষে লগ্ন রয়েছে চিত্রধর্ম। আর, অধিকাংশ শব্দের সঙ্গেই মিশে আছে একটি গতির অনুভব। এই পৃথিবী বহু গতিশীল চিত্রের সমবায়। এক বিশাল এবং অন্তহীন চলচ্চিত্র। শেকসপিয়র যেমন বলেছিলেন — জীবন এক চলন্ত নাট্যমঞ্চ।

যে কোনও ভাষাশিল্পে এই চিত্র-গুণ এবং চলচ্চিত্র-গুণ

থাকবেই। সভ্যতা যখন আরও উন্নত হল তখন মানুষের সভ্যতায় দেখা দিল ভাষা, ব্যাকরণ, বিশ্লেষণ, দর্শন, গণিত ইত্যাদি। একান্ত মনন নির্ভর এই চিন্তন-বিষয়গুলি যখন ভাষায় ব্যাখ্যাত ও বিশ্লেষিত হয়েছে তখন ভাষার চিত্রগুণ এবং চলচ্চিত্রগুণ দুইই খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। অথবা বলা যায় ব্যাখ্যার ভাষার প্রধান গুণ চিত্রধর্ম নয়। আবার, ব্যাখ্যার সঙ্গে যদি কেউ উপমা বা দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেন তাহলে আবার চিত্রগুণ অনেকটা ফিরে আসে কবিতার ভাষায়। সুকুমার রায়ের একটি কবিতার অংশ উদ্ধৃত করলে বিষয়টি বোঝা যাবে। যদিও সুকুমার রায় ব্যক্ত করেছেন সকৌতুক পরিহাস, তবু সেই পরিহাসের মধ্য দিয়েও এই সত্যটি ফুটে ওঠে যে, ব্যাখ্যার ভাষা হয় নির্বস্তুক (অ্যাবস্ট্র্যাক্ট্) এবং উপমার ভাষা হয় সাবয়ব। —

বলছিলাম কি, বস্তুপিণ্ড সূক্ষ্ম হতে স্থূলেতে,
অর্থাৎ কিনা লাগ্‌ছে ঠেলা পঞ্চ ভূতের মূলেতে —
গোড়ায় তবে দেখতে হবে কোত্থেকে আর কি ক'রে,
রস জমে এই প্রপঞ্চময় বিশ্বতরুর শিকড়ে।
অর্থাৎ কিনা, এই মনে কর্ রোদ পড়েছে ঘাসেতে,
এই মনে কর্, চাঁদের আলো পড়লো তারি পাশেতে —
(বুঝিয়ে বলা, আবোল তাবোল)

সাহিত্যের ভাষা প্রবলভাবে যৌগতা গুণসম্পন্ন। ভাষার মধ্য দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যায় আকার এবং বর্ণ; শ্রুতি, ঘ্রাণ এবং স্পর্শের অনুভব ভাষার মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত করা যায় পাঠকের চিত্তে। — "রাজবাড়িতে ঐ বাজে ঘণ্টা/ঢং ঢং ঢং" — এই পংক্তিতে শ্রোতার মস্তিষ্কে রাজবাড়ির চিত্র এবং ঘণ্টার ধ্বনি — দুই-ই মুদ্রিত হয়ে যায়। যে কোনও কবিতার ভাষায় থাকবে ব্যাখ্যা-গুণ, চিত্র-গুণ, চলচ্চিত্র-গুণ অর্থাৎ গতির অনুভব এবং অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি। অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যভাষায় চিত্র-গুণ এবং চলচ্চিত্র-গুণের সমন্বয় কীভাবে ঘটেছে তা আমরা পাঠ করবার চেষ্টা করব।

যখনই লিপি আবিষ্কৃত হল মানবসভ্যতায়, তখন প্রথমে চিত্রগুণকে প্রাধান্য দেওয়া হল স্বাভাবিকভাবে। মিশরীয় চিত্রলিপির কথা জানি আমরা সকলেই। ক্রমে চিহ্নগুণ হয়ে উঠল লিপির ধর্ম। আগে গাছ লেখবার জন্য এঁকে দেওয়া হয়েছে গাছের ছবি। পরে বিশেষ কয়েকটি রেখায় নির্মিত বর্ণ সহযোগে পাতার ওপর গাছ লেখা হলেই পাঠকের মনে সেই চিহ্নগুলি সহযোগে গাছের ছবি ভেসে উঠল — গাছ শব্দটি উচ্চারিত না হলেও।

মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হবার পর কবিতায় চিত্রগুণ এবং চলচ্চিত্রগুণকে খানিকটা দেখিয়ে দেওয়াও যেন সম্ভব হল। মুদ্রণের কৌশলে শব্দ যেন চলতে শুরু করল কবির অভিপ্রায়ের ব্যঞ্জনায়। 'ঘোড়া ছুটে যায়' — এই বাক্যটিকে যদি লেখা যায় এইভাবে —

ঘোড়া ছুটে যায়

তা হলে কেবলই বর্ণের বিন্যাসে একটি ছুটন্ত ঘোড়ার ক্রমে দূরে মিলিয়ে যাওয়ার ছবি স্পষ্টতরভাবে ফুটে ওঠে পাঠকের মনের চোখে। মুদ্রিত বর্ণের আকার ক্রমে বড় থেকে ছোট হওয়ায় ঘোড়াটির কাছে থেকে দূরে মিলিয়ে যাওয়ার চলমান দৃশ্য নির্ভুলভাবে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

মুদ্রণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে আরও একটি দিক থেকে কবিতাকে চলচ্চিত্রের কাছাকাছি এনেছে। চলচ্চিত্র নির্মাণের আদিতম ভাবনা-উপাদান হল একটি পশ্চাৎপট — যাকে বলি স্ক্রিন এবং একটি ফ্রেম অর্থাৎ নির্দিষ্ট চতুঃসীমা। একটি মুদ্রিত পৃষ্ঠা পাঠকের সামনে সেই স্ক্রিন আর ফ্রেমকে প্রত্যক্ষ করে দেয়। শ্রুতিবাহিত কবিতা ভেসে যায় সময়ের সীমানাবিহীন অনন্ততায়। এই জন্যই প্রখ্যাত জার্মান শিল্পতত্ত্ববিদ লেসিং স্পষ্ট করে বলেছিলেন সাহিত্য এবং ভাস্কর্য-চিত্রকলা এক জাতীয় শিল্প নয়, তাই তাদের বিচারও এক পদ্ধতিতে হবে না। চিত্রকলা এবং ভাস্কর্য সর্বদাই 'স্থান' অর্থাৎ স্পেস-কে বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহার করে। তাদের প্রথম আবেদন চোখের কাছে। ভাষাশিল্পের মতো তা স্মৃতির সূত্রে এবং অনুভব সূত্রে মানুষের মনে প্রতিভাত হয় না। প্রাথমিক আবেদনের মুহূর্তটি কেটে গেলে অবশ্য সব শিল্পেরই অনুভব হয়ে দাঁড়ায় যৌগ উপলব্ধি। চিত্রদর্শন থেকে মনে আসে সাহিত্য-পাঠের স্মৃতি; সাহিত্য থেকে মনে জাগে ছবি; সঙ্গীতের সুর থেকে মনের মধ্যে বর্ষা, বসন্ত, রাজসভা ইত্যাদি অভিজ্ঞতার উন্মেষ অনুভব করে ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রীরা রাগ রাগিণীর নামকরণ করেছেন।

কবিতার ভাষায় এই চারটি শব্দ-ধর্ম মিশ্রিত থাকবেই। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষতা গুণ, যাকে একটু সরলীকৃত ভাবে চিত্রগুণ বলতে পারি চলচ্চিত্র-গুণ, ব্যাখ্যা-গুণ এবং ব্যঞ্জনা-গুণ। ব্যঞ্জনাগুণকে আমরা বলতে পারি অতীন্দ্রিয়-অনুভব। কবিতায় এই চারটি ধর্মের কোনটি প্রাধান্য পাবে তা নিয়ে কবি এবং কবিতারসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। এই নিয়ে মাঝে মাঝে বিতর্কও বেধে যায়। যেমন 'সোনার তরী' কবিতায় স্পষ্ট ব্যাখ্যাগুণের সন্ধান পাননি বলে অপ্রসন্ন হয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। কবিতাটির অপরূপ চিত্রগুণ এবং চলচ্চিত্র গুণ তাঁকে মুগ্ধ করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ যখন বিদ্যাপতির পদ — "যব গোধূলি সময় বেলি/ধনি মন্দির বাহির ভেলি/নব জলধরে বিজুরি রেহা/দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।" সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন তখন তিনি পদটির দৃশ্য সৌন্দর্যেই প্রধানত মুগ্ধ হন। আবার যখন রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তি অর্জন করে বলরাম দাসের "আধ চরণে আধ চলনে আধ মধুর হাস" — তখন চিত্রগুণ নয় ব্যঞ্জনাগুণের সৌন্দর্যই হয়ে ওঠে পদটির আকর্ষণ। অর্ধেক পদ, অর্ধেক চলা, আর অর্ধেক হাসি — প্রত্যক্ষ অর্থে

এগুলির কোনও দৃশ্য সৌন্দর্য নেই। শিশুর ক্ষুদ্র সুকোমল শরীর, তার টলমল করে চলা এবং শিশুর একান্ত সরল হাসি পদটির বাচ্যরূপের মধ্য দিয়ে শিশুর সৌন্দর্যের যে ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলে তা-ই এই কবিতাটির সম্পদ।

রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' কবিতার প্রথম দুই পংক্তি দেখি —

"ঈশানের পুঞ্জ মেঘ অন্ধ বেগে ধেয়ে চলে আসে
বাধাবন্ধনহারা
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জনছায়া সঞ্চারিয়া —
হানি দীর্ঘধারা।" এই কবিতাংশে

চলচ্চিত্রগুণ প্রত্যক্ষবৎ মূর্ত হয়ে ওঠে। এমনই আর একটি কবিতা 'বলাকা' । গতিশীল ছবির অপূর্ব সমাবেশ।

ব্যাখ্যাগুণ-প্রধান কবিতাও অনেক লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'আমি' কিংবা 'পৃথিবী' স্মরণ করা যেতে পারে। আবার, উপলব্ধি-ব্যঞ্জনা প্রধান কবিতা ও গানের এমন সব পংক্তি আছে তাঁর, মনের পটে যার কোনও চিত্ররূপ ভাসিয়ে তোলা যায় না। — "বাজে করুণ সুরে হায় দূরে/তব চরণতল চুম্বিত পন্থবীণা" — এই পংক্তি আশ্চর্যভাবে চিত্ররূপ-বিহীন। "রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি" — এই পংক্তিও তাই। 'রূপসাগর' সমুদ্র নয়, 'অরূপ রতন' কী তাও দেখতে পাই না কল্পনাকে দূরবিস্তৃত করবার পরও। তবে ভাষা-চিত্রে সাধারণত শব্দের বিভিন্ন গুণের একটা সমন্বয় থাকেই। যে-গুণটি প্রধান হয়ে ওঠে — তার লক্ষণেই কবিতাকে চিহ্নিত করি।

কাব্য-ভাষার চিত্রময়তাকে জোরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ইংল্যান্ডের ইমেজিস্ট বা চিত্রকল্পবাদী কবিরা। তাঁদের সঙ্ঘ গড়ে উঠতে থাকে ১৯০৮ থেকে ১৯১০-এর মধ্যে। ইমেজিস্ট কবিতার যে সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে — তার সঙ্গে যুক্ত ছিল ছয় সূত্র সমন্বিত একটি ইসতাহার। কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে সেই ইসতাহারটি 'ইমেজিস্ট ম্যানিফেস্টো' নামে বিখ্যাত। ম্যানিফেস্টো-র চতুর্থ সূত্রটিতে এই মূর্ততার বিষয়টিকে তাঁরা ব্যক্ত করেছেন। পঞ্চম সূত্রটিও কবিতায় চিত্রময়তা বা মূর্ততা গুণকে স্পষ্ট করেছে। —

4. To present an image (hence the name : Imagist). We are not a school of painters, but we beleive that poetry should render particulars exactly and not deal with vague generalities, however magnificent and sonorous....

5. To produce poetry that is hard and clear, never blurred nor indefinite.

কবিতার ভাষার মধ্য দিয়ে মনে জেগে উঠছে মনোহর ও সম্মোহক চিত্রমালা — এমন অভিজ্ঞতা বহু বিচিত্র রসের কবিতার

পাঠের সাহায্যে পাঠকের হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী', জীবনানন্দের 'বনলতা সেন', সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'অর্কেস্ট্রা'। শব্দ-ছবিকেই চিত্রকল্প বা 'ইমেজ' বলি। কেবলই ছবিতে আবদ্ধ না থেকে সেই চিত্রকল্প অপরাপর ইন্দ্রিয়-সংবেদনাকেও মূর্ত করে। এবং সেই মূর্ততা অস্পষ্ট বা অনির্দেশ্য নয়। পূর্বোক্ত তিনটি কবিতা তিন জাতের। কিন্তু চিত্র পরিস্ফুটনের কাজটি তিনটি কবিতার ভাষাতেই সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যভাষায় এই চিত্রময়তা বিস্ময়কর সৌন্দর্যে মণ্ডিত। ছবির জগতের খুব কাছাকাছি বাস করবার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। শৈশব-বাল্য-কৈশোর কেটেছিল আসামের গৌরীপুরে। একটি সাক্ষাৎকারে বাল্য স্মৃতির প্রসঙ্গে বলেছিলেন — "সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। সবুজ। পাশেই গদাধর নদী, অদূরে বিশাল ব্রহ্মপুত্র। গাছের সারি দেওয়া পথ।"[১] কলেজে পড়তে গিয়েছিলেন আর এক নিসর্গ-সৌন্দর্য-সমৃদ্ধ অঞ্চলে। বাড়খণ্ডের হাজারিবাগে, আইরিশ মিশনারিদের পরিচালিত সেন্ট কোলাম্বাজ কলেজ। এক দিকে হাজারিবাগের ভূ-প্রকৃতি-ছোট ছোট পাহাড়, ঘন সবুজ বনভূমি, বিস্তৃত ঝিল, অন্য দিকে কলেজের গম্ভীর প্রস্তর-স্থাপত্য, সুপরিকল্পিত বাগান, পাথরের দেয়াল বেয়ে উঠে যাওয়া বুগনভিলিয়ার লতায় ফুলের পুঞ্জ পুঞ্জ শোভা।

বি.এ. পাস করবার পরেই তিনি চলে গেলেন শান্তিনিকেতনে। প্রাকৃতিক রূপচ্ছবির আরও নতুন দৃশ্যমালা। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি থাকা। গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী, রামকিঙ্করের চিত্র ও ভাস্কর্যের সংস্পর্শে বসবাস। শিল্পচর্চার এই পরিবেশ শান্তিনিকেতন ছাড়া আর কোথায়ই বা ছিল।

রবীন্দ্রনাথ যখন ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে ইউরোপ গেলেন তখন অমিয় চক্রবর্তী লন্ডনের নিকটবর্তী বার্মিংহাম-এর উডব্রুক-এ সেলি ওক (Selly Oak) কলেজে অতিথি অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সেবারের ইউরোপ যাত্রার একটি উদ্দেশ্য ছিল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে রবার্ট হিবার্ট-এর নামে নির্দিষ্ট ভাষণ দান করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপে তাঁর নিজের ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা। তাঁর প্রথম ছবির প্রদর্শনীটি হয়, ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো-র প্রগাঢ় সহযোগিতায়, ফ্রান্স-এর প্যারিস-এ — গ্যালারি পিগাল (Galaric Pigalle) -এ ২মে তারিখে। তার পর রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে এসে ১১ মে (১৯৩০), ১৩ মে (১৯৩০) তারিখে উডব্রুক-এ অমিয় চক্রবর্তীর অতিথি হলেন। সেখানে থেকেই অমিয় চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন অক্সফোর্ড-এ বক্তৃতা দিতে (১৯,২১ ও ২৬ মে, ১৯৩০)। ফিরে এসে বার্মিংহাম-এর সিটি আর্ট গ্যালারি-তে অমিয় চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে ২ জুন তারিখে তাঁর চিত্র-প্রদর্শনী হয়। দু'দিন পরেই

লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটি-র প্রদর্শনী-কক্ষে ৪ জুন তারিখে হল আর একটি প্রদর্শনী। অমিয় চক্রবর্তী তখন তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। জুলাই মাসের প্রথমে রবীন্দ্রনাথ জার্মানি রওনা হলেন। অমিয় চক্রবর্তী সঙ্গে যাবেন না — এমনই ঠিক ছিল। কিন্তু জাহাজ থেকেই রবীন্দ্রনাথ তারবার্তা পাঠালেন অমিয় চক্রবর্তীকে। জুলাই মাসের ১১ তারিখ ১৯৩০ থেকে ১৯৩১-এর ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই ছিলেন অমিয় চক্রবর্তী। এই সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের দশটি চিত্র-প্রদর্শনী হয়েছিল জার্মানি, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, সোভিয়েত রাশিয়া ও আমেরিকাতে। সর্বত্রই উপস্থিত ছিলেন অমিয় চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথের ছবি ও পাশ্চাত্য চিত্ররসিকদের প্রতিক্রিয়া — সবই দেখলেন অত্যন্ত নিকটে থেকে।

বিদেশ থেকে লেখা কিছু কিছু চিঠিপত্রে সেই অভিজ্ঞতার উল্লেখ আছে। আমরা তাঁর কয়েকটি উক্তি তুলে দিচ্ছি।

১। "বার্লিন, ড্রেসডেন, ম্যুনিক্, এট্টাল, ওবেরআমেরগাউ, ফ্রাঙ্কফুর্ট, ডার্মসটাট, এবং আশে পাশে কত ছবি, কত লোক, কত কি দেখলাম — এখনো শেষের কাছেও আসিনি।" (সোমনাথ মৈত্রকে লেখা চিঠি ; তারিখ ২০ জুলাই ১৯৩০ ; প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ)

২। "এদেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা রবীন্দ্রনাথের ছবিকে শিল্প রাজ্যে একেবারে চরম শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন। বার্লিন, ড্রেসডেন, ম্যুনিক তিন জায়গায় একই সঙ্গে প্রদর্শনী চলেছে। এ দেশের খবরের কাগজ এই ছবির খবরে উপছে পড়চে।" (পূর্বোক্ত, তারিখ ২৬ জুলাই ১৯৩০)

৩। "শনিবার দিন কোপেনহেগেনে রবীন্দ্রনাথের চিত্র-প্রদর্শনী খোলা হবে। এখানে খুব সাড়া পড়ে গেছে — নরওয়ে সুইডেন থেকে দলে দলে লোক রবীন্দ্রনাথকে দেখতে এবং তাঁর বন্ধুতা শুনতে এবং তাঁর ছবির প্রদর্শনীতে যোগ দিতে আসবে। (পূর্বোক্ত, চিঠির তারিখ ৭ অগাস্ট ১৯৩০)

৪। "জার্মানির ন্যাশনাল গ্যালারি রবীন্দ্রনাথের পাঁচখানি ছবি চেয়ে নিল। হৈ চৈ পড়ে গেছে। ডেনমার্কেও ছবির প্রদর্শনী চলেচে। যতদূর সম্ভব সমাদর হচ্ছে।" (পূর্বোক্ত, চিঠির তারিখ ১৯ অগাস্ট ১৯৩০)

এ ভাবেই অমিয় চক্রবর্তীর ছবি দেখার চোখ তৈরি হয়ে গিয়েছিল ১৯৩০ সালে। তখনও ভাল করে তিনি কবিতা লিখতে শুরুই করেননি। তখনই ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়ার সমকালীন চিত্রকলার সঙ্গে আর চিত্র-সমালোচকদের মতামতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়ে গেল। ছবি ঢুকে গেল তাঁর শিল্পী-মনের অভ্যন্তরে। ছবিতে থাকে রেখার সূক্ষ্মতা আর রঙের লেপন ; থাকে আলো-ছায়ার প্রচ্ছায়। অমিয় চক্রবর্তী যখন ছবি দেখতে শিখেছেন তখন ইমপ্রেশনিস্ট ছবির ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে অভ্যস্ত ও গৃহীত হয়ে গেছে। দাদাইস্ট ও সুররিয়েলিস্ট ছবিও তখন স্থান করে নিয়েছে চিত্রকলার ইতিহাসে। কাজেই বাস্তবতা যে শিল্পে অন্যভাবে বিম্বিত হবে, যথাযথ আলোকচিত্রের মতো নয়, এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে তাঁর মনের মধ্যে। এই শৈল্পিক অভিজ্ঞতা যখন তাঁর মনের সঙ্গে মিশে গেল তখনই তাঁর কবিতায় এল ছবির মতোই রঙ আর রেখার সূক্ষ্ম সমন্বয়।

ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পর, বছর দুই শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে ১৯৩৩ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি গবেষণা-বৃত্তি পেয়ে অমিয় চক্রবর্তী ইংল্যান্ডে চলে গেলেন। সেখানেই শুরু হল তাঁর নতুন পর্বের কবিতা লেখা। তা প্রকাশিত হতে শুরু করল বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' (প্রকাশ ১৯৩৫) পত্রিকায় এবং ১৯৩৮-এ প্রকাশিত হল নব পর্বের প্রথম কবিতা-সংকলন 'খসড়া'। তার আগের দুটি পুস্তিকা ('কবিতাবলী' ও 'উপহার') প্রথাসিদ্ধ ধারার অনুবর্তন ; কোনও বৈশিষ্ট্য ছিল না সেগুলিতে।

ইমপ্রেশনিস্ট ল্যান্ডস্কেপের ধরনটিই অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় পরিব্যাপ্ত। পরবর্তী সময়ের দাদাইস্ট (যেখানে উদ্ভটের সমন্বয়ে চমকে দেওয়া হয় দর্শককে) কিংবা ফভিস্ট (যেখানে উদ্দাম বর্ণলেপন বিচলিত করে সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যের বোধকে) ছবির ধরনে অবয়ব-রেখা বা বর্ণের ব্যবহার তেমন চোখে পড়ে না তাঁর লেখায় — যা আমরা জীবনানন্দ (দাদাইস্ট পদ্ধতি) ও বিষ্ণু দে-র (ফভিস্ট পদ্ধতি) কবিতায় কিছু কিছু পাই। অমিয় চক্রবর্তী কোনও ভাবেই চমকে দিতে ভালও বাসতেন না।

তাঁর কবিতায় যেন সরু তুলির টান। নিপুণ ও সযত্ন। তাঁর কবিতায় দৃশ্যের আকার-রেখা নিখুঁত ও সুসমঞ্জস। তাঁর কবিতায় বিচিত্র কিন্তু উজ্জ্বলতায় ও কোমলতায় মেশানো বহু বর্ণের সন্নিবেশ — পাঠককে অনেক সময়েই কেবল ছবি দেখিয়েই মুগ্ধ করে দেয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত —

১। লাল পাতা লতা-লাগা দেয়ালের নীল ফুলে ঘেরা ধূসর পাথর,
দরজা, মধ্যযুগী আধুনিক চূড়া, যৌবন উজ্জ্বল ছেলেমেয়ে
(কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, পারাপার)

বিদেশের এক বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গন। কয়েকটি মাত্র শব্দের সন্নিবেশে চোখের সামনে রঙিন ছবি আঁকা হয়ে যায়। ধূসর পাথরে তৈরি বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহ। দেওয়ালে উঠে গেছে লতানো গাছ। পাতা ও ফুলের রঙ দেখতে পাই। তরুণ ছাত্রছাত্রীদের দেখতে পাই। হর্ম্যচূড়া তৈরি হয়েছে আধুনিক কালে কিন্তু তার আদলটি মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের অনুসরণে গৃহীত। একই সঙ্গে গম্ভীর কিন্তু প্রসন্ন-মেধাবী যৌবনের চারণ-ভূমি — চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

২। এসেছি প্রান্তে উত্তরাখণ্ডের,
বাদাম গাছে শাদা গোলাপি ফুলের ফেনা,
অদূরে নীল গিরিতরঙ্গ, রাওলপিন্ডি।
অদৃশ্য কাশ্মীর দেখা দেয় বুকে —
চেনার গাছ, পাহাড়ে ধাম, শঙ্করগিরি মন্দির,
জাফরানি ক্ষেত এবং রঙিন সূর্যাস্ত।
(উত্তরাপথ : ভারতী, পারাপার)

অক্সফোর্ড থেকে পিএইচ.ডি. উপাধি নিয়ে অমিয় চক্রবর্তী ভারতে ফিরে এলেন এবং অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন।

যদিও বাংলা থেকে অনেক দূরে, তবু লাহোরের নতুন ধরনের নিসর্গ-রূপের আকর্ষণ তাঁকে মুগ্ধ করল। তারই উপলব্ধি এই কবিতাংশে। শাদা, গোলাপি, নীল, জাফরানি, চেনার গাছের উদ্ভাসিত সবুজ আর অস্তায়মান সূর্যের কমলা-হলুদ বর্ণাভায় রঙ উছলে পড়েছে এই ছবিতে। অথচ বর্ণ-সন্নিবেশে আছে কোমলতা। গাছ, পাহাড়, খেত আর পাহাড়ের গায়ের মন্দিরটি মিলে একটি পূর্ণ ছবির সামনেই দাঁড়িয়ে থাকি।

৩। গিয়েছিনু বামিয়ান।
শিলা-কাটা গুহা।
গ্রানিট পাথর-খোদাই মূর্তি আকাশী বুদ্ধ।
হিন্দুকুশের হিমশিখা; নীচে গম্ভীর নীল।
আড় হয়ে লাগে সূর্যের অঙ্গার।
কাছের পাহাড় বাদামি-সবুজ। তলে চষা খেত ;
গাঁয়ের সাঁকোয় বহে গৈরিক নদী।
(বামিয়ান, অভিজ্ঞান বসন্ত)

যে-ছবিটি আমরা এখানে দেখলাম তা এ দেশের নয়। কিন্তু মনের মধ্যে তা এঁকে নিতে কোনও অসুবিধে হল না। পাথর কেটে গড়া সুউচ্চ এই বুদ্ধমূর্তি চূর্ণ হয়ে গেলেও থাকবে ছবিতে আর ছবির মতো এই কবিতায়। থাকবে স্মৃতিতে।

৪। মালতীপাটপুরের স্টেশন
গ্রামের বুকে।
নিঃঝুম ট্রেন দুপুরে থামা:
ওড়ুদেশ।
ডাব ঝোলে গাছে
গুচ্ছ গুচ্ছ ;
সবুজ পুকুর।
কলিঙ্গ মেয়ে কাঁখে শিশু, গায়ে
হলুদ-মাখা।...
জগন্নাথের রাস্তায় ধুলো ;
পাশে ভাঙা ঘরে
পানের দোকান ;
গোরু গাড়ি চলে।
শুকনো ছাগল ছিঁড়ছে ঘাস
ওড়ুদেশ।
(উৎকল, মাটির দেয়াল)

ওড়িশার গ্রামের অভিজ্ঞান-চিহ্নগুলি কবির দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। ডাবের গুচ্ছ, পানের দোকানের উল্লেখও।

৫। পাড়া গৌরীপুর, কাছে লাউখাওয়া বিল —
মেহেদি বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে
পাতকুয়োর পাশে
চুপ করে দেখছি—
তৃপ্তি চারিয়ে যাচ্ছে শান্ত আকাশে
সব শরীর প্রাণের শিরায় ;
রাখাল ঘুমোচ্ছে আরাম ছায়ায়, —
(ভোরের তর্পণ, অনিঃশেষ)

কোনও বিশিষ্ট, চোখে পড়ার মতো উপাদান নেই কবিতায়। কেবল ছবিটিই আছে। বিল, বেড়া, কুয়ো, আকাশ ও ঘুমন্ত রাখাল। কবিতা হয়ে উঠল এতেই।

৬। কাঠ, আপেলের বোঝা, দ্রাক্ষা মদ শস্যভরা ;
পারঘাটে জগজগ শাদা স্টিমারের ফেরি।
ওদিকে আরণ্য মাটি ঢালু ক্ষেতে বড়ো ঘোড়া ;
টুপি-পরা নীল কোর্তা কৃষী
কারো বা পাইপ্ মুখে, শক্ত দেহ —
(দক্ষিণ জার্মানি, পারাপার)

এখানেও দেখি, ছবিতে ইউরোপের খামারকে নির্বাচিত উপকরণে নির্ভুল চিহ্নিত করেন কবি — আপেল, আঙুরের ফসলে, বড়ো ঘোড়ার অবয়বে ; টুপি-কোট পরা, পাইপ টানা কৃষকের রূপ চিত্রণে।

৭। টোমাটোর লাল রস ঝকঝকে ছোট্ট গেলাসে
তারি পাশে শাদা-ফেনা শ্যাম্পেন, হলদে লেসের
জালি কাটা পাত্রে খুদে কেক,
(আন্তর্জাতিক, ঘরে ফেরার দিন)

শব্দে আঁকা নিপুণ স্টিল লাইফ। প্রতিটি পাত্রের আকার, পাত্র-আবরণীর বর্ণনা, রঙ এবং পাত্রের আধেয় খাদ্য ও পানীয়ের সুস্পষ্ট দৃশ্যায়নে ; সেই সঙ্গে সন্নিবেশের সামঞ্জস্যে সৃষ্টি হয়েছে একটি সমগ্র নান্দনিক রূপ।

ভাষা-চিত্র অঙ্কনের সময়ে সরু রেখার সুস্পষ্ট ও তরঙ্গায়িত টানে আকার-রেখাটি ফুটিয়ে তুলে — মধ্যবর্তী অংশ সামঞ্জস্যময় উজ্জ্বল-কোমল বর্ণলেপনে ভরাট করে দেবার পদ্ধতিতে অমিয় চক্রবর্তী অনেক সময়েই কবিতা লেখেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের 'কাঙড়া' চিত্রমালার অঙ্কন-পদ্ধতির সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এই রীতির। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত প্রায় আড়াইশো বছর ধরে, পুথিচিত্র ধরনের এই চিত্রকলা কাঙড়া, কুলু, গাড়োয়াল অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। ছবিগুলি আঁকা হত তরঙ্গায়িত সুকুমার রেখায় — একটু রূপারোপিত (স্টাইলাইজড) শৈলীতে। ব্যবহৃত হত উজ্জ্বল রঙ। জনজীবনের বিভিন্ন দৃশ্যমালা ও কৃষ্ণ-কথা রূপায়িত হত কাঙড়া ছবিতে। 'কাংগ্রা ছবি' — এই নামেই একটি কবিতা আছে 'পালা বদল' সংকলনে। আগে কবিতাটি দেখি —

ময়ূর ঘরের রকে
বেগনি বাঁকা কণ্ঠ শূন্যে, চারু মেঘমালা,
শাদা মার্বেলের ছকে ছায়া আঁকে পাতা,
আপ্লুত প্রসন্ন বেলা কুসুমিত, বনের হরিণ
শাদা তারা চমকিত রেশমি বাদামি ত্বক,
শৃঙ্গডাল, গুচ্ছ গুচ্ছ লাল ফুল, জঙ্গল
রৌপ্যবর্ণ মৎস্যাঙ্কন হরিৎ বিদ্যুৎ,
কৌতুকী লাবণ্যবর্ণা সংচারিনী, স্নিগ্ধরতা
আত্মমুকুর দেখে, চুলে ধূপ, পুষ্পবাস,
রঙিন সজ্জিত জনতার আনাগোনা।

কবিতাটি পড়লে এমন মনে হতে পারে যে, নিসর্গপটে বিন্যস্ত একটি সংসার-চিত্র কবিতায় একটি বিশেষ পদ্ধতিতে রূপায়িত বলেই কবিতার ওই নাম;অথবা কবিতাটি সরাসরি একটি ছবিরই বর্ণনা। কবিতার এই অংশটি চোখের সামনে তুলে ধরে একটি কাঙড়া চিত্রপটকেই। কাঙড়া ছবিতে যতগুলি মোটিফ ব্যবহৃত হয় — ময়ূর, হরিণ, মাছ এবং দর্পণে মুখ দেখছে ও কেশ-বেশ-বিন্যাস করছে — এমন রমণী, সবই কবিতাটির মধ্যে দেখছি। কাঙড়া ছবিতে জনজীবনের চলতি ছন্দটি বোঝাবার জন্য প্রায়ই আঁকা হয় — কুটির বা একতলা বাসবাড়ির দাওয়ায় কেশবিন্যাস বা অন্য কাজে নিরত নারী ; দাওয়ার নীচে রাস্তায় হেঁটে যাওয়া দু'তিন জন পথিক। রাস্তার পাশে গাছ। গাছের আশে পাশে ময়ূর ও হরিণ। হরিণের দেহত্বকের উপর শাদা বুটি কাঙড়া ছবিতে থাকবেই। বেগুনি, বাদামি, সবুজ, হলুদ রঙের বিভিন্ন প্রচ্ছায় (লাবণ্যবর্ণ) এই ছবিতে অধিক ব্যবহৃত হয়। মেটে লালের ব্যবহারও আছে।

কবিতাটি অবশ্য এই বর্ণনাতেই শেষ হয়নি। আরও বিস্তৃত হয়ে স্পর্শ করেছে বহতা জীবনকে। কবিতার শেষাংশে কবি লিখেছেন — 'চিত্রদিন, একই সমর্পণ।' হয়ত এ কথাই বলতে চেয়েছেন — কবিতা লেখা, ছবি আঁকা আর জীবন-যাপন সবই একই শৈল্পিক চেতনায় উদ্বোধিত।

চিত্রশিল্পীদের নাম, তাঁদের জীবন ও কর্মের অনুষঙ্গ, তাঁদের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি এবং প্রখ্যাত চিত্রাবলির উল্লেখে কবিতায় এক ধরনের চিত্রভাষা নির্মাণ করেছিলেন বিষ্ণু দে। মাতিস, পিসারো, দেরাঁ, পিকাসো, সেজান, উত্রিল্লো, যামিনী রায়ের নাম ব্যবহার করেন তিনি কবিতায়। পাঠকের মনে এই চিত্রশিল্পীদের ছবির স্মৃতি জাগিয়ে দেন। পিকাসো-র 'গ্যোর্নিকা' ছবিটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন বার বার। এই ছবি হয়ে ওঠে ফ্যাসিস্ট অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক। সেজান একটি পাহাড়-চূড়ার ছবি বারবার আঁকতেন। সেই পাহাড় — সেন্ট ভিক্টোয়ার-এর নামাঙ্কিত। বিষ্ণু দে-ও সেই পাহাড়ের নাম নেবেন। কিন্তু এই রীতি অমিয় চক্রবর্তী সাধারণভাবে গ্রহণ করেননি। এক বার মাত্র এই পদ্ধতির প্রয়োগ পাই তাঁর কবিতায়।

কবিতার নাম 'ইতালি প্রবাসিনীর পত্র', কবির শেষ কবিতা-সংকলন 'অনিঃশেষ' এর অন্তর্ভুক্ত। যেন ইতালির কোনও গ্রাম থেকে চিঠি লিখেছেন কোনও বান্ধবী। সেখানে মধ্যযুগীয় প্রাসাদ — পাথরে গড়া। পুঞ্জিত, শিল্পিত পাথর — আজ নিথর ও ঠান্ডা। চারিদিকে উদ্ভাসিত নিসর্গ-রূপ — ঘন সবুজ তৃণ-বৃক্ষ-লতা, রঙিন ফুলের উদ্ভাস। সেখানে মুক্ত প্রকৃতির বিস্তারে নীল আকাশ, বিশুদ্ধ বায়ু, আর রাশি রাশি শিলাস্তর। মসৃণ, বর্ণাঢ্য, উজ্জ্বল পাথর-সম্ভার। শান্ত, মহিমামন্ডিত পাথর — কালের সাক্ষী। আপাত-নিষ্প্রাণ মনে হলেও বহু যুগের প্রাণের ইতিহাসকে যেন তা ধারণ করে আছে। তাই প্রস্তর-ভাস্কর্যের মহান শিল্পীকে তা অনুপ্রাণিত করে।

ওখানে মার্বেল খুঁজে সৃজন-নিভৃতে
মাইকেল এঞ্জেলো নিজে এসে বারবার
পেয়েছেন পূর্বকালে আপন পাথর ভারে-ভারে।

মাইকেল এঞ্জেলোর নাম উল্লেখে এখানে স্মৃতি জাগে চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের। ঐশী বোধে বিশ্বাস সমর্পিত সেই তুমুল শিল্পীর দৃষ্টির অনুষঙ্গে পাথরের রূপের ঐশ্বর্য পাঠকের মনে ছড়িয়ে যায় এই কবিতাংশে। পাথর এখানে ত্রিমাত্রিক ঘনতায় অনুভূত হয় কারণ অনুষঙ্গটি ভাস্কর্যের। কিন্তু সাধারণ ভাবে অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যভাষায় চিত্র-ধর্মের গুণ দ্বিমাত্রিক রূপরেখা ও বর্ণ-সমাবেশের কল্প-বিন্যাসেই ফুটে ওঠে।

অমিয় চক্রবর্তীর কাব্য-প্রকরণ-ভাবনাতেও চিত্রচেতনা গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। তিনি নিজের কাব্যভাবনা সম্পর্কে কোনও গ্রন্থ রচনা করেননি কিন্তু লিখেছিলেন কয়েকটি প্রবন্ধ।

সেগুলি সংকলিত হয়েছিল অমিয় চক্রবর্তী-র একমাত্র প্রবন্ধ-গ্রন্থ 'সাম্প্রতিক' (নাভানা, ১৯৬৩)-এ। বুদ্ধদেব বসুকে লেখা পত্র-প্রবন্ধও ছিল কয়েকটি যেগুলিতে আলোচিত হয়েছিল কবিতার ছন্দ ও ভাষা। 'কাব্যের ধারণাশক্তি' নামের প্রবন্ধটিতে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন — কীভাবে একটি কবিতা তাঁর মনের মধ্যে আসে। কবি তাঁর চারিদিকের পৃথিবীকে দেখেন। আগ্রহী, নিবিড় দৃষ্টিতে দেখেন। দেখতে দেখতে দৃশ্যের মধ্যে মগ্ন হয়ে যান। মনের মধ্যে কম্পন তোলে উপলব্ধি — যার উৎস পরিমণ্ডলের দৃশ্যমালা, তার পর মনের মধ্যে জাগে বিশেষ ভাবস্পন্দিত ভাষা। জন্ম হয় কবিতার। অমিয় চক্রবর্তীর অনেক কবিতারই উৎস ও অবলম্বন হল চিত্রময়তা। সেই ছবি থেকেই তিনি জীবন-উপলব্ধির অন্তরতর তলকে স্পর্শ করেন। তাঁর কয়েকটি উক্তি তুলে দেওয়া গেল ওই প্রবন্ধটি থেকে।

১। "দেখছি, শুনছি, কিন্তু শত টুকরো দেখাশোনাকে মিলিয়ে নিয়ে কবিতার সূত্রটুকু প্রচ্ছন্ন অনুভবের ভাষায় নিমগ্ন।"

২। "ছবির ভিতর থেকে উঠল স্পষ্টতর সংস্কার, যাতে লুপ্ত স্মৃতি এবং নতুন পরিবেশ মিশেছে। ... ছবিতে দেখা দিতে লাগল দৃঢ় একটি মানসরেখা।"

৩। "ভাবের চিত্রময় অন্তর্লীন একটি সূক্ষ্ম শরীর তৈরি হওয়ার জন্যে চাই মনের সম্বৃত বেগ, ..."

৪। "ছবির ঘরে অহৈতুক একতা। বোধনের আলোকে শুধু মাত্র দেখাতে পারলে দর্শকের মনে হবে দেখছি।"

বলা বাহুল্য, অমিয় চক্রবর্তীর এই ছবির চোখ আর কলমে লেখা ছবি কখনওই থেমে থাকে না দৃষ্টি-পরিধির সীমায়। দৃশ্য থেকে অনুভবের সত্যে পৌঁছে যায় প্রায় সরাসরি। কিন্তু তাঁর চিত্রমনস্ক দৃষ্টির নান্দনিক উদ্ভাস কীভাবে আলোকিত করে তাঁর কবিতাকে — তা আমরা দেখে নিয়েছি আগেই।

'কাব্যের ধারণাশক্তি' প্রবন্ধটি থেকে ক'য়েকটি অংশ উদ্ধার করতে চাই। কীভাবে তিনি দেখেন তারই ধারাভাষ্য এই অংশগুলিতে। প্রবন্ধ রূপে পরিকল্পিত একটি গদ্য-লিখনের বাক্যগুচ্ছ কীভাবে 'চিত্ররূপময়' কবিতা হয়ে উঠতে পারে — তারই দৃষ্টান্ত দেখা যাবে উদ্ধৃত অংশগুলিতে।

১। ভাদ্রের আকাশ ভেঙে পড়েছে; শ্রাবণী প্লাবনীর ভরা পাত্রে ঘনতর ছায়া ঘনল;বাড়ির ঘাটে আশ্চর্য স্রোত। পুবের বাগানে কত রকম সবুজ, ঝাপ্‌সা সবুজ, মেঘলা সবুজ, তাতে ঝিনুকে আলো ঠিকরে পড়ে, দুপুরের ক্ষণলঘু বিরত বৃষ্টির মুহূর্তে।

২। বারান্দাটা ভিজছেই লাল সর্বাঙ্গে, লাল শানের বারান্দা, ছাতহীন, ঝিরিঝিরি, ঝরঝর সারাদিন। ঘাটের ধাপেই মেঘনা, তার ঘোলাটে আয়নায় পূর্ববঙ্গের ছায়া ঘনায়, আকাশ জলের মোহানায়, বৃষ্টি, দৃষ্টি লীন। সারাদিন। আমরা বাড়িতে। জলবরণ জল, ছলছল, জামে আমরুলে জল, বাগানে ঝাউয়ের বনে, আনারসে মেহেদিতে। জল নামছে হঠাৎ প্রবল।

৩। ওদিকের বাগানে কলাগাছের সারি-পাতা, শিমুলের বিশীর্ণ আঙুল, অঞ্জলিত মোটা বটপাতা। ফোঁটা ফোঁটা জল, চঞ্চলিত। ঝিরঝির নতুন বর্ষণ। সুপুরি গাছের সারি ঘন সঞ্চলিত। তার মধ্য দিয়ে সরু জলের গলি। তেঁতুল নিমের দ্রুত সুচারু সবুজে বৃষ্টি। নিচে জল জমে, বকুলগাছের গাছতলে ছায়াচ্ছন্ন গূঢ় জল। জানলায় বসে আছি। অগম্য আকাশ থেকে ঘাসে-ঘাসে শিকড়ে জল গড়ায়, ধানের গোড়ায়, শীষে, সিক্ত তেজে প্রাণ ভেজে। সূর্যরশ্মিদ্রবস্বচ্ছর্মম জল। স্নিগ্ধ জল।

৪। পড়ন্ত রোদের একটি গ্রন্থিতে বাঁধা পড়ে গেল অনেক কিছু, পানের দোকানে সবুজ পান, সোনালি ডিবে, ঝিলমিলে ঝোলানো আয়না, দোকানের লাল টালির উপরে চুপ করে বসেছে কাক। বুড়ি ভিখারি ভাঙা টিনের পাশে হাত বাড়িয়ে উদাসীন, তার অসুন্দর মুখের শীর্ণতা আলোয় চিত্রিত হয়ে দেখা দিল।

ঠিক এই ভাবেই গড়ে ওঠে তাঁর কবিতার ভাষা। ভাষা-চিত্র।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাতেই আমরা এই চিত্রকে চলচ্চিত্র হয়ে উঠতে দেখেছি। চলমান দৃশ্যমালা — অনেকের কবিতাতেই ফুটে ওঠে। উঠতেই পারে। কবিতার একটি পরিচিত প্রকরণ এই দৃশ্যগতি। কিন্তু অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় তা যে ভাবে হয়ে উঠেছে — তার সঙ্গে অপরাপর কবিতার পার্থক্যই আছে কিছুটা। তাঁর কবিতায় চলচ্চিত্র-রীতি নিবিড়তর এবং অনেক কবিতাতেই তা বিচ্ছেদসম্ভব নয়। যেমন ছবির ব্যাপারে তেমনই সিনেমার ব্যাপারেও অমিয় চক্রবর্তীর সবিশেষ সচেতনতা ছিল। এবং তা এসেছিল রবীন্দ্রসান্নিধ্যের সূত্রেই — এমন মনে করবার কারণ আছে।

চলচ্চিত্র মাধ্যম বাংলায় তখন সবে মাত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পথে। রবীন্দ্রনাথ আগ্রহের সঙ্গে এই অভিনব শিল্প-প্রক্রিয়ার রীতি-পদ্ধতি লক্ষ করে চলেছেন। নিজেও লিখছেন চিত্রনাট্য, রাজি হয়ে যাচ্ছেন অভিনয় করতে। অমিয় চক্রবর্তীও তাঁর পাশে থেকে বিষয়টি অনুধাবন করে চলেছেন। চলচ্চিত্রে অমিয় চক্রবর্তীর আগ্রহ যদি খুব সচেতন, স্বতন্ত্র আগ্রহ না-ও হয় — ফিল্মের সমস্ত দিকগুলি আপনা থেকেই তাঁর মনে মুদ্রিত হয়ে যাচ্ছে। ঠিক এই সুযোগ অন্য কোনও বাঙালি কবির জীবনে আসেনি।[২]

রবীন্দ্রনাথ জার্মানি গেলেন ১৯৩০ সালে। দেখলেন ব্যাভেরিয়া-র নিকটবর্তী ওবেরআমেরগাউ (Oberammergau) গ্রামের বিখ্যাত 'প্যাশন প্লে' — খ্রিস্ট-জীবন অবলম্বনে অভিনীত সারাদিনব্যাপী নাটক। তার দু'দিন পরেই জার্মানির চলচ্চিত্র-প্রযোজনা-সংস্থা 'উফা' (UFA) কোম্পানি তাঁকে ফিল্মের উপযোগী একটি চিত্রনাট্য লিখে দেবার অনুরোধ জানালে রবীন্দ্রনাথ রাজি হলেন এবং লিখলেন 'দ্য চাইলড' (লেখার তারিখ ২৩ ও ২৪ জুলাই ১৯৩০)। সরাসরি ইংরেজিতে লেখা এই গদ্য-কবিতাটি থেকে ১৯৩২-এ তিনি বাংলা 'শিশুতীর্থ' কবিতাটি লেখেন। যদিও দৃশ্য-প্রবাহ রূপেই কবিতাটি রচিত তবু এটি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হতে পারেনি। উফা-র নির্মাতারা এতখানি দার্শনিক উপলব্ধিময় রচনা ঠিক চাইছিলেন না। চেয়েছিলেন ভারতীয় জীবনের বাস্তবতা ফুটে ওঠে — এমন কোনও লেখা। 'দ্য চাইলড' যখন রচিত হচ্ছে ঠিক তখনই অমিয় চক্রবর্তী মিউনিখ থেকে চিঠি লিখেছেন সোমনাথ মৈত্রকে — "রবীন্দ্রনাথ সারাদিন ধরে ইংরেজিতে একটা নতুন রকম টেকনীকে ফিল্মের জন্য নাটক লিখছেন। ছবির মতো এও তাঁর নূতন সৃষ্টির নেশা।" (প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ) কালীশ মুখোপাধ্যায়ের "বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস' থেকে এ-ও জানা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ উফা-র স্টুডিও-তে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তাঁর গান ও আবৃত্তির সবাক চিত্র গ্রহণ করা হয়। সেই সবাক চিত্র ১৯৩১-এ কলকাতায় কোথাও প্রদর্শিত হয়েছিল বলেও জানিয়েছেন কালীশ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু আর কোনও তথ্য তাঁর পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয়নি। অমিয় চক্রবর্তীও হয়ত দেখেছিলেন সেই স্টুডিও। সাক্ষী ছিলেন সেই চিত্রগ্রহণের।

এর পর রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র জগতের বহু শাখা-প্রশাখাময় সম্পর্ক বিস্তৃত হয়েছিল বহু দিকে, বহু পথে। কিন্তু অমিয় চক্রবর্তী ১৯৩৩ সালে চলে গিয়েছিলেন অক্সফোর্ড-এ। আবার ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত ভারতে (১৯৪০-১৯৪৮ কলকাতায়) থাকলেও প্রতিপদে ঘনিষ্ঠ রবীন্দ্র-সহচরের ভূমিকায় আর তাঁকে দেখা যায় না। এর পর থেকে তাঁর শিল্প-আদর্শ, সৃষ্টিকর্ম চলেছে নিজের মতো। কিন্তু যথার্থভাবে আধুনিক কবি রূপে আবির্ভূত হবার আগেই চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্রের কারিগরি — সেই সঙ্গে চলচ্চিত্র-শিল্পের নান্দনিকতা সম্পর্কে যে ধারণা ও সংবেদনা তিনি অর্জন করেছিলেন তা বিচিত্র রূপে প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর কবিতায়।

চিত্রের সঙ্গে চলৎ-ধর্ম মিলে চলচ্চিত্র। গতিময় দৃশ্য। সেই সঙ্গে প্রয়োজন — যিনি দেখছেন তাঁর দৃষ্টি অভিক্ষেপণের বিন্দুটি স্থির করা। অ্যাঙ্গল অফ ভিশন। বিশেষ বিশেষ উচ্চতা-স্তর ও কোণ থেকে দেখলে ছবি অন্য রকম দেখায়। গতি ছবিকে প্রাণের স্পন্দন ও আভিমুখ্য দান করে। রঙ ছবিতে আনে উপলব্ধির অনুষঙ্গ। নীল আকাশ, লাল আকাশ, কালো আকাশের অর্থ মানুষের কাছে তিন রকম। গতি, দৃষ্টিকোণ ও বর্ণের সমন্বয়ী ছবিকে নির্দিষ্ট মাপের একটি পশ্চাৎপটে স্থাপন করতে হবে এমনভাবে — যার সমাবেশের সামঞ্জস্যে গড়ে উঠবে উপলব্ধির বিভিন্ন বিন্দু, প্রবাহ, আভা। কাহিনি থাকতে পারে, না-ও পারে। ধ্বনির প্রয়োগ আবশ্যিক নয়। নির্বাক যুগের কোনও কোনও চলচ্চিত্রকেও আমরা ভুলতে পারি না। কিন্তু ধ্বনির সংযোজন চলচ্চিত্রকে সম্পূর্ণতা দেয়। এই সবই অমিয় চক্রবর্তী বুঝে নিয়েছিলেন। বোঝা তাঁর শিল্পীর দৃষ্টিকে গড়েছিল। কবিতার ভাষায় আছে তার অভ্রান্ত প্রকাশ।

'খসড়া' ১৯৩৮-এ প্রকাশিত। তারই অন্তর্গত কবিতা 'কালো জলে'। কবিতার প্রথমাংশ —

● জাহাজ মরাল যাও সরে
ঢেউ দেওয়া নীরে।
পাইলট বাঁশি বাজায় —
কোন কূলে যাবে কূল ছেড়ে।

জাহাজ ছেড়ে যায়। বন্দরের মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে প্রিয়জনকে বিদায় জানাতে আসা আত্মীয়। এই ছবিটি সেই বন্দর থেকে নেওয়া। জাহাজ ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে দূরে।

কবিতার শেষ অংশ —

পাহাড় দ্বীপের সারি রাঙা-ছাত বাড়ি
ঠাণ্ডা শহর এল, পুরনো বন্ধুর,
দীপ জ্বালা বিদেশী বন্দর।
চিনি ঝরে, সে কোথায়?
নামব না ঘাটে।
দূরে ভেসে চলে যাও
ছবি আঁকা পটে,
ভাঙো ঝোড়ো জল,
জাহাজ মরাল।

কবির মন এখানে উঠে এসেছে জাহাজের ডেকের উপর যাত্রী হয়ে। জলের বুক থেকে এখানে সমুদ্র-তটভূমিকে দেখা। অমিয় চক্রবর্তীর ভ্রামণিক হৃদয়। আর সে বন্দরে নামে না। ভেসে যেতে থাকে আরও দূরের দেশে। সামনে ছবির মতো অন্য দেশের বন্দর। কবিতাটিতে গতির অনুভব আগাগোড়া।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় জাহাজ, এরোপ্লেন, ট্রেনের চিত্রকল্প আসে বারবার। আসে বন বন করে ঘোরা লাট্টু, নাগরদোলা, টিক টিক করে চলা হাতঘড়ি। আসে চির আন্দোলিত সমুদ্রের ছবি।

গতি স্বতই মূর্ত হয় তাঁর লেখায়। সমুদ্রকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কোণ থেকে, বিভিন্ন আলোকসম্পাতে দেখলে তার টুকরো টুকরো ছবি হবে বিচিত্রের সমন্বয়। সেভাবেই কবি সমুদ্রকে দেখেছেন একটি কবিতায় —

আলো-নীল চূর্ণ সবুজ শাদা মেঘ-ছোঁওয়া
কালো বাঁকা-চন্দ্রিত
রৌদ্র তরঙ্গ-চূড়, উদ্‌ভ্রান্ত
কখনো মাধ্যাহ্নিক শান্ত
তরল দৈগন্তিক সমুদ্র
(অয়ন, অভিজ্ঞান বসন্ত)

এখানে লক্ষ করবার বিষয় পৃষ্ঠার উপর মুদ্রণের সজ্জায় শব্দ ও শব্দ-সমবায়ের মধ্যবর্তী স্পেসগুলি। ভিন্ন ভিন্ন ক্যামেরার শটকে স্পষ্ট করে দিচ্ছে এই স্পেস। পাঠ করতে গেলে যথাযোগ্য বিরতি দিয়ে পড়তে হবে।

ক্যামেরার বিভিন্ন অ্যাঙ্গল ও মুভমেন্ট-এর একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত 'কুয়োতলা' (খসড়া) কবিতা। কবিতার শুরু একটি শব্দে — 'চোঙ'।

চোঙ। কালো ছলছলে তল, উপরে চাকতি শূন্য-রঙা, প্রথমেই কুয়ো-তলায় এসে উপর থেকে কুয়ো দেখি ঝুঁকে — চোঙের নীচে ম্লান আলোর তরঙ্গ-রেখায় ছলছল করছে কালো জল। তার পরেই পঙক্তির দ্বিতীয় অংশে ক্যামেরা চলে যায় কুয়োর গভীরে — উপরের ছবি নেয় — শূন্য-রঙা গোল চাকতি সেখানে।

পরের পঙক্তি —

ইঁটের ফাটল লাল জবা ফুল সাঁওতাল পিতলের
ঘটি ঘটি রাঙা।

ক্যামেরা গামোছা টিন্ট করে ওঠে কুয়োর ভিতরের দেয়াল বেয়ে — ইটের ফাটল। ক্যামেরা কুয়োর বাইরে বেরিয়ে এসে কুয়োর পাড়ের চারি দিকে ঘোরে। চুলে লাল জবাফুল গোঁজা সাঁওতাল নারী-পুরুষ স্নান করবে, বাসন মাজবে সেখানে। ঘটি-বাটি-গামছা পড়ে আছে। এই ভাবে কবির দৃষ্টিকে অনুসরণ না করলে কবিতাটির রস পাওয়া যাবে না।

সিনেমার ক্লোজ শট বলি তাকে যেখানে আলাদা আলাদা করে দেখানো হয় মাথা, কাঁধ, আঙুল ইত্যাদি। সেগুলির সমন্বয়ের পারম্পর্যে জাগে চলচ্চিত্র। ঠিক এই শিল্পরীতিতেই যেন লেখা হয়েছে একটি কবিতা —

ঘোড়ার খুর
খুর বাঁধা পা
আলোয় বাদামী গা
তীব্র বেগ
(প্রেরণা, মাটির দেয়াল)

পর পর তিনটি স্থির ক্লোজ শট-এর পর তীব্র বেগ দেখানোর জন্য চলন্ত ক্যামেরা যেন নিয়ে আসা হল এখানে।

ফিল্মে মোজেইক সিসটেম বলে একটি পদ্ধতি আছে। একটি বড় দৃশ্যপটকে সেখানে ছোট ছোট দৃশ্যে ভাগ করে দেখানো হয়। এই পদ্ধতিতে রচিত অমিয় চক্রবর্তীর সুপরিচিত কবিতা 'বড়োবাবুর কাছে নিবেদন' (মাটির দেয়াল) —

ধানের মাড়াই, কলাগাছ, পুকুর, খিড়কি-পথ ঘাসে ছাওয়া।
মেঘ করেচে, দু-পাশে ডোবা, সবুজ পানার ডোবা,
সুন্দরফুল কচুরিপানার শঙ্কিত শোভা,
গঙ্গার ভরা জল, ছোটো নদী, গায়ের নিমছায়া তীর

একটি গ্রামকে যেন ভেঙে ভেঙে দেখানো হল সিনেমার মতোই, কবিতায়। ছবিগুলির মধ্যে স্থানগত সংলগ্নতা নেই বলে পূর্বোক্ত কবিতাটির চিত্রমালাকে ঠিক প্যানিং বলব না। ক্যামেরা প্যান করার উদাহরণ পাই 'খসড়া'-র 'চায়ের বেলা' কবিতায় —

সিমেন্ট, চুনের ঢিপি আছে পড়ে
নতুন দালান সিঁড়ি-বাঁধা,
সামনের মাঠে ধুলো কাদা
বুড়ো গাছ, পাতা ধুলো-শাদা

যখন বিভিন্ন ধরনের ছবির টুকরো পরপর জুড়ে, ভাবের একটা পারম্পর্য জেগে ওঠে তখন তাকে চলচ্চিত্র-ভাষায় বলি মনতাজ। এই রীতিতেই রচিত অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা 'যুদ্ধের খবর' (এক মুঠো)। যুদ্ধের খবর এখানে সংবাদ পাঠের রীতিতে বা আবেগমথিত ভাষায় দেওয়া হয়নি। পর পর ব্যবহার করা হয়েছে ছবি আর ধ্বনি —

ভাঙা কাঁচ মুখ চোখ
দরজা বারুদ
ফুল, ফুল ছিলো জানালায়
আগুনের আকাশ শ্বাস
আগুনের খুনের
গ্যাস মুখোশ রাত্রি অন্ধ যাত্রী
ছবি ছবি পোড়ে ওড়ে
কে দাঁড়ায়
মাস্তুল জল চীৎকার বারুদ

একটি কবিতা অমিয় চক্রবর্তী শুরু করেছেন একটি অদ্ভুত বাক্য দিয়ে। বাক্যটি হল 'পরে পরে নয়, একসঙ্গে'। তারপর আছে একটি সকালের বর্ণনা। কিন্তু বর্ণনা করতে গেলে একটি কলম-ছবি আগে, একটি তার পরে — এ ভাবেই লিখতে হবে। কিন্তু দেখার সময় দেখি এক সঙ্গে। কবি প্রথমেই মনে করিয়ে দিচ্ছেন — পরে পরে লিখতে হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু চিত্রটি দেখতে হবে

'পরে পরে নয়, একসঙ্গে'। তার পর আসে মিড লং শট-এ ধরা একটি দৃশ্য। —

পরে পরে নয়, একসঙ্গে। ঝিরিঝিরি
চুলে ছোঁয় বন্য হাওয়া, কানে ঝাউগাছ
শিরিশিরি,
কফির সুরভি, টোস্টে মাখনের স্বাদ মধু-মেশা
ভোর সাড়ে সাতটার গোলাপি আলোর ঠান্ডা নেশা,
(১৬০৪ য়ুনিভার্সিটি ড্রাইভ, পারাপার)

গতিময় চিত্র এবং বর্ণ-সামঞ্জস্য (colour adaptation) কে কীভাবে অমিয় চক্রবর্তী মূর্ত করেন তাঁর কবিতায় তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক একটি সম্পূর্ণ কবিতার উদ্ধারে —

তিন নান
ঐ চলে
শুধু কালো শাদা

দেয়াল রোদ্দুরে স্নাত
গাছ সারি
দেয়াল রোদ্দুরে স্নাত গাছ সারি

উপাসিকা
উপাসিকা
তিন নান ঐ চলে শুধু কালো শাদা
তিন নান কনভেন্ট ঐ গাছ সারি
দেয়াল রোদ্দুরে স্নাত শুধু গাছ সারি
তিন নান চলে যায় বেশ কালো শাদা।।
(তপোদৃশ্য, অনিঃশেষ)

তিন সন্ন্যাসিনীর অত্বরিত সম পদক্ষেপে চলার দৃশ্য। কালো শাদা পোশাক। পেরিয়ে যায় — ইট রঙা দেয়াল, হলুদ আভা রোদের, গাছের সবুজ। সন্ন্যাসিনীরা চলে যান, ক্যামেরা অনুসরণ করে। অদূরে কনভেন্ট দেখা দিল — তিন উপাসিকা সন্ন্যাসিনী চলে যান। আমরা দেখতে থাকি। চলচিত্র শেষ। আমরা উঠে আসি। দু-দণ্ডের শান্তি বুকে নিয়ে। জীবনানন্দের ভাষায় — 'জীবনের এই সব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল।'

সবাক চলচিত্রে সংযোজিত হয়েছিল ধ্বনি। অমিয় চক্রবর্তী বহুভাবে ধ্বনিকে মনোশ্রুতিবেদ্য করেছেন। 'একমুঠো' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত 'সঙ্গৎ' কবিতাটি পড়ি —

ডুব ডুব ফাটা ঢোলক
বুড়ো নালার উপর পুলে
সবজিমন্ডির হিজিবিজি ভিড়ের লোক, ডুব ডুব
বাজারে কেউ হাঁকে মুলো, শর্ষে ঝাঁকায়,
একার ঘন্টা, হুড়মুড়ে চাকায়, ডুব
মাছি ধুলো, ছেঁড়া খানিক দাড়ি চুলে
তালি দেওয়া সালওয়ার চটা কামিজে ডুব ডুব
বাঁ পাশে গলির গিজগিজে ডুব
নীল টালি গম্বুজের ফালি
গলে গেছে দুপুরের হাওয়ায় ঝিলমিল
ডুব ডুব ডুব

সমস্ত কবিতাটি জুড়ে জীবনের অতি সাধারণ হাট-বাজারের জীবন-স্পন্দন। মাঝে মাঝে এক বার করে ডুব, ডুবডুব, ডুবডুবডুব — শব্দের ব্যবহার। বৃদ্ধের ফাটা ঢোলকের বাজনার ধ্বনিটি জাগিয়ে রেখে দেয়।

আর একটি কবিতা 'ভোরের তর্পণ' (অনিঃশেষ)। কবিতা শুরু হয় গোরুর ডাকের শব্দ দিয়ে — 'হাম্বা'।

হাম্বা
নরম মোটা শান্ত সুন্দর চাঁদকপালী গোরু

অর্থাৎ চলচ্চিত্রের প্রারম্ভেই শুনি ধ্বনি। তারপর দেখি ছবি। ছবি গতিশীল। ছবি রঙিন। "কালো, ধবলী, বাদামী/পুরু সবুজ ঘাসে মুখ ডোবানো," 'হাম্বা' শব্দটি আরও এক বার ফিরে আসে। বড় বড় চোখের বাছুরের কচি গলায়। এই কবির প্রভাত-দৃশ্য, তাঁর ভোরের তর্পণ।

বেশ কয়েকটি মাঝারি দীর্ঘ কবিতা আছে অমিয় চক্রবর্তীর যেগুলি পড়ে মনে হয় একটি সুনিপুণ চলচ্চিত্র দেখে উঠলাম। নাটকের মতো পূর্ণ সাবয়ব নয় তাঁর কবিতার দৃশ্যায়ন। তাঁর কবিতা চলচ্চিত্রের মতোই আলো-আঁধারে, ছায়ায়, আভায় অতীন্দ্রিয়ের ইঙ্গিতে সংবেদী হয়ে ওঠে। 'ইতিহাস' 'আন্তর্জাতিক', 'হারানো অর্কিড', 'পশ্চিম শহরে' — এগুলির প্রতিটিই যেন প্রায় ফিল্ম-স্ক্রিপ্ট। 'চিত্রনাট্য' শব্দটি ফিল্ম-স্ক্রিপ্ট-এর ঠিক বাংলা নয়। পরিভাষা হিসাবে চলে গেছে। আমরা অমিয় চক্রবর্তীর ওই কবিতাগুলিকে বলতে পারি 'চলচ্চিত্র-লেখ'।

কাব্যভাষায় চলচ্চিত্রের আভাস অনেক কবির লেখাতেই কিছু কিছু আসে। কিন্তু অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় এই রীতি পরিপূর্ণ এক শিল্প-প্রকরণ হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র

(১) কবি অমিয় চক্রবর্তী, সুমিতা চক্রবর্তী, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃ. ১৬২।

(২) রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চলচ্চিত্র-সংযোগের তথ্যসমূহ প্রধানত গৃহীত হয়েছে অরুণকুমার রায় রচিত 'রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র' গ্রন্থটি থেকে। চিত্রলেখা, কলকাতা, ১৯৮৬।

স্বর্গ

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

এতদিনকার যত কিছু কোথায় লুকব? বোধে দ্বিধা —
ধর্ম ম'রে লাশ, সুন্দরও উধাও,

দিনভোর লালচে রোদ, বন্ধুরাও ইতিহাসে, তবু তথ্যে
লোকগান খুঁজি, তবে জয় আছে?
বনে বনে নিঃশব্দ কুশল? লং-ড্রাইভ চলতে পারে?
রাত্তিরও তন্বিষ্ঠ?

ঠা-ঠা দুপুরেও বাতাসে অ্যাসিড, বৃষ্টি পড়ে
অ্যামিবার ঘরে, ধস্ত না-ঘুমনো চোখ, কলকাতার রঙ্গমঞ্চে
চৈনিক ম্যাজিক, কত রকমের নিঃস্বায়ন, তবু
চিলেকোঠা-ঠাসা এই ফ্যাকাসে জীবনে
স্বর্গ ভাবি সংঘের সিঁড়িকে ....

মোহিনী ফণা ও উজ্জ্বল রমণী

বেণু দত্তরায়

সাদা গ্লাডিউলাসের ঝাড় থেকে
সাপটা ফণা তুলে উঠল
এক থোকা বেগুনি উজ্জ্বল
ক্রিসেন্থিমামও তার পাশাপাশি

জুনের দুর্ধর্ষ রৌদ্রে
এ-দৃশ্য দেখতে
আমি শিরিনকে ডাকলাম

লাল মখমলের
আগুনে পায়জামা ও পাঞ্জাবির
অদ্ভুত ভাঁজে
নখরঞ্জনীর আশ্চর্য পালিশে
সিল্কমসৃণ চুল
শিরিন এখন আমার
যৌবনের চিতাশয্যা থেকে
উঠে এসেছে

তার নিঃশ্বাসের আগুন
আমার গালের কাছে
নীল-নীল চোখের ছুরিতে
মহার্ঘ প্রতিহিংসা

আমি চোখ ফিরিয়ে
এক বার শিরিনকে
আর-এক বার সাপটাকে দেখলাম

জুনের দুপুরে,
প্রেম নয় — প্রেমের
রমণীয় প্রতিহিংসা
মৃত্যুহিম জিঘাংসার স্তবকে-স্তবকে

গ্লাডিউলাসের ঝাড় থেকে
সাপটা ফণা তুলে উঠেছে
এক থোকা বেগুনি উজ্জ্বল
ক্রিসেন্থিমামও তার পাশাপাশি

পাতাদের নিঃশব্দ
আড়াল থেকে
সমস্ত বিষ সংগ্রহ করে
নিষ্ঠুরতম

মোহিনী ফণা ও চিকচিকে
মসৃণ উজ্জ্বল রমণী
আমি কোনটিকে দেখব?

অথচ ঘনিষ্ঠ লোকায়তে

তুলসী মুখোপাধ্যায়

আমাকে নিয়ত ডাকছে — আমাকে নিয়ত ডাকে
তারকামার্কা সুখের ডগমগ ভৈরব ভবাণী
আমাকে পুড়িয়ে মারছে পীনস্তনী প্রমত্ত বনানী....
এইসব হাঁকডাক হৃৎপিণ্ড কাঁপানো ঢাক নিয়ত কামড়ায়
মরুবাসী হাওয়ার মতো ছাঁকা লাগে পিপাসি চামড়ায়।

আমাকে উস্কে দিচ্ছে — নিয়ত উস্কে দিচ্ছে
পাঁচতারা হোটেলের সম্মোহনী সম্ভোগের গান
নিরবধি "আরো চাই, আরো চাই" — তান্ত্রিক মন্ত্রেতন্ত্রে
আমি এক মদমত্ত প্রাণ।

অথচ ঘনিষ্ঠ লোকায়তে
দিবানিশি ধুকে ধুকে ফেনা তুলছে হা-অন্ন হাভাতে
তাহাদের ঝুপড়ির আকাশে
কুটিল কুডাকে রাত নামে কাকডাকা প্রথম প্রভাতে
তাহাদের শ্রীমান কখন যে ছাপা হয় মাফিয়ার দলে
শ্রীমতীর কৌমার্য লুণ্ঠন হয় ছলে বলে কিংবা কৌশলে।
জীবনের উত্থান আহ্বান গুড়িয়ে মাড়িয়ে জয়ী দুর্যোধন
আমাকে তবুও ডাকে ধরণী দোহন করা সুখ-সম্মোহন।

আমাকে বন্দি করেছে এমনই এক তমসাচ্ছন্ন অন্ধ ভুবন।

নতুন, পুরনো

সুজিত সরকার

যে সিনেমা আবার দেখার জন্য এক দিন
বছরের পর বছর অপেক্ষা করতাম
এখন ইচ্ছে থাকলে সেই সিনেমাই
সপ্তাহে অন্তত চার বার দেখা যেতে পারে।

যে গান আবার শোনার জন্য এক দিন
মাসের পর মাস অপেক্ষা করতাম
এখন ইচ্ছে না থাকলেও সেই গান
দিনে অন্তত চার বার শুনতেই হয়।

যা কিছু পছন্দের ছিল এক দিন
সে সবের প্রতি আকর্ষণ এখন ফুরিয়ে যাচ্ছে।

একই লেখকের একই উপন্যাস একই সময়ে
বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে
শুধু স্থান-কাল-পাত্র বদলে যাচ্ছে।

একই কবির একই কবিতা একই সময়ে
বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে
শুধু নাম ও শব্দ বদলে যাচ্ছে।

যা কিছু নতুন সে সব এখন
দ্রুত পুরনো হয়ে যাচ্ছে।

পাড়ায় পাড়ায় সাইবার কাফে
মোড়ে মোড়ে পাবলিক টেলিফোন বুথ,
ফাস্ট ফুড সেন্টার
জামার পকেটে সেল ফোন, কোমরে পেজার,
প্যান্টের পকেটে ক্যালকুলেটর।

এমনকী নতুন প্রেমিকাও
দ্রুত পুরনো হয়ে যাচ্ছে এখন।

শুধু ধ্রুবতারা কখনও নতুন নয় কখনও পুরনো নয়
শুধু সমুদ্র কখনও নতুন নয় কখনও পুরনো নয়
শুধু শ্রাবণের তুমুল বৃষ্টি কখনও নতুন নয় কখনও পুরনো নয়....

শব্দকথা

পঙ্কজ সাহা

সারা দিন তোমরা কথা বলছ
সারা দিন আমি কথা শুনছি,
কত বর্ণের কথা, কত ভঙ্গির কথা,
কথার ফেনায় ডুবে যাচ্ছে দিন সময়,
কথার রঙে ধাঁধিয়ে যাচ্ছে দেখা, চেয়ে থাকা,
কথার উপর কথা সাজাতে সাজাতে পাহাড়
পাহাড় আমার পথ আটকায়
আমাকে কোন দিকে যেতে হবে
দেখতে পাই না।

কথার বেড়া কথার চৌখুপি কথার গরাদ
কথা ডাকছে কথাকে কথা ভাঙছে কথা
কথার বেদনায় কথার রক্তে
ভেসে যাচ্ছে আমার মুখ।

দিন শেষে আমি একাকী
অন্ধকারের মুখের দিকে তাকিয়ে,
ঠিক তখনই আমি বুঝতে পারি
কথা নয় আমি সারা দিন
কেবল শব্দ শুনছি।

জলের ভেতর

আশিস গিরি

ছায়ার ভেতর দেখলে নিজের খেলা
আদল ভেঙে বেজায় বাহাদুরি
দুঃখ জাগায় এমন পড়তি বেলা
বাড়তি সময় হেলায় গেছে চুরি।

অন্তঃপুরে শীতের জড়সড়
জন্ম জাতক বেঠিক তালে নাচে
বছর কয়েক অনেক বুঝি বড়
দিনের বদল গত দিনের ধাঁচে।

জলের নীচে নিলাজ শরীর দোলে
জলবাসীরা বেজায় দম্ভে হাসে
রাত বুড়িয়ে ঘুমের খবর নিলে
নিঃঘুম দু'চোখ তুলবে রাতের শেষে।

আকাশ ভেঙে খসলে ধ্রুবতারা
আত্মরতির হিসেব যাবে চুকে
মস্ত বড় দেয়াল জুড়ে কারা
আঁচড় কেটে আঁকল ভূগোল টুকে।

হাতের উপর হাত রেখেছে বয়েস
হিসেব করে ধার বাকিতে শোধ
নিয়ম ছেড়ে বেনিয়মের আয়েস
সবাই বলে লোপ পেয়েছে বোধ।।

সাঁকো পেরিয়ে

অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাঁকোর এপারে ঠাঠা রোদ্দুর
ওপারে সবুজ বনানী,
তারও পরে পর্বতমালা
আকাশের কোলে খেলে বেড়ায়।

সাঁকোর এপারে
চঞ্চল জীবনকাব্য দুরন্ত যৌবনকাল
ভালবাসা আর স্বপ্ন
ওপারে নিঝুম নিস্তব্ধতা
হিমশীতল মৃত্যুর হাতছানি, তমসাঘন আঁধারভূমি।

সাঁকোর এপারে
আমি দাঁড়িয়ে
মাথার ওপর থেকে দিন ঢলে পড়ে পশ্চিমে,
এক পা এক পা করে সন্ধের সিঁড়ি ভাঙা
ঘরে ফেরার পালা, একে একে ফিরে যায় সব।

তবু আমি ঠায় দাঁড়িয়ে।
রাত গভীর হ'লে শ্লথ পায়ে সাঁকোর ওপরে আমি
সাঁকো থেকে নদীর জলে অন্ধকার সাক্ষী রেখে
আবার অতীত গ্লানি-বেদনা
সুখ-দুঃখ আনন্দ-হতাশা-সব
ভাসিয়ে দিয়ে
সাঁকো পেরিয়ে ওপারে চলে যাই।

পেছনে পড়ে থাকে সাজানো সংসার
পরিচিত মানুষজন

আকাশজুড়ে তারার মেলা আমাকে পথ দেখায়।

চাকরিমঙ্গলকাব্য

মেঘ মুখোপাধ্যায়

চাকরি আমায় অন্ন জোগায়
চাকরি আমায় খায়
চাকরি এমন দু'মুখো সাপ
জব্দ করা দায়।

চাকরি চেয়ে হন্যে হয়ে
ঘোরে জগৎবাসী
আমি দেখি কী দুর্দশায় বেকার পড়োশি
চাকরিহীন যুবাপুরুষ সদা হাপিত্যেশি।

অথচ আমি চাকরিমান
অন্ধরাজ্যে যেন চক্ষুষ্মান
চাকরি আমার শেলেট পেনসিল
খোকাখুকুর মুখে দুধ জোগান।

পত্নী আমার বেজায় সুখী
আমায় সুখে রাখেন
বিকেলবেলায় চুলটি বেঁধে
পাউডারটি মাখেন।

চাকরি আমায় অন্ন জোগায়
চাকরি জ্বালায় পোড়ায়
ভিতরকার মানুষটা যে ধিকিধিকি ক্ষয়
বিবাদ বাধে কেবল আগা গোড়ায়।

চাকরি-জোয়াল টানব না আর
হঠাৎ দেব ছেড়ে
কত কী বাকি পড়ার লেখার ঘোরার
জগৎটাকে দেখব নেড়েচেড়ে!

'চাকরি ছাড়লে খাবটা কী!'
বিস্ময়ে থ বজ্রাহতা স্ত্রী
চাকরিজীবী বলেই কদর
এ সংসারের এমন কেরামতি।

চাকরি যাঁতায় পেষাই হয়ে
লক্ষ্মী হলেন খুশি
তেল বেরল, স্নিগ্ধ গেরস্থালি —
আর কল্পকুসুম শুকিয়ে কাঠ
সরস্বতীর ফাঁসি।

চাকরির বড়ই চতুরালি!
কেম্‌ন ছাড়ি কেম্‌নে রাখি
চাকরি আজব চিজ
ফাঁদে পড়ে ছটফটিয়ে 'হায় আল্লা' ডাকি
মেঘের অভাবে খেতে মরে কাব্যবীজ।

ধারাবাহিক আত্মকথা

আলোছায়ার পথিক

তাপস সেন

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

রক্তকরবী প্রথম অভিনয়ের পরই খুব সাড়া জেগেছিল। তারপর দিল্লিতে নতুন আধুনিক মঞ্চ তৈরির প্রস্তাব এল অনিল রায়চৌধুরীর কাছ থেকে, ওঁকে আমি দিল্লি থেকেই জানতাম চিত্রশিল্পী সারদা উকিলের ছাত্র ছিলেন এবং একই সঙ্গে মুষ্টিযোদ্ধাও (বক্সার) ছিলেন। উনি নতুন দিল্লির 'অল ইন্ডিয়া ফাইন আর্টস এন্ড ক্র্যাফটস' (আইফ্যাক্স) এর সূচনা থেকেই উদ্যোগী ছিলেন। সেদিনের দিল্লীর ওল্ডমিল রোডে (বর্তমানে রফি মার্গ) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার Hutents আইফ্যাক্সের জন্য প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন, মনে আছে চেকশ্লিশ সালে ওইখানেই দেখতে গিয়েছি— নিকোলাস রোয়েরিখের আঁকা নিসর্গ চিত্রের অসাধারণ প্রদর্শনী।

তারপর অনেক বছর পরে বোধহয় তিপ্পান্ন সালে পুতুলদার (অনিল রায়চৌধুরীর ডাক নাম) কাছ থেকে খবর এল প্রস্তাবিত আইফ্যাক্সের আলোর কাজ করার। চুয়ান্ন পঞ্চান্ন দু'বছরে দিল্লি তথা সারা ভারতেরই অন্যতম নাট্যমঞ্চ উদ্বোধনের জন্য তৈরি হয়ে গেল। পুতুলদা ১৯৫৬ সালে উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রথম অভিনয় শম্ভুমিত্র বহুরূপীর নাটক রক্তকরবী করতে আগ্রহী হয়েছিলেন।

অবশেষে নির্ধারিত দিনে মহাসমারোহে আইফ্যাক্স উদ্বোধন সন্ধ্যায় অভিনয়ের কিছু আগে কর্তৃপক্ষের কাছে খবর এল প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল ঠিক সময় আসতে পারবেন না। পার্লামেন্টে জরুরি কাজে আটকে পড়েছেন। অতএব উদ্যোক্তাদের অনুরোধ আমরা যেন অভিনয়ের শুরুটা একটু দেরিতে করি। কারণ নেহরু এলেই প্রচণ্ড চাঞ্চল্য হবে এবং অভিনয়ে ব্যাঘাত হতে পারে।

শম্ভু মিত্রর কাছে এ খবর যেতে উনি সোজা বলে দিলেন অনুষ্ঠানের কোনও পরিবর্তন হবে না। নির্ধারিত সময়েই অভিনয় শুরু হবে। হলও তাই — ঠিক থার্ড বেল বাজল, সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত নেহরু প্রবেশ করলেন — কোনও গোলযোগ হয়নি।

শম্ভু মিত্র-তৃপ্তি মিত্রের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা আজ থেকে ঠিক পঞ্চান্ন বছর আগে বম্বেতে (মুম্বাই নয়)। দেখা হয়েছিল আলাপ হয়নি, কারণ সে দিন ওঁদের দেখেছিলাম ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সিনেমা 'ধরতীকে লাল'-এ যার নির্দেশক খাজা আমেদ আববাস ও সহ-নির্দেশক ছিলেন শম্ভু মিত্র। সঙ্গীত রবিশঙ্কর আর টাইটেলে প্রথমেই একটা লাইন :

"PEOPLE'S THEATRE STARS THE PEOPLE"

তারপর বম্বে ছেড়ে আমি কলকাতায় এলাম সাতচল্লিশে। আমার পাশের কামরায় ছিলেন শম্ভু ও তৃপ্তি। সঙ্কোচে দ্বিধায় ইচ্ছে থাকলেও আলাপ করতে পারিনি — ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস থেকে হাওড়া স্টেশন এই দীর্ঘ রেলযাত্রার পথে।

শম্ভু মিত্রের নাট্যপ্রচেষ্টায় বহুরূপীর প্রায় সূচনা থেকেই আমি কাজ করেছি। কিন্তু সেই প্রথম চলচ্চিত্র দর্শনের পর আমার মনে আসে রক্তকরবীর অসামান্য সাফল্যের পর শম্ভু মিত্র আর একবার চলচ্চিত্র সৃষ্টিতে হাত দেন। ওঁর দীর্ঘ কালের ঘনিষ্ঠ শ্রদ্ধেয় পৃথ্বীরাজ কাপুরের পুত্র রাজ কাপুরের আগ্রহে উনি রাজি হলেন চিত্র নির্মাণে। শম্ভুদার কাছেই শুনেছি রাজ কাপুর বলেছিলেন চিত্রনাট্য কাহিনি হবে শম্ভু মিত্রের — রাজ নাকি বলেছিলেন হয় আমি পরিচালনা করব, তুমি প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবে কিংবা তুমি নির্দেশনা করবে আর আমি অভিনয় করব। শম্ভু মিত্র প্রথমটাতে আগ্রহী হলে সব পাকা কথা হয়ে যায় — সে সময় শম্ভুবাবু বলেন, 'পরিচালনায় আমার সঙ্গে যুগ্মভাবে থাকবেন অমিত মৈত্র — আমরা চলচ্চিত্রের কাজ এক সঙ্গেই করে থাকি।' রাজ তো অবাক — শম্ভুদা কিন্তু তাঁর সেই কথায় রাজকে রাজিও করিয়েছিলেন। তবে এটা তো একটু অপ্রত্যাশিত ঘটনা রাজের কাছে, অপরিচিত অজানা নামের একজনকে সমান মর্যাদায় স্বীকৃতি দিতে হবে। তবে শেষ পর্যন্ত রাজকাপুর সম্মতিও দিলেন। তারপর দীর্ঘদিন ধরে চলল সে ছবির শুটিং — বম্বে ও কলকাতায়। 'একদিন রাত্রে' ও হিন্দি 'জাগতে রহো' সাফল্যও লাভ করে। আন্তর্জাতিক সম্মানও এনেছিল শম্ভু মিত্র—অমিত মৈত্রর যুগ্ম পরিচালনায় — সঙ্গীতে ছিলেন সলিল চৌধুরী, অভিনয়ে রাজ, ছবি বিশ্বাস মোতিলাল, পাহাড়ী সান্যাল এবং একটি বিশেষ চরিত্রে নার্গিস।

২০০১ সালের ঠিক মাঝখানে। জুন মাস। গত কাল রাতে একটা স্বপ্ন দেখলাম। কোনও একটা নাটকে আমি নানা রকম রঙ

দিয়ে আলো করছি। কুলুঙ্গিতে রাখা ত্রিমাত্রিক একটি মূর্তি। পিঙ্ক আর চকলেট জাতীয় রঙ দিয়ে আলোটা করবার চেষ্টা করলাম। সেই নাটকে অন্য রকম একটা কস্টিউম পরে তৃপ্তি মিত্রও আছেন। কিছুক্ষণ বাদে আমি বললাম, রঙটা ভাল লাগছে না। বললাম, মেটে সিঁদুরি কোনও রঙ হলে ভাল হয়। নিজের সঙ্গে নিজে নানা রকমের যুক্তিতর্ক করতে লাগলাম। বললাম, এটা শম্ভুবাবুরও ভাল লাগবে না। উনি রঙ সম্পর্কে খুব সজাগ থাকতেন। অনেক আগে থেকে ভাবতেন কোন রঙ কীভাবে ব্যবহার করবেন। ফলে এই রঙটা তাঁরও পছন্দ হবে না। এগুলি সবই আমার গত কালের স্বপ্নের কথা। তারপর ভাবলাম, আচ্ছা এ রকম স্বপ্ন আমি কেন দেখলাম? শম্ভুবাবু, তৃপ্তি মিত্র ওঁরা কেউ আর নেই। তবুও কেন স্বপ্নে এই ছবি এল? অনেক ভেবে মনে হল 'চার-অধ্যায়' প্রযোজনার কথা। সমগ্র প্রযোজনায় রঙের ব্যবহার প্রায় ছিল না। একটা মাত্র জায়গায় — এলারূপী তৃপ্তি মিত্রর ঘরে একটা কালী মূর্তির ছবি ছিল। সেখানে অন্তু মানে শম্ভু মিত্র একটি দৃশ্যে চিঠি মারফত একটা গোপন বার্তা পান। তারপর কালীর ছবির সামনে একটা দেশলাই দিয়ে সেই চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলেন। ওই দৃশ্যে কালীমূর্তির সামনে জবা ফুলের আড়ালে একটা ছোট লাল আলোর কাঁপা কাঁপা আভাস ছিল।

শম্ভু মিত্রের সঙ্গে আমার কাজের শুরু 'পথিক' থেকে। তারপর আরও অনেক কাজ। উলুখাগড়া, ছেঁড়াতার — এ রকম কত। তাঁর একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব ছিল; নাটক নিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ভাবতে পারতেন। আগ বাড়িয়ে ভাবার ক্ষমতা ছিল তাঁর। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, ১১এ নাসিরুদ্দিন রোডের বাড়ি, তিনি সংগঠক হিসাবেও অসাধারণ ছিলেন। সংগঠনের শুরুতে তাঁর সঙ্গে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মহম্মদ ইসরাইল, কলিম সরাফী। সংগঠন চালাতেন খোলামেলাভাবে, কিন্তু বাইরে থেকে কেউ শো বা অন্য কোনও ব্যাপারে কথা বলতে এলে উনি কথা বলতেন না, একটা দূরত্ব রাখতেন। আলোচনায় থাকতেন না। বিভাগীয় লোকেরাই কথা বলতেন। তাঁর ভাবনার বাস্তবায়ন করতে তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবে ভেবে চিন্তে পদক্ষেপ করতেন। কিন্তু চলার পথে তাঁরও যে ভুল হয়নি তা নয়। তাই পরবর্তীকালে তুলসী লাহিড়ি, মহঃ ইসরাইল, সবিতাব্রত দত্ত, গীতা ভাদুড়ি এ রকম অনেকেই দল ছেড়ে দিয়েছিলেন। কাজের ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝির ফলেই তাঁরা ছেড়েছিলেন। দল চালনার ক্ষেত্রে তিনি কতগুলি কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে চলতেন। তার ফলে ফারাক তৈরি হয়ে যেত। যারা সেই সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিলতে পারতেন না তাদের চলে আসা ছাড়া উপায় ছিল না। ফলে বহুরূপীতে কখনও কখনও চরম সময় এসেছে। ওঁর সঙ্গে বহু মানুষের পরিচয় ছিল। বিষ্ণু দে, দেবব্রত বিশ্বাস, চিন্মোহন সেহানবীশ জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এ রকম বড় মাপের মানুষেরা ওঁর বন্ধু ছিলেন। কিন্তু ওঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের কাছে দল এবং দলের মানুষেরা সব সময় স্তম্ভিতে থাকত না। ওঁর রাজনৈতিক ভাবনা অত্যন্ত স্বচ্ছ ছিল। তবে সেই ভাবনার ছাপ প্রযোজনাগুলির মধ্যে ছিল। সেই রাজনৈতিক ভাবনা সবসময় যে সেই সময়ের মানুষের কাছে পৌঁছে ছিল তা মনে হয় না। এখন অনেক দিন বাদে মনে হয়, শম্ভুবাবু সব কাজটাই বা সব ভাবনাই যে ঠিক করেছিলেন তা হয়ত নয়। নিজের কঠিন ভাবনার রেশ তার নিজের জীবন, দল, আমরা যারা ঘনিষ্ঠ ছিলাম তাদের মধ্যেও পড়েছে। আমরা অনেক কিছু জানতাম, শুনতাম, সব সময় যে খুশি হতাম তা নয়, কিন্তু এর ফলে তাঁর জীবনের একাকিত্ব, সকলের আড়ালে নিজেকে গুটিয়ে নাওয়া — এ সব দেখেছি আমরা। এগুলি নিয়ে অনেক ভুল বোঝাবুঝি আছে, প্রচার আছে।

তাঁর নানা পরিকল্পনার মধ্যে ছিল বাংলা নাটমঞ্চ সমিতি। তিনি কী পরিশ্রম করেছিলেন তা আমরা দেখেছি। বড় বড় মানুষদের এক জায়গায় জড়ো করে অনেক দূর এগিয়ে ছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। অথচ তাঁর মতো একজন মানুষ যদি নির্দিষ্ট একটা জায়গা পেতেন তা হলে থিয়েটারেরই লাভ হত। অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন তিনি। আমি তেমন ভাবে এ কাজে যুক্ত ছিলাম না কিন্তু পরিশ্রমটা জানি। এখন যখন কাগজে দেখি মণিপুরে রতন থিয়াম থিয়েটারের সমস্ত রকম লোকদের নিয়ে কত বড় একটা কাজ করে ফেলেছেন তখন ভাবি, শম্ভু বাবু যদি এটা করতে পারতেন। সারা দেশ জুড়ে তাঁর পরিচিতি ছিল, দিল্লিতেও তিনি যথেষ্ট সম্মানিত ছিলেন, অনেক লোক তাঁর পাশে ছিলেন, নানা সরকার এসেছে এবং গেছে কিন্তু শম্ভুবাবু নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করতে পারলেন না। এমন কতগুলি বাধা এসে পড়েছিল যার ফলে করা যায়নি। এখন আমরা কাগজে, পত্রিকায় ওঁকে নিয়ে কত লেখা লিখছি, স্মরণ করছি কিন্তু শম্ভুবাবু যা চেয়েছিলেন তা দিতে পারিনি। শিশির ভাদুড়ি যা চেয়েছিলেন তাও দেয়া যায়নি। সরকারি নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে বিধানচন্দ্র রায় বলেছিলেন, সরকারের নিয়ন্ত্রণ, হিসাব নিকাশের নিয়ন্ত্রণ মানতে হবে। শিশিরবাবু তা মানতে পারেননি বলে তাঁকেও সরে যেতে হয়েছিল। শেষ জীবন তাঁরও ছিল একাকিত্বের জীবন। সরকারি খেতাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। উদয়শংকরও পাননি। তিনি তো সব দিক থেকেই যোগ্য ছিলেন। অথচ শেষ পর্যন্ত যে ভাবে কাজ করতে চেয়েছিলেন তা করতে পারেননি। শেষ জীবনে তিনিও একা জীবন কাটিয়েছেন। আমার এখন মনে হয় এর জন্য ব্যক্তিগত ভাবে তাঁদের যেমন দোষ ছিল, দোষ ছিল আমাদেরও। আমরা যারা তাঁর সহযোদ্ধা ছিলাম, তাদের। শম্ভুবাবু কখনও কারও মন জুগিয়ে চলতে চাননি। এ নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হয়েছে, বারবার, একাধিকবার, বহুরূপী পরিচালনার ক্ষেত্রে নিদারুণ কঠোরতা দেখিয়েছেন। কিন্তু নির্মম পরিহাস, সেই নাট্যদল — যা তিনি নিজে গড়েছেন, একটু একটু

করে সেখানে তিনি থাকতে পারলেন না, থাকতে পারেননি তৃপ্তি মিত্র, থাকতে পারল না তাঁদের কন্যা শাঁওলী মিত্র। তাঁদের নিজ দৃষ্টিতে স্বতন্ত্র কারণেই।

আমি এবং খালেদ চৌধুরী বহুরূপীর সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলাম। কখনও কখনও সরে এসেছি। আবার গিয়েছি। তবে আমরা দু'জনেই বহু প্রযোজনায় একত্রে কাজ করেছি। সব সময় যে নিজের মতো করে করতে পেরেছি তা নয়, শম্ভুবাবুর ভাবভঙ্গি দেখে তা করা যায়ওনি। কিন্তু সেগুলির উল্লেখ করা এখন অশোভন দেখায়। তাই আমি উল্লেখ করতে চাইছিনা। আজ ভাবতে কষ্ট হয়, কেন আমরা তাঁকে কাজ করতে দিলাম না। অবসর জীবনেও তিনি তরুণতর নাট্যকর্মীদের কাজ দেখতে এসেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন। কিন্তু নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি গড়ার সময় দাবি এবং পালটা দাবি করে কাজটাকেই করতে দেওয়া হল না। অথচ তার ভাবনাচিন্তার কথা যতটুকু শুনেছিলাম তাতে মনে হয়েছিল নাটমঞ্চ হলে ভালই হত। 'চাঁদবণিকের পালা'র মতো প্রযোজনা হয়ত করতে পারতেন। তা না করে সময়ের আগেই তাঁকে অকর্মণ্য করে দেওয়া হল। পরে কালের নিয়মে অসুস্থ হয়েছেন কিন্তু কাজের সময় কাজ করতে পারেননি। রাজনৈতিক ভাবনার দিক থেকেও তাঁকে অনেক সময়ই ভুল বোঝা হয়েছে। এ রকম ভুল রাজনৈতিক মানুষেরা আরও অনেকের সম্পর্কেই করেছেন। আমার বন্ধু উৎপল সম্পর্কেও ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে অনেক সময়, ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কেও হয়েছে। তবে জনমানসে এঁদের জয়যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। এখনও জনমানসে এঁদের প্রভাব রয়েছে।

আমিই বোধহয় একমাত্র মানুষ যে শম্ভুমিত্র এবং উৎপল দত্তর সঙ্গে একই সময়ে কাজ করেছি ওতোপ্রোতভাবে। দু'জনেরই কতগুলি ব্যাপারে মিল ছিল আবার অমিলও ছিল। যেমন দু'জনেরই পাবলিক থিয়েটার সম্পর্কে কেমন একটা ধারণা ছিল। আমি ঠিক বুঝেছি কি না জানি না, তবে মনে হত ভাবনাটা সঠিক নয়। এক বার বিশ্বরূপার পক্ষ থেকে উৎপল দত্তর কাছে প্রস্তাব এল ওখানে কাজ করার জন্য। উৎপলরা ভাবল বোধহয় পুরো দলকে কাজ করতে ডেকেছে। তাই মহা আনন্দে ওরা রাজি হয়ে গেল। কিন্তু দক্ষিণেশ্বর সরকার বললেন, না সবাইকে নয়, সবাইকে কে চেনে? আমরা উৎপল দত্ত শোভা সেনকে চাইছি, আমরা ব্যবসা করতে বসেছি। সেই ব্যবসায় সকলকে দরকার নেই। এ কথা শুনে ওরা রাজি হলেন না। কেউই বিশ্বরূপায় কাজ করতে এল না। এক বার রঙমহল ঠিক করল নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'দূরভাষিণী' নাটকের জন্য বহুরূপীর ক'জনকে ডাকা হবে। এবার কিন্তু বহুরূপীর ক'জনকে নেওয়া হল। সেখানে রিহার্সালও চলেছে। কিন্তু হঠাৎ এক দিন কী একটা কারণে শম্ভুবাবুরা আর এলেন না। বিশ্বরূপার 'ক্ষুধা' নাটকের সময় বহুরূপীর একজন এসেছিলেন। তমাল লাহিড়ি তার নাম। কিন্তু তার মাইনেপত্র ছিল খুব খারাপ। খুব সুনজরে বহুরূপী তাকে দেখেনি। পরে এখানে যখন তৃপ্তি মিত্র এলেন তখন কিন্তু অত্যন্ত সম্মানজনক শর্তে তাঁকে দিয়ে কাজ করিয়েছিল বিশ্বরূপার 'সেতু' নাটকে।

একটা ঘটনার কথা বলি। আজকের রবীন্দ্রসদন মানে তখন ছিল 'রবীন্দ্র স্মরণী', সেই স্মরণী উদ্বোধন নিয়ে আমাদের আন্দোলনে নামতে হয়েছিল। হলের সামনে ভাঙা লরিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা, মিছিল করা — এ সব করতে হয়েছিল।

সেই আন্দোলনে আমি, সবিতাব্রত দত্ত — আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলাম। শিল্প সংস্কৃতি জগতের সকলেই তাতে ছিলেন।

পরে ১৯৬৮ সালের ঘটনা। তখন যুক্তফ্রন্ট সরকার এসেছে। সংস্কৃতি মন্ত্রী ছিলেন আমাদের বন্ধু জ্যোতি ভট্টাচার্য। তিনি আহবান করলেন উৎপলকে প্রভাতী অনুষ্ঠান করবার। এর আগে আমরা রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে হলের বাইরে প্রতিবাদী প্রভাতী অনুষ্ঠান করতাম। কিন্তু এবার যুক্তফ্রন্ট সরকার। তারাই ডেকেছে অনুষ্ঠান করবার জন্য। সকালে উৎপল দত্তকে ডাকা হল অনুষ্ঠান অরগানাইজ করার জন্য আর বিকালের অনুষ্ঠানের জন্য ডাকা হল শম্ভু মিত্রকে। এটা যখন জানাজানি হয়ে গেল তখন দুটো দল দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। ক্রমে সেটা রাজনৈতিক দলাদলিতে চলে গেল। দু'দলেই সমর্থক সংখ্যা অনেক। ফলে লড়াইটা বেশ খারাপ জায়গায় চলে গিয়েছিল। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকায় অমল রায়ের একটা লেখায় সেই ঘটনার উল্লেখ দেখলাম। তখন জনমানসে উভয় ব্যক্তিকে নিয়ে কী প্রতিক্রিয়া তার উল্লেখ আছে তাতে।

'রবীন্দ্র স্মরণী' যখন 'রবীন্দ্র সদন' হল তখন একটা কমিটি হয়েছিল। হঠাৎ শুনলাম সেই কমিটিতে শম্ভু মিত্র এবং সত্যজিৎ রায় আছেন। পুরো আন্দোলনটার সঙ্গে আমি জড়িত ছিলাম। তাই এ ঘটনা জানার পর যখন তাঁদের ফোন করলাম, দু'জনেই জানালেন, 'কই, আমি জানি না তো।' তাঁদের এ কথা কেউ বলেনি। অথচ আমি পরে ফোন করে কর্তৃপক্ষের কাছে যখন এ ব্যাপারে জানতে চাইলাম তখন ওরা জানাল, সত্যজিৎ রায় এবং শম্ভু মিত্রকে কমিটিতে থাকবার জন্য যে চিঠি দেওয়া হয়েছিল তারা তার কোনও উত্তর দেননি বা প্রতিবাদও জানাননি। ফলে কর্তৃপক্ষ মনে করেছেন দু'জনেরই সম্মতি আছে, তাই ওদের কমিটিতে রাখা হয়েছে। এ ঘটনাটা আমার কাছে অত্যন্ত দুঃখের এবং ক্ষোভের। তখন যে সমস্ত সাংস্কৃতিক আন্দোলন পথে-ঘাটে, মিটিং-মিছিল করে করতে হয়েছে তাতে যতটা সক্রিয় ছিলেন উৎপল দত্ত, ততটা কিন্তু শম্ভু মিত্র নন। তিনি যে দূরে সরে থাকতেন তা নয় কিন্তু একটা দূরত্ব রেখে চলতেন। যতটা আমরা আশা করতাম সব সময় ততটা পেতাম না। উৎপল দত্ত, শম্ভু

মিত্র আমার শ্রদ্ধেয় হলেও এটা সত্য। উৎপল দত্ত যখন নাট্য অ্যাকাডেমির সহ সভাপতি তখনও দেখেছি অ্যাকাডেমির ব্যাপারে কোনও তিক্ততা তৈরি হলে উনি (উৎপল) ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন, নানা রকম ভাষা ব্যবহার করতেন। যখন বলতাম, আপনি এসব বলছেন কেন? আপনি তো সহ সভাপতি। তখন বলেই বসতেন, কে সহ সভাপতি? — অথচ এ সব বলেও তিনি সহ সভাপতি ছিলেন। দু'জনেই সরকারি নানা কমিটিতে ছিলেন বটে। কিন্তু কেউই আসতেন না। উৎপলকে দু'একবার মিটিংয়ে অবশ্য আসতে দেখেছি।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্বে রবীন্দ্রজয়ন্তী নিয়ে দলাদলিতে আমি, সবিতাব্রত দত্ত আমরা সব মুসড়ে পড়েছিলাম। সেটাই স্বাভাবিক ছিল। রাজনৈতিক অঙ্গুলিহেলনে এবং দু'জনেরই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতায় এই দলাদলি বেশ তিক্ততার জায়গায় পৌঁছেছিল। অথচ দু'জনেই এ ধরনের ব্যাপারকে একটু সিনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতেন। একাডেমির ব্যাপারে উৎপল দত্ত যেমন, আবার রবীন্দ্রভারতীর নাটক বিভাগের প্রধান হিসাবে শম্ভু মিত্র খুব একটা কিছু করবার চেষ্টা করেছেন বলে আমার মনে হয়নি। যদিও কাছ থেকে ব্যাপারটা জানি না কিন্তু দূর থেকে দেখেই এটা আমার মনে হয়েছে। উৎপলের একটা প্রতিষ্ঠান বিরোধী মনোভাব সব সময়ই ছিল। আমার মনে আছে সঙ্গীত নাটক একাডেমি পুরস্কারের জন্য উৎপল যখন নির্বাচিত হলেন তখন "তোমার পুরস্কার তোমারি থাক শাহেন শা" বলে দীর্ঘ একটি কবিতা লিখেছিলেন। এই রকম কন্ট্রাডিকশন এঁদের মধ্যে ছিল। আমাদের সবার মধ্যেই এই দোষগুণ আছে। ওঁদেরও ছিল। আমরা সব মধ্যবিত্ত মানুষ। আমরা কত দূর বিপ্লবী হয়ে উঠব আর কত দূর সংস্কারপন্থী শোধনবাদী হতে পারব এটা সব সময় বুঝে উঠতে পারি না। ফলে সব সময় ঠিক কাজটা করা যায় না। ওরাও সব সময় ঠিক কাজ করেছেন তা তো নয়। সেটা হলে ভাল হত কিন্তু হয়নি। শম্ভুবাবু যখন 'চার অধ্যায়' করেন তখন প্রচণ্ড সমালোচনার মধ্যে পড়তে হয়েছে তাঁকে আবার যখন 'রক্তকরবী' করেন — মূল নাটকের শেষাংশ বাদ দিয়ে যখন সংলাপ শোনা যায় — 'চল ভাই লড়াই-এ চল' তখন মানুষ তাঁকে দু'হাত তুলে স্বাগত জানায়। এর পরেও তিনি বহু নাটক করেছেন — 'পাগলা ঘোড়া', 'রাজা', 'বর্বর বাঁশী' এ রকম অনেক নাটক। সব মিলিয়ে একটা ভাবনার প্রকাশ পেয়েছে। তারপর আর কাজ করেননি বহুদিন। তা নিয়ে এবং ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারস্যাপার নিয়ে অনেকে অস্বস্তিকর প্রশ্ন তোলেন, সত্য-অর্ধসত্য জেনে মন্তব্য করেন — আমি তাঁদের সঙ্গে এক মত নই। তাঁদের মতো মানুষের বিচার এ ভাবে করা সম্ভব নয় বলেই মনে করি।

সেই আটষট্টি সালের শম্ভু মিত্র উৎপল দত্তদের নিয়ে সংকটের সময় আমার মনে হল, দূর এসব 'থিয়েটার্রি ঝামেলায়' আর থাকব না। তখন কলামন্দিরে বসে থিয়েটার-মানুষ এ সব বাদ দিয়ে আলো-ছায়া-রঙ নিয়ে নানা ভাবে পরীক্ষা শুরু করে দিলাম। নিজে কিছু পয়সা খরচ করে, কলামন্দিরের জিনিসপত্র নিয়ে অনেক দিন কাজ করেছি। তার কিছু কিছু আমি বিদেশে (ব্র্যাডফোর্ডে '৯৩ সালে) দেখিয়েছি। শম্ভু মিত্র উৎপল দত্তকে কেন্দ্র করে দলাদলির সময় আমার এ রকম মনোভাব হয়েছিল। আমি শিক্ষামন্ত্রী জ্যোতি ভট্টাচার্যকে এ নিয়ে যখন বলতে গেছি তখন উনি বললেন, আপনারা আর্টিস্টরা কখনও মিলেমিশে কাজ করতে পারেন না। আমি বললাম, হ্যাঁ, তখন উনি পাশে বসা একজনকে দেখিয়ে বললেন, চেনেন ওঁকে? আমি বললাম, না, উনি বললেন, ইনি হচ্ছেন হরেকৃষ্ণ কোঙার। আমি বললাম, আপনার নাম এত শুনেছি কিন্তু চিনতাম না। এর পরে ওঁকেও বললাম, হ্যাঁ আমরা দলাদলি করি বটে তবে তা শিখেছি রাজনীতির লোকেদের কাছ থেকে। এ কথা হরেকৃষ্ণ কোঙারকেও বলেছিলাম।

শম্ভু মিত্রের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করার আছে। যেমন তাঁর অন্যতম একটি কাজ হল, খালেদ চৌধুরীকে নাটকের সঙ্গে যুক্ত করা। খালেদের সঙ্গে মিত্র পরিবারেরর দীর্ঘ দিনের যোগাযোগ ছিল। সেই খালেদ বোধহয় ১৯৫৩ সালে 'ধর্মঘট' নাটকের কাজে যুক্ত হলেন। সঙ্গীতের কাজ এবং কিছু এঁকে দিয়েছিলেন বোধহয়। কিন্তু যখন রক্তকরবী করবার কথা শম্ভু মিত্রের মাথায় এল তখন খালেদকে নিয়ে ভাবলেন এবং তাকে দিয়ে কাজ করালেন। বোধহয় কার্ড বোর্ড দিয়ে মঞ্চের আদলটা তৈরি করেছিলেন। সেই কাজে শীতাংশু মুখোপাধ্যায়, তারপর যমুনা মিত্রি এরা সব সহযোগিতা করেছিলেন। শুধু মঞ্চ নয়, পোশাক, সঙ্গীত — এ সবই খালেদ করেছিল। রক্তকরবীর ভাবনায় খালেদ একেবারে মজে গিয়েছিল। এখন ভাবলে আশ্চর্য লাগে শিয়ালদার ই.বি.আর ম্যানসন হলের মতো ছোট হলে এক দিনের রিহার্সালে ওই মঞ্চ আলো সব পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে নাটকটা নামানো হয়েছিল। ১৯৫৪ সালের ১০মে শুরু হয়েছিল নাটকটা। তারপর সারা দেশ জয় করেছিল 'রক্তকরবী'। এই জয়ের পিছনে খালেদের অবদান আছে। তারপর বহুদিন খালেদ যুক্ত ছিল বহুরূপীর সঙ্গে। ওই পরিবারের এক জন হিসাবে কাজ করেছে। কিন্তু তাকে আবার বহুরূপী ছাড়তেও হয়েছে। সেই ছাড়ার দিনটার কথা মনে আছে। বোধহয় নিউ আলিপুরের কোনও এক বাড়িতে রক্তকরবী হচ্ছে। খালেদ নিজের হাতে ওই নাটকে বেহালা বাজাত। অদ্ভুত ছিল সেই বাজনা। সেদিন ওই সিঁদুরে মেঘের দৃশ্যে বাজনা শেষ করে নিঃশব্দে বেহালাটা বাক্সে ঢুকিয়ে কাউকে কিছু না বলে একটা ট্যাক্সি ধরে চলে গেল। আমরা সকলেই জানতাম। কিন্তু কিছু

বলতে পারিনি। দমবন্ধ করা সেই যাওয়াটা দেখেছি মাত্র। বহুরূপীর সঙ্গে খালেদের বহুদিনের সম্পর্কটা এ ভাবেই শেষ হয়ে গেল। অনেক দিন ধরেই নানা ব্যাপারে খালেদের সঙ্গে গোলমাল চলছিল। ছোটখাটো নানা রকম সংশয় হয়েছে মাঝে মাঝে। এক দিন শুনলাম খালেদ কোনও একটা বিজ্ঞাপনে নিজের নামটা দিতে রাজি হচ্ছিল না। তখন শম্ভুবাবু বললেন, "দিতে হবে। আমার এই নামটা ব্যালেন্স করার জন্য খালেদ চৌধুরী নামটা দিতে হবে। খালেদ বলেছিল, কোন নামটা? শম্ভুবাবু তখন আমার নামটা দেখিয়েছিলেন। খালেদ ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিল, ও আমার নাম যাবে ব্যালেন্স করার জন্য। — এ ঘটনা আমার কানে এসেছিল। এ সব ঘটনার মধ্যেই খালেদ চলে গেল বহুরূপী ছেড়ে। পরে অবশ্য তৃপ্তি মিত্রের প্রযোজনায় কাজ করেছে। কিন্তু বহুদিন বাদে শম্ভুবাবুর সঙ্গে খালেদ এবং আমি কাজ করেছি 'পাগলা ঘোড়া' নাটকে। আমিও মাঝখানে অনেক দিন বহুরূপীতে কাজ করিনি। এক দিন ফোনে শম্ভুবাবু বললেন, 'পাগলা ঘোড়া'য় কাজ করার কথা। তখন আমরা শ্যামানন্দ জালানের পরিচালনায় হিন্দি 'পাগলা ঘোড়া' করছি। সে কথা জানানোয় তিনি বললেন, 'ও! তা হলে তো আর হবে না!' আমি বললাম, কেন হবে না। আমরা তো পরিচালকের মতামত অনুযায়ী কাজ করি। ফলে এক জায়গায় করলে আর এক জন পরিচালকের সঙ্গে একই নাটক না করার কি আছে? নাটক এক কিন্তু পরিচালক তো এক নয়। সেই কাজটা আমরা করেছিলাম। ওই নাটকটা একাডেমিতে নিয়মিত অভিনয় করে মঞ্চটাকেই জনপ্রিয় করে তুললেন শম্ভুবাবু। ততদিনে নিউ এম্পায়ারের পাট চুকে গেছে। ফলে এই মঞ্চটাকে নিয়মিত করে তুলে একটা ঐতিহাসিক কাজ করলেন তিনি। আজকে একাডেমি নিয়ে নানা অসন্তোষ চলছে। লেডি রাধু মুখার্জি থাকাকালীন হলটা অন্য কর্তৃপক্ষের হাতে চলে গেছে; এখন খুব ভাল অবস্থায় নেই, তবুও আমার বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত এ সব অসন্তোষ কেটে যাবে। উত্তর কলকাতার কিছু হল নিয়ে সরকার, কর্পোরেশন এরা নানা রকম চিন্তা ভাবনা করছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হবে জানি না। লোকের মানসিকতা বদলে গেছে। এই হলগুলি আবার কীভাবে চলবে আমার জানা নেই। কলকাতার পুরনো হলগুলো সবই প্রায় বন্ধ। বহু কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। শম্ভুবাবুর নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠাও হয়নি। অথচ যখন তিনি বুঝতে পারলেন আর সম্ভব নয় তখনও ভেবেছেন কেউ যদি করেন। এই ভাবনা থেকেই ১৯৭৬ সালে নাটমঞ্চের নকশাটি তৈরি করেছিলেন। একজন বিশ্বস্ত মানুষের (রবীন পাল) কাছে নাটমঞ্চের পুরো প্ল্যান তুলে দিয়ে বলেছিলেন, আমি তো পারব না, দেখো তোমরা যদি পার? সম্প্রতি সেই drawing সেই প্ল্যান আমি দেখেছি। জানি না সেটাও বিস্মৃতির গর্ভে হারিয়ে যাবে কি না!

অনেক বিতর্কিত বিষয়ের মধ্যে মনে পড়ে — শম্ভু মিত্রের হুমায়ুন কবিরের জনসভায় যোগদানের প্রসঙ্গ, হয়ত কংগ্রেসি উদ্যমের কথা তিনি না জেনেই ওই সভায় যান — কিংবা জেনেই? আর এক বার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের উদ্যোগে 'আমাদের অঙ্গীকার'- এ ধ্বনি ও আলোক প্রযোজনা করেছিলেন ইডেন গার্ডেনে। তবু আমার মনে পড়ে এ সবের চেয়ে বড় হল ওই "বাংলা নাট মঞ্চের" conceptual নকশা, নীরবে নিজের স্বপ্ন কল্পনাকে বাস্তবায়িত করার বাস্তব প্রচেষ্টা — কেউই কি সেই নকশাকে সম্ভব করে উঠতে পারি না?

বছর কুড়ি একুশ আগে এক 'ঐতিহাসিক মুহূর্তে' কলকাতার ছটি 'অগ্রণী' নাট্যদল শম্ভু মিত্রকে নিয়ে ব্রেখটের নাটক 'গ্যালিলিওর জীবন' মঞ্চস্থ করেন জার্মানির নাট্য নির্দেশক ফ্রিৎজ বেনেভিট্জ এর পরিচালনায়। সেই সময়ে নাটকের উদ্বোধনের আগে হঠাৎ জানলাম যে দু'জন বিশেষ মানুষ ধরণী ঘোষ এবং শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনয়ের টিকিট না দেবার সিদ্ধান্ত হয় শম্ভু মিত্রের ইচ্ছায়। এ নিয়ে সংবাদপত্রে (আনন্দবাজার পত্রিকা) অনেক লেখালিখি হয়েছিল — আমিও উক্ত বিষয়ে কলকাতা নাট্যকেন্দ্র তথা আমার অনুজ সব নাট্যকর্মীর তথা শম্ভুবাবুর এই মনোভাবের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছি। আমি অনেক সময়েই শম্ভু মিত্রের এ ধরনের মানসিকতার সঙ্গে এক মত হতে পারিনি। কলকাতা নাট্যকেন্দ্রের প্রত্যেকটি উদ্যোগী নাট্যব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমার আজও ভাল সম্পর্ক আছে— তবু সে দিন তাঁদের বক্তব্য আমি একেবারেই সমর্থন করিনি। ছটি অগ্রণী নাটদলের নাম উল্লেখ করলাম না — ইতিমধ্যে ধরণী ঘোষ প্রয়াত। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নাট্যকেন্দ্রের নেতৃবৃন্দের সম্পর্ক বোধহয় ভালই। সেদিন আমার প্রতিবাদ ছিল 'ঐতিহাসিক' প্রয়োজনে, ১৯৮০ সালে। (ক্রমশ)

অনুলিখন : আশিস গোস্বামী

ছোট গল্প

ননীবালার পোকারা

হেদায়েতুল্লাহ

কলকাতার তিলোত্তমা গোছের ভাবটা অর্থাৎ লিপস্টিক ঠোঁটে ঝকঝকে নারীর মতো চেহারাটা এই গলির মোড়ে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। রাস্তার ওপর একরাশ ন্যাংটো ছেলেমেয়ে আর তাদের খিস্তি খেউড়, — গলিটাকে আরও দীনহীন ও বিবর্ণ করে তুলেছে। দু'ধারে সারি সারি ইঁট বের করা বস্তিঘর দাঁত খিঁচিয়ে যেন অভিশাপ দিচ্ছে গ্রহণলাগা মানুষটাকে। এই গলিরই সাতাশ নম্বরে দাওয়ার এক কোণে পড়ে আছে ননীবালা। যেমন রাস্তার কোণে পড়ে থাকে রিকসার ভাঙা চাকা কিংবা গাড়ির ফুটো টায়ার।

ননীবালার বয়স পঞ্চাশ ছাড়ালেও শরীরে ও মনে সে বেশ শক্ত-পোক্ত ছিল। কিন্তু এই ক'মাসে বাঁদিকের উরুতের ওপর একটা বেশ বড়-সড় ঘা আর তাতে কিলবিল করা অসংখ্য পোকারা তার জীবনটাকে ভয়ানক বিষময় যন্ত্রণাময় আর দুর্গন্ধময় করে তুলেছে। সংসারের একটা বাড়তি আবর্জনার মতো কাঠের চৌকিতে বসে দিনরাত বকবক আর গালিগালাজ করে।

টালির চালে, ল্যামপোস্টে অসংখ্য কাক ওড়াওড়ি করে। তার মধ্যে একটা মুরুব্বি গোছের দাঁড়কাক ননীবালার মুখের কাছে এসে বলে —

— কি গো ননীবালা! কেমন আছ? তোমার মরণের আর কদ্দুর? সকাল বেলাতেই এ রকম বে-আক্কেল কথাবার্তায় রেগে যায় ননীবালা।

লাঠি উঁচিয়ে সে বলে — দূর হ্, হতচ্ছাড়া! আমি মরব কেন? তুই মরগে যা।

কাকটা এবার একটু সরে গিয়ে সহানুভূতির গলায় বলে — আমি বলব কেন? ওই তো তোমার বউ ঘরের ভেতরে বসে বলছে — তুমি মরলে ওরা বাঁচে।

এবার থমকে যায় ননীবালা। তার কথা ঠিক। মনে মনে সে অনেক বার ভেবেছে — এর চেয়ে মরণ ভাল। কিন্তু পরক্ষণেই তার ভেতর থেকে একটা আপোষহীন সত্তা ফুঁসে উঠেছে। কেন সে মরবে? কি জন্যে মরবে? কার জন্যে সে মরবে? জীবনে কেউ তাকে ফাঁকি দিতে পারেনি। এক মাত্র ভগবান আর তার নিজের ছেলে দীনু — এই দু'জনে তাকে ঠকিয়েছে।

তার স্বামী বিপিন হাওড়ার শিবপুরের দিকে এক ঢালাই কারখানায় কাজ করত। একদিন খবর এল কারখানায় বিপিনের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। পাড়ার কর্তা অমল চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে ননীবালা গিয়ে দেখল — তার স্বামী ওখানেই মারা গেছে। বুকে মেশিন পড়ে, মুখ দিয়ে হলকে হলকে রক্ত বেরিয়ে, শেষ হয়ে গেছে সে। হাসপাতাল করার সময় হয়নি, নাকি পুলিশি হ্যাঙ্গামার ভয়ে মালিক তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়নি; — তা ননীবালার ঠিক মনে নেই। তবে ব্যাপারটা জানাজানি হোক — কানাকানি হোক — তা একদমই চায়নি কারখানার মালিক ফকো টিয়ারাম। পুলিশ, পোস্টমর্টেম, কোর্টকাছারি, পাড়ার ক্লাব, দলের নেতা — করতে গেলে তার ব্যবসা লাটে উঠবে। সে ননীবালার হাত ধরে বলল — বৌদি! যা হওয়ার তো হয়ে গেছে। ক্ষতিপূরণ বাবদ ষাট হাজার টাকা দিচ্ছি। তোমার ছেলে একটা ছোট মোট ব্যবসা করুক।

ভালুক বস্তির মেয়ে ননীবালা কম সেয়ানা আর ধড়িবাজ নয়। সেও বুঝেছিল থানা-পুলিশ আর কোর্টকাছারি সব বড়লোকের গলার অলংকার। চড়া পড়া গঙ্গার বুকের মতো তাদের পাঁজরা ঠেলে বেরোনো বুকে এত ধকল সইবে না। তাই ষাট হাজার টাকা হাতে নিয়ে সে রটিয়ে দিল তার স্বামী টি.বি.তে মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরেছে। পাড়ার নেতা অমল চক্রবর্তী কয়েকদিন ননীবালার পেছনে ঘুর ঘুর করেছিল। কিন্তু ননীবালা খাঁটি বুঝেছিল, অমলটা মাতব্বরি করে মাঝখান থেকে কিছু ঝেড়ে দেওয়ার তালে আছে। কিন্তু ননীবালাকে দেখে চিল শকুন সেলাম ঠোকে, ভয় পায়। কোন মেঘ থেকে কত জল গড়াবে আর কতটা তার ঘটিতে পড়বে — এসব মন্ত্র তার ভালভাবে শেখা আছে। অমল চক্রবর্তী তাকে ঠকাতে পারেনি। আসলে কেউ তাকে ঠকাতে পারবে না — এ রকম একটা দৃঢ় বিশ্বাস তার অনেক গভীরে শেকড় গেড়েছিল। কিন্তু না, তার ছেলে দীনুর কাছে গিয়ে তার শেকড় ধাক্কা খেয়েছে। নিজের পেটের ছেলের কাছে সে ঠকে গেছে। সেই ষাট হাজার টাকা দিয়ে দীনু অটোরিকসা কিনেছে। বিয়ে করেছে। বৌ ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘর-সংসার পেতেছে। আর তাকে — ওই যে ভাঙা টিনের মতো — ছেঁড়া চটের থলের মতো — সংসারের বাইরে টেনে এনে ফেলেছে।

শুধু দীনু নয়, একেবারে শেষ বেলা, স্বয়ং ভগবান এসেও তাকে ঠকিয়েছে। ভগবান তার বাঁ উরুতের ওপর ক্যানসার দগ্ধ ক্ষতের ছাপ মেরে, তার আয়ু থেকে ফাঁকি দিয়েছে দশ বছর — বিশ বছর — আরও হয়ত অনেক অনেক বছর। বছর খানেক আগের কথা, ছোট্ট একটা ডিসের সাইজের টিউমার হল। পাড়ার হোমিওপ্যাথ ডাক্তার গোবিন্দ বলল — ও কিছু না, মাসিমা! ওষুধ দিয়ে ফাটিয়ে বের করে দোব।

তা ওষুধে ফেটে গিয়ে মাসখানেকের মধ্যে সেটা একটা ছোটখাটো ফুলকপি সাইজের চেহারা নিল। ঘায়ের যন্ত্রণায় ননীবালা কাতরায় কিন্তু কাঁদে না। মায়ের কাতরানিতে দীনু কতটা ভিজল তা ভগবানই জানে। তবে চক্ষুলজ্জার খাতিরেই হোক আর পাড়ার লোকের কবাকবিতেই হোক, দীনু একদিন তাকে নীলরতন সরকার হাসপাতালে নিয়ে গেল। ডাক্তারেরা বলল — এ ঘা সারবে না। শরীরের অনেক — 'অনেক' গভীরে — মৃত্যুর বিনারা পর্যন্ত চলে গেছে। কাটা-ছেঁড়া, রেডিও থেরাপি — গুচ্ছের চিকিৎসা করেও কোনও সুরাহার আশ্বাস মেলে না সেখানে। দীনু আগেই বুঝেছিল। এবার পাড়ার লোককে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে — মায়ের পেছনে খরচা করা আর অটোরিকসার ফুটো ট্যাংকিতে তেল ঢালা একই ব্যাপার। ননীবালার থকথকে ঘায়ে কিলবিল পোকা, দীনু তাকে সংসার থেকে বের করে দিল।

দুপুরের দিকে, জলের কলের চার পাশে মেয়েলি কেচ্ছা-কেলেংকারি যেন ডাস্টবিনের ময়লার মতো রাস্তার ওপর এসে উপছে পড়ে। ননীবালার থালা-বাটি জলের গ্লাস সব আলাদা করে দিয়েছে দীনুরা। দুপুরের খাওয়া হয়ে গেলে, তার ওপর নীলমাছি ওড়াওড়ি করে। পাড়ার মাংসের দোকানের কুকুরটা এ সময় লালা ফেলতে ফেলতে ননীবালার কাছে এসে হাজির হয়। যেন সে খোঁজ নিতে আসে — ননীবালা কতটা এগিয়েছে মৃত্যুর কাছাকাছি। ধারালো দাঁত বের করে কুটিল হেসে সে বলে — হ্যাঁ গো, ননীবালা, এখনও বেঁচে আছ!

যমদূতটা যেন কুকুরের চেহারা নিয়ে তার কাছে আসে। তার মৃত্যুর খবরাখবর নিয়ে যায়। ভাত খাওয়ার পর সে একটু ঝিমুনি মেরে দাওয়ার ওপর শুয়ে পড়েছিল। কুকুরের শব্দে সে চমকে ওঠে। আকাশটা একটা ঠোঙার মতো তার চোখের সামনে দুলতে থাকে। এমন সময় হই হই করে অনেক লোকের সঙ্গে লালু মস্তানের ডেডবডিটা গলিতে এসে হাজির হয়। পুলিশের ভ্যান আগাপাশতলা ঘিরে থাকে। পালটা দলের কাটা কার্তিক গুলি করে মেরেছে তাকে। কান্নাকাটি আর চাপা আক্রোশ নিয়ে, পুলিশ পাহারায় লালু মস্তান চলে যায় নিমতলা শ্মশানে। এই গলি থেকে বেরিয়ে কেউ কেউ আর বাড়ি ফেরে না। হারিয়ে যায়, ফুরিয়ে যায়, চলে যায় অন্য এক অন্ধকার জগতে। দীনু অটোরিকসা চালালেও মাঝে মাঝে চুরি ছিনতাই করে। ননীবালার আগে ভয় হত। হয়ত তার ছেলেও একদিন হারিয়ে যাবে। কিন্তু এখন তার ছেলের ওপর টান নেই — ভয়ও নেই। কঠিন এক নির্মম জগতের মধ্যে সে বাস করে। এখানে কোনও দয়া নেই, মায়া নেই, শিকড়ের বাঁধন নেই। স্বার্থময় এক বিবর্ণ হাওয়া চারিদিকে ঘুরতে থাকে।

সন্ধ্যা নামলে, এই গলিতে আলো আঁধারির এক মায়াকাজল তৈরি হয়। ছোট ছোট ল্যাম্পপোস্টের মিটমিটে আলোয়

লোকজনের চোখে ঘোর নামে। তখন কেউ কাউকে চিনতে পারে না। এ সময়ে ঘনা পালের মেয়ে রেখা উগ্র সাজগোজ করে বাড়ি থেকে বেরয়। যাওয়ার সময় সে দু দণ্ড ননীবালার কাছে দাঁড়ায়। কেন দাঁড়ায়? ভবিষ্যৎ ভেবে সে কি ভয় পায়? অনেক পুরুষ সঙ্গ করা রেখাও কি এক দিন এমন ক্ষতময় যন্ত্রণায় দগ্ধ হবে? এখনকার উঠতি বয়েসের মেয়েদের ছলাকলা ননীবালার ভাল লাগে না। রোজ রোজ মেয়েটা যায় কোথায়? তাই গম্ভীর গলায় সে জিজ্ঞাসা করে — তুই, এই সোমত্ত মেয়ে, রোজ সন্ধেবেলায় কোথায় যাস?

উজ্জ্বল সাজের আড়ালে খিল খিল করে হেসে ওঠে রেখা। কিন্তু সে হাসি বড় করুণ আর প্রাণহীন। ঘরের ভেতর থেকে কান পাতে দীনুর বউ শম্পা। শাশুড়ির ওপর কড়া নজর রাখে সে। কারণ শাশুড়িটা কুকুর বেড়ালের কাছেও তার বদনাম করে। সে ঘরের ভেতর থেকে গলা চড়িয়ে বলে — যাবে কোথায়? মাঠে-ঘাটে চরতে যাচ্ছে —

রেখাও শুনিয়ে শুনিয়ে বলে — ঘরের ভেতরে বসে কতজন কত কী করে! তাই না মাসিমা?

ননীবালা চুপ করে থাকে। দীনু অটো নিয়ে বেরিয়ে যায় সকালবেলায়। তারপর তার বউ পাড়ার খগেন বাপিদের সঙ্গে ঘরের ভেতর গুজগুজ ফুসফুস করে। কথাটা দীনুর কানে তুললেও সে বিশ্বাস করে না। উলটে তেড়ে মারতে আসে। বলে, মা'টা তার ডাইনি। ছেলের সুখে হিংসে করে।

রেখার কথায় শম্পার রাগের মোড়টা ঘুরে যায় শাশুড়ির দিকে। সে কোমর বেঁধে বাইরে বেরিয়ে আসে।

—আমি কথা বললে, তুই বুড়ি গাল দিস! আর একটা খারাপ মেয়েছেলের সঙ্গে তোর কি এত কথা?

ননীবালার কাছে ভাল আর খারাপের ফারাক মুছে গেছে। এখানে আছে শুধু বেঁচে থাকার স্থবিরতা। আর অপেক্ষমাণ মৃত্যুর নীরব পদচারণা। এখানে স্বপ্নহীন জীবনের ছায়া পড়ে দেয়ালে রাস্তায় আর ল্যাম্পপোস্টে। চারিদিকে উনুনের রাশি রাশি ধোঁয়া গলির বাতাসকে শ্বাসহীন করে তোলে। তা টানতে টানতে তিন নারী — ননীবালা, রেখা ও শম্পা — নির্বাক হয়ে যায়। রেখার বুঝি দেরি হয়ে যায়। সে যেন ঝরা কুসুমের মতো জীবনের রং ক্রমশ হারাতে হারাতে গলির মুখে অদৃশ্য হয়ে যায়।

রাত গভীর হলেও, ননীবালার চোখে ঘুম আসে না। আজকে গলিটা বড় গুনশান হয়ে পড়ে আছে। একটা পুলিশ ভ্যান গলিটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে। রাত যত বাড়ে, ননীবালার পোকারা ক্রমশ রক্ত চঞ্চল হয়ে পড়ে। তারা যেন ছড়িয়ে পড়তে চায়। পোকার ভয়ে, মৃত্যুর ভয়ে, দীনু আর তার বউ — তাকে ঘরে ঢুকতে দেয় না।

দীনু আর দীনুর বউয়ের সোহাগের ধারাপাত শেষ হয়ে গেছে। তাদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে দুটো অকাতরে ঘুমুচ্ছে। আজকে যেন ননীবালার বড় শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। পৃথিবীর সমস্ত বাতাস কে যেন তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইছে। বাঁ দিকের বুকটা যেন একটা বড়সড় পাথরের মতো ভারি হয়ে উঠেছে। পৃথিবীটাকে বড় নিঃসঙ্গ আর নির্জন বলে মনে হয়। আজকে ননীবালা আর স্থির থাকতে পারে না। দীনুদের ডাকবার জন্য সে কোনও মতে টলতে টলতে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ায়। তার হাতের ধাক্কায় দরজা খুলে যায়। ঘরের ভেতরে কেউ জেগে নেই। ননীবালার শরীর এখন রসকষহীন আর অ্যানিমিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তাই তার পোকারা স্বাদহীন ননীবালার শরীর ছেড়ে নতুন তাজা সুস্বাদু শরীর চায়। তার শরীর থেকে অজস্র রক্তমুখো পোকারা যেন দীনুদের ঘ্রাণ পেয়ে-দ্রুত-অতি দ্রুত-ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ছে। ল্যাম্পপোস্টের মৃদু আলোয় তা দেখে ননীবালা যেন ভারহীন — যন্ত্রণাহীন হয়ে পড়ে। জীবনের স্বাদ কি সে ফিরে পাচ্ছে? নিষ্ঠুর এক আনন্দে — প্রতিহিংসায় তার মন উদ্বেল হয়ে পড়ে। দীনুদের আর সে ডাকে না। তাদের দরজাটা সে আস্তে আস্তে মরণকুঠির দরজার মতো ভেজিয়ে দেয়। চৌকির কাছে ফিরে এসে, সে পাষাণের মতো হিম ঠাণ্ডা আর শান্ত হয়ে শুয়ে পড়ে। অনেক দিন পর এত নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে ননীবালা, তাতে মনে হয়, সে আর কোনওদিন জেগে উঠবে না।

ছোটগল্প

প্রভু ভৃত্য

কুমার রাণা

"জনার্দন", বেডরুম থেকেই হাঁক ছাড়ে শুভেন্দু। রোজকার মতো রুটিন হাঁক। এর অর্থ ঠিক দশ মিনিটের মধ্যে বেরতে হবে। ব্যাগ, জলের ফ্লাস্ক, লাঞ্চ বক্স গাড়িতে রেখে নিতে হবে তার আগে। গাড়ি স্টার্ট করে রুটিন চেক করে নিতে হবে। বিছানা ছেড়ে তৈরি হয়ে নিতে শুভেন্দুর ঠিক দশ মিনিট লাগে। একটা মিনিটও সে নষ্ট করতে চায় না। কাঁটায় কাঁটায় ৯টার সময় অফিসে ঢোকার দীর্ঘ বারো বছরের রুটিনে কোনও ছেদ পড়েনি কোনওদিন। জনার্দনও সেটা বোঝে। বোঝে বলেই তার রুটিনেও কোনও ছেদ নেই দীর্ঘ বারো বছর।

"জনার্দন চলে গেছে", প্রায় বিড়বিড় করে বলে মিতালী। "তুমি কি নিজে গাড়ি চালিয়ে যাবে?" পরের বাক্যটি অধিকতর স্পষ্ট।

"তার মানে?" চায়ের কাপটা ঠকাস করে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে মিতালীর দিকে ঘুরে তাকায় শুভেন্দু।

"মানে আর কি? জনার্দন আর কাজ করবে না।" কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। নৈঃশব্দ। শুভেন্দু সিলিংয়ের দিকে তাকায়। যেন বা আকাশ দেখতে চাইছে, অথবা নিজের ভাগ্য।

"আমাকে একবার জানিয়েও গেল না?" স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করতে গিয়েও গলার স্বর ঈষৎ বেঁকে যায়, মুচড়ে যায়। "তুমি বললে না ওকে দাঁড়াতে?" হলদেটে চোখের দৃষ্টি মিতালীকে আক্রমণ করে।

"আমি তো কত বললাম, সাহেব উঠুক, যা বলার বলবে, শুনল না।"

"কি বলল?"

"বলল সকাল বেলা সাহেবের অফিস যাওয়ার তাড়া থাকে, কথা বলতে গেলে হয়ত দেরি হয়ে যাবে।"

"কোথায় যাবে, কিছু বলল? নিজের জিনিসপত্র নিয়ে গেছে?"

"জিনিসপত্র কি করে নিয়ে যাবে? আগে কিছু একটা ঠিক করবে তারপর এসে নিয়ে যাবে।"

"বৌ বাচ্চারা?"

"তুমি কোনও খবর রাখো? তারা তো সেই এক সপ্তাহ হল গ্রামে গেছে। জনার্দনের বোনের ছেলে হয়েছে। তার ছট্‌ঠিতে গেছে।"

"তাহলে কি গ্রামেই গেল? দিল্লিতেও কোথাও থাকতে পারে।" বিড়বিড় করে শুভেন্দু।

"আজ না হয় অফিস না-ই গেলে। ফোন করে ছুটি নিয়ে নাও", মিতালীর গলায় মিনতি।

কোনও জবাব দেয় না শুভেন্দু। স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করে। স্বাভাবিকভাবে বাথরুমে ঢোকে। বেরয়। যে রকম প্রতিদিন। যেন কিছুই ঘটেনি। ঠিক এক মিনিটে খাওয়া শেষ। দুধে ভেজানো কর্নফ্লেকস। এক প্রস্থ ওষুধ। ট্যাবলেট, ক্যাপসুল। জল ও হাওয়ার মতো, খাদ্য ও আবাসনের মতো অথবা তার চেয়েও অধিক অপরিহার্য অত্যাবশ্যকীয় ওষুধগুলি। শরীরের প্রতি রক্তকণিকায় দৈন্য, প্রতিটি অঙ্গে জীর্ণতার স্পষ্ট পদচেপ, প্রতিটি বিন্দুতে অবক্ষয়ের সম্মানলোপী আগ্রাসী আক্রমণ। ওষুধ, একমাত্র ওষুধই পারে। একমাত্র ওষুধই পেরেছে, দীর্ঘ ভঙ্গুর শরীরটাকে ঠেকনা দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখতে। এটা সংখ্যাতাত্ত্বিক সত্য। পেটে অসহ্য ব্যথা, ঘাড়ে ঝনঝনানি, গলায় অবিশ্রাম পুড়ে যাওয়ার অনাপোসি অনুভূতি, আঙুলে কম্পন, চামড়ায় জ্বলুনি, পায়ে থরথর ভেঙে পড়ার আগাম খবরদারি, অবিশ্রাম। এটাও সংখ্যাতাত্ত্বিক সত্য।

"রোগটা আসলে শরীরে নয়, মাথায়," শুভেন্দু এ কথা বলে থাকে। মিতালীকে বলে থাকে। তার আর কেউ নেই যাকে বলা যায়। তার বন্ধু নেই, আত্মীয় পরিজন নেই। পিতামাতা গত। এক বোন, থেকেও নেই, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্রকায় এক শহরের ক্ষুদ্রতম কোণায় তার বাড়ি। শুভেন্দু হয়ত বা স্বেচ্ছায় হারিয়েছে তাকে। এবং অনেক কিছুই সে হারিয়েছে, অনেক কিছু পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

জীবন। বিশাল বাড়ি। বিলিতি গাড়ি। শ্যাম্পু চুলে ঝুমঝুমি। আরোপিত সৌন্দর্য ঝলমল বিলিতি পুতুলের মতো স্ত্রী, লেখাপড়ায় তুখোড় সফল ছেলে, ইংরাজি-ফ্রেঞ্চ, জার্মান জানা। সদ্য বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে স্কুলের পড়া শেষ করে।

শুভেন্দুর মাসিক মাইনে লক্ষ কাগজি মুদ্রা। ভূতের রাজার দেওয়া বরের মতো বাজারের যাবৎদ্রব্য ক্রয় করার ক্ষমতা দেয় টাকা। কিন্তু বাস্তবিক যা খুসি তাই করার অধিকার কাগজি মুদ্রা দেয় না। বরং বলা যায় মুদ্রাগুলি ইচ্ছার বন্ধকি থেকে পাওয়া। এবং হারানো, হারিয়ে ফেলা, ইচ্ছা থাক বা নাই থাক।

মিতালী সাজিয়ে রেখেছে সব কিছু। শুভেন্দু নিজেই সব জিনিস গাড়িতে তোলে অগোছালো ভাবে, অনভ্যাসে। জরুরি মিটিং আছে। যেতেই হবে এবং পৌঁছনো চাই কাঁটায় কাঁটায় ঠিক ৯টায়। যদিও সে নিশ্চিত জানে সকলেই কাঁটায় কাঁটায় ৯টার সময় হাজির হবে না। যদিও সে রাষ্ট্রসংঘের এই সংগঠনটিতে কাজ করে এবং বহু বিদেশি-বিশেষত সাদা চামড়া তার সহকর্মী, কিন্তু এটা সত্য ভারতবর্ষ যেরূপ বিরাট ঔদার্যে সবার জন্য দরজা খুলে দেয় সেইরূপ সবাইকে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে নিজের মতো করে গড়ে নেয়, অথবা, তারা—সেই বিদেশিরা নিজেদের সুবিধার্থে-অন্তত অংশত ভারতীয়কৃত হয়ে যায়। যথা নিয়মানুবর্তিতা। যথা সকাল ৯টার জায়গায় দশ মিনিট পরে পৌঁছানো এবং ইত্যাকার অসংখ্য যথা যথা যথার্থ উদাহরণের জন্য বেগ পাওয়ার কোনও কারণ নেই। কিন্তু, শুভেন্দু দেরি করে না। কখ্খনও না। সেটা কতখানি তার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ পরিপক্ততা এবং কতখানি উপরওয়ালার প্রতি সন্ত্রাস্ত ভীতিসঞ্জাত সে কথা জোর দিয়ে বলা যায় না, কিন্তু গত বারো বছর ধরে ভোপাল, ব্যাঙ্গালোর, কলকাতা ঘুরে দিল্লির এই সদর দপ্তর শুভেন্দুর সময় সকাল ৯টা। প্রভূত প্রশংসা পেয়েছে সে এ কারণে এবং অন্য কারণেও। সে কাজের লোক। কাজ ছাড়া অন্য কিছু সে জানে না। স্ত্রী পুত্র পরিবার এমনকী নিজের যা একান্ত নিজস্ব শরীর — এ সবই তার কাছে তুচ্ছ। সে বিশ্বাস করে এসেছে এ পৃথিবীতে অনেক কিছু করবার আছে। নিপীড়িত মানুষের জন্য, দরিদ্রদের জন্য, নারী ও শিশুদের জন্য।

।দুই।

বারো বছর আগে রাস্তা থেকেই প্রায় উঠে এসেছিল শুভেন্দু। তার যোগ্যতা বলতে ছিল একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি, সঙ্গে ইংরাজি বলতে ও লিখতে পারার অসামান্য দক্ষতা। একটা ছোট, খুবই ছোট স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে কাজ করত ভোপালে। বারোশো টাকা পেত। সঙ্গে থাকার জায়গা। মিতালী একটা স্কুলে পড়াত। ছেলেটার তখন সবে চার বছর।

কলকাতায় কোনও সুযোগ গড়ে তুলতে পারেনি। কিন্তু কলকাতারই যোগাযোগে শুভেন্দু ভোপালে আসে। মনোতোষ ঘোষ নামের এক ভদ্রলোক একটা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন চালাতেন ভোপালে — হয়ত এখনও চালান, শুভেন্দু বহুদিন কোনও খবর নেয়নি।

ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় পীড়িত বস্তিবাসীদের সেবায় যাকে বলে আত্মনিয়োজিত করে দিয়েছিলেন মনোতোষবাবু। শুভেন্দু তখন সদ্যবিবাহিত। কলকাতায় কিছু পাচ্ছে না। মিতালীর আয়ে কোনওক্রমে চলছিল সংসার। কীভাবে চলছিল তা মিতালীই জানে।

মনোতোষবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ হবার পর দ্বিতীয়বার ভাবেনি। ভাবেনি মিতালীও। যে প্রবল বন্যার তোড়ে শুভেন্দুর আকর্ষণ তাকে স্থানচ্যুত করেছিল সেই বেগে, সেই রূপসী, মৃদুভাষী, পতিপ্রাণা যুবতী শাঁখা সিঁদুরের মায়ায় জড়িয়ে শুভেন্দুময়ী, শুভেন্দুবিজড়িতা, আগামী দিনের শুভেন্দুকে গড়ে তোলার জন্য হাওড়া স্টেশনে এক বার মাত্র পিছন ফিরে তাকিয়েছিল। অতঃপর ট্রেন।

মিতালীর জন্যও একটা কাজ যোগাড় করে দিয়েছিলেন মনোতোষবাবু। একটা প্রাইভেট স্কুলে পড়ানোর কাজ। তেমন সময়ে ইংরাজি প্রাইভেট স্কুলের ভভ্যুদয়ের ক্ষণ। সংখ্যায় নগণ্য, কিন্তু সম্ভাবনায় ইঙ্গিতবাহী। শুভেন্দুও নিজেকে মগ্ন করে দিয়েছিল নিজের কাজে এবং মিতালীর মধ্যে।

প্রেম ছিল। ছোট্ট ঘরে শুভেন্দুর নকশা করা থার্মোকলের রবীন্দ্রনাথ। ছোট ছোট কবিতা। ভোপালের নিঃঝুম রাতে বস্তির শেষ ছোট্ট ঘরটির বাইরে দাঁড়ানো দুটি একান্ত যুবক ও যুবতী। আকাশে অসংখ্য তারা, নিম গাছের হাওয়া, নিম ফুলের সুবাস। মিতালী ক্রমশ সৌভাগ্য লাভ করে। সেই ছোট্ট ঘরে এক দিন একটি শিশুর কান্নার আওয়াজ জন্ম নেয়। স্বাভাবিক জন্ম। হাসপাতালে নিয়ে যাবার প্রয়োজন হয়নি, সময়ও ছিল না।

সেই শিশুটি যখন চার বছরের — যার নাম তারা তথাগত রেখেছিল — শুভেন্দুর ভাগ্যরেখা তরতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মিতালীও মনে করে এ তারও সৌভাগ্য, যেহেতু, শুভেন্দুতে সে নিমগ্না ছিল; পতি ও প্রেমিক একজনই পুরুষ তাকে আচ্ছন্ন ঘোরের মধ্যে সন্তানবতী করেছিল এবং তাকে আর শিক্ষিকার চাকরি করতে হয়নি।

যে সময়ে শুভেন্দুর নক্ষত্র স্পষ্ট উদিত হয় সে সময়ে একটি ইংরাজি দৈনিকেও শুভেন্দুর লেখা মাঝে মাঝে প্রকাশিত হত এবং সংস্থার জন্য অর্থসংগ্রহের কাজে তাকে দেখা করতে হয় জিম স্যামসনের সঙ্গে, সে তখন ভোপালে রাষ্ট্রসংঘের এই সংগঠনটির রাজ্যস্তরীয় প্রধান। জিম তার লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিল, ফলে যোগাযোগটি নাক্ষত্রিক হয়ে ওঠে। শুভেন্দুকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। স্বল্পদিন ভোপালে অফিস, অতঃপর ব্যাঙ্গালোরে কলকাতা হয়ে সে আপাতত এখানে সংগঠনটির ভারত সদর দপ্তরে। শুভেন্দুর গতির সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে মিতালীও মিশে গিয়েছিল সেই গতিতে। বলা ভাল হারিয়ে গিয়েছিল। বিউটি পার্লার, পার্টি, কথা বলার ট্রেনিং একটি পোষা পাখীর মতো স্বর্ণপিঞ্জরে, সোনার দাঁড়ে, সোনার শেকলে বাঁধা পড়েছিল। এও এক উত্তরণ।

হয়ত সব কিছু বড় সহজে হয়নি। কিন্তু হয়েছিল। শুভেন্দু যে মূল্যবোধে নিজেকে বদলাচ্ছিল, এবং, মূল্যবোধগুলিকও

বদলাচ্ছিল, সে রকমই, কিন্তু অবিকল সে রকমও নয়, এবম্বিধ কিছু মূল্যবোধ অবিশ্রাম মিতালীর মধ্যে ক্রিয়া করছিল। শুভেন্দু থেকে তথাগত; তথাগতও সদ্য ডানা গজানো উচ্ছ্বসনোন্মুখ অতএব মিতালীর স্বেচ্ছাকৃত পিঞ্জর ছিল; ধপধপে চাদর পাতা উজ্জ্বল সৌখিন সুখী সুখী মুখ, প্রকাণ্ড একটি নদীগহ্বরকে উন্মোচিত হওয়া থেকে বাধা দিচ্ছিল, অবিশ্রাম অজস্র ফেনিল ঘূরন্ত জলরাশি দিয়ে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছিল।

"হাই, মিসেস মুখার্জি, হাউ আর য়ু?"

"হাই, আই এনভি ইয়ু, হাউ ডু য়ু মেনটেইন?"

"হোয়াট্ আ বিউটি"

"সি ইজ নট আপ টু দ্য টাইম"

"সি হ্যাজ এ প্রব্লেম উইথ হার হাজব্যাণ্ড"

"সি হ্যাজ অ্যান অ্যাফেয়ার"....

এই রূপ কত ভাল কথা, মন্দ কথা, মিথ্যা কথা, নিন্দা, প্রশংসা, কৃত্রিম খোশগল্পো, নাক সিঁটকানি, আশ্চর্য ভাব — অঙ্গ থেকে পতঙ্গ সব কিছুতে, পৃথিবীর যাবতীয় বৃহৎ ও গভীর সমস্যাগুলিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে জীবন পথ হাঁটছিল। কৃত্রিম ঠাণ্ডা বাতাসে উড়ছিল মাথার হালকা নরম চুল, উড়ছিল শাড়ির আঁচল। ভেতরে নদীগর্ভে আশ্চর্য আওয়াজ চাপা পড়ে যাচ্ছিল।

শুভেন্দু একজন সফল পুরুষ।

শুভেন্দু তার জীবনের নায়ক।

।তিন।

জনার্দনকে পাওয়া গিয়েছিল ভোপালেই। মনোতোষবাবুর সংস্থায় কাজ করত। সেই সুবাদে আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা। যতই কেননা শুভেন্দুর অর্থনৈতিক স্তর জনার্দনের অর্থনৈতিক স্তরের কাছাকাছি থেকে থাক, শুরু থেকেই জনার্দনের কাছে শুভেন্দু "সাহাব"। কেননা শুভেন্দু ছিল তার চেয়ে আলাদা, ডাল ভাত খেয়েও শুভেন্দুকে জনার্দনের সঙ্গে কিছুটা প্রভেদ রাখতে হত, বা সে প্রভেদ অনবলোপী। শুভেন্দু শিক্ষিত, অপিচ বাঙালি এবং ব্রাহ্মণ সন্তান। জনার্দন মধ্যপ্রদেশের কোনও এক অজানা গ্রামের এক জন ক্ষুদ্র চাষি ও ক্ষেতমজুরের সন্তান, ম্যাট্রিক পাশ করেছে বহু কষ্টে, পরন্তু তার গোত্র তাকে ভারতীয় সমাজের জাতিদীর্ণ বিভাজনের এমন এক রেখায় দাঁড় করায় যা শুভেন্দুর সঙ্গে তার দূরত্বকে অনতিক্রম্য করে তোলে; যদিচ শুভেন্দু এ সকল দূরত্বকে আরোপিত মনে করে থাকে এবং এর কৃত্রিম খারাপ দিকটির বিরুদ্ধে জোর গলায় প্রচার করে থাকে, কিন্তু, দূরত্ব ঘোচে না। তার চেষ্টায় আন্তরিকতা বা ত্রুটি ছিল না, এরূপ দাবি শুভেন্দু করে থাকলেও জনার্দনের নিজস্ব বোধ ছিল।

তার নিজস্ব ছেলেবেলা ছিল। নিজস্ব মাঠ ঘাট আকাশ পুকুর নদী ডাঙাজমি ধানখেত ভুট্টাখেত ছিল। মুরগি, তিতির, পালশাক, পলাশফুল — তার নিজস্ব বড় হয়ে ওঠা ছিল। চার পাশে হুকুম হাকিম তাবড় তাবড় মোচওলা রক্ষক ভক্ষক ও দক্ষ তক্ষকরা ছিল। তার বাপ ঋণের দায়ে জুতো খেয়েছিল। মালিকের পায়ে পড়ে জুতো খাওয়া, চামড়া ওঠা, চামড়া ফাটা পিঠে পুনরায় ঋণের ও সংসারের বোঝা নিয়ে চক্রবৎ ঘুরছিল।

জনার্দনের ভবিষ্যৎও সে ভাবেই তৈরি হচ্ছিল। সুযোগ ছিল সামান্যই, গ্রামের প্রাইমারি স্কুল, অনাহার অর্ধাহার, হাটে গিয়ে মুরগির ডিম, পিঁপড়ের ডিম বিক্রি করা, মালিকের গরুগুলিকে দুগ্ধবতী করে তোলার জন্য পর্যাপ্ত ঘাসের যোগান দেওয়া, এ সবের মধ্য দিয়ে জনার্দন সুযোগ খুঁজে নিচ্ছিল। খালি পা, ধুলো চিটচিট জটপাকানো মাথার চুল, একবস্ত্র জনার্দন কোন জেদ আর ঐকান্তিকতা নিয়ে যে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল তা সেই জানে। ম্যাট্রিক যদিও বা তার জন্য স্বর্গের দরজা খুলে দেয়নি, তা হয়ও না — বিশেষ কোনও অসাধারণ উদাহরণ ছাড়া — কিন্তু সে গ্রাম থেকে বাইরে যেতে পেরেছিল, যা ছিল তার জন্য এক ধরনের মুক্তি।

হাতে নগদ কিছু টাকা, তার চাহিদা কম। মেহনতি একজন জোয়ান হয়ে উঠেছিল জনার্দন। ভাঙাচোরা ঘরের বাইরে, ভাঙাচোরা আলপথের উপর দিয়ে, সড়কের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জনার্দন তার অতীতের অংশবিশেষকে তার পিতৃপুরুষের অতীত থেকে ছিনিয়ে এনেছিল ভোপালের একটি স্বপ্নালোকিত বস্তির পঞ্চাশ টাকা ভাড়ার খাপরার ঘরে।

শুভেন্দু যখন বড় চাকরিটা পায় এবং ভোপাল ছাড়ার আগেই গাড়ি কেনে তখন থেকেই জনার্দন তার ড্রাইভার। ড্রাইভিং শেখা থেকে লাইসেন্স যোগাড় করা — সব কিছুতে শুভেন্দুর সহায়তা ছিল। তারপর সে যখন যেখানে গেছে জনার্দন তার সঙ্গী। জনার্দনের ওপর সে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল। আর জনার্দন সঁপে দিয়েছিল। সাহাব তার প্রভু। তার জীবন, পরিবার, স্ত্রী পুত্র কন্যা, গুটিগুটি করে চারটি সন্তান সব নিয়ে সে প্রভুর সেবায় নিমগ্ন হয়েছিল।

।চার।

মিতালী যে শুভেন্দুর পরিবর্তন লক্ষ করেনি তা নয়। এবং জনার্দনও লক্ষ করেছিল। বিশেষত দিল্লিতে আসার পর থেকেই শুভেন্দু বদলে যাচ্ছিল দ্রুত। মিতালী তার জন্য বুনিয়াদি ছিল না আর। তথাগতও নয়। জনার্দনও না। বাস্তবিক, দিল্লি আসার আগেই অফিস ছিল তার ধ্যান জ্ঞান প্রেম বাৎসল্য প্রভূত সকল কিছুর আধার।

দিল্লিতে তার পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়ে ওঠে এই কারণে যে, অথবা আমরা সম্পূর্ণ জোর দিয়ে বলতে না পারলেও, তার আধার

ভেঙে যাচ্ছিল। প্রতি রাত্রে বাড়ি ফেরাটা নিয়ম। বাড়ি ফিরত সে। যদিও ফেরাটা কাঁটায় কাঁটায় হয়ে উঠত না। কখনও বড় কর্তার সঙ্গে মিটিং কখনও ট্রাফিকে আটকে যাওয়া। কিন্তু ফিরে না ফিরেই, জামা কাপড় না বদলেই সে মদ খেতে বসত। জনার্দনেরই কাজ মদ ঢেলে দেওয়া। শেষ হওয়ার আগে স্টক নিয়ে আসা, মদ ও সিগারেটের। মাথা ব্যথা হলে মালিশ করে দেওয়া।

প্রতি রাত্রেই মিতালীর সঙ্গে কিছু কথা কাটাকাটি হত শুভেন্দুর। মিতালী কাঁদত। শুভেন্দু চিৎকার করত।

"অফিসের ঝামেলা তুমি বাড়ি নিয়ে আসবে ..... আমরা কি দোষ করেছি..... আমাদের ওপর কি জন্য চিৎকার করবে তুমি?" শুভেন্দু শান্ত হয়ে যেত। মদের গেলাসের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে কিছু খুঁজত। ঘোলাটে হয়ে উঠত দৃষ্টি। রাতের খাবার টেবিলে অভুক্ত পড়ে থাকত।

"চাকরিটা ছেড়ে দিলেই তো পারোগো...এত কষ্ট, অপমান নিয়ে চাকরি করার দরকারটা কি?" মিতালী বলত।

শুভেন্দুও বুঝত না কিসের জন্য চাকরি। টাকা তো যথেষ্ট আছে। যথেষ্ট রোজগার করে নিয়েছে। কিন্তু চাকরিটা ছাড়ার কথা ভাবতেই পারত না। "আমাকে তো চেষ্টা করতে হবে ... যে যা খুশি করে যাবে এমনটা চলতে পারে না ... আমাদেরই বুকের ওপর বসে আমাদের দাড়ি ওপড়াবে তা হতে দেওয়া যায় না," শুভেন্দু ক্রুদ্ধ হয়ে উঠত।

"আমি আমার রিপোর্টে সব লিখব।" লিখেওছিল সে। মারাত্মক সে রিপোর্ট। তার একটা কপি হাতে পেলে হয়ত খবরের কাগজওলারা হেডলাইন করত। কিংবা না-ও করতে পারত। বেনামে তো সে উন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে একটা কপি পাঠিয়েছিল, কিছু হয়নি। তথাপি সে রিপোর্ট ছিল বিস্ফোরক।

"কি হল তোমার রিপোর্টে? রিপোর্ট দেওয়ার পর থেকে তো তুমি আরও বেশি অচ্ছুত হয়ে গেছ, আমি কি সে কথা বুঝি না?" মিতালীর কথাগুলো হুলের চেয়েও জ্বালাময়ী। শুভেন্দু কখনও গুম হয়ে বসে থাকে। কখনও বা প্রতিক্রিয়ায় ফেটে পড়ে, গেলাস ছুঁড়ে মারে, টেবিল চেয়ার ভাঙে। কখনও হাউহাউ করে কাঁদতে চায়, পারে না। মিতালী সামলায়। জনার্দন সামলায়।

গত রাত্রে বাড়াবাড়ি চরমে ওঠে। থমথমে মুখ নিয়ে সে অফিস থেকে বেরিয়েছিল। এর অর্থ জনার্দনের জ্ঞাত। অফিসে বড়সড় কোনও ঝামেলায় থমথমে শুভেন্দুর মুখ।

বড়সড় কিনা জানা নেই, যেহেতু সব কিছু আপেক্ষিক, কিন্তু শুভেন্দুর মাথা ঘুরছিল। তার পাথুর চোখ — একদা যা থেকে তীব্র জ্যোতি নিঃসৃত হত এবং একদা যার আকর্ষণে মিতালীর বাঁধ ভেঙেছিল — অস্পষ্ট ছায়া ছায়া ক্রোধ এবং তার চেয়ে ঢের বেশি অপমানবোধ নিয়ে বহিঃপৃথিবীকে অবলোকন করার চেষ্টা করছিল।

তার কানে তখনও উষ্ণ গলন্ত সিসার প্রবাহ। ডিসেম্বরের শীতল, গাড়ির জানলা খোলা হু হু বাতাস সেই উত্তাপের ওপর কোনওই প্রভাব ফেলতে পারছিল না। সহকর্মীরা তাকে বলেছিল, যেমন চিরকাল বলে থাকে,

"খাও পিও মওজ করো ইয়ার ...

কেন মিছিমিছি ঝামেলা বাড়াচ্ছ....

ইটস দ্য রুল, য়ু কান্ট চেঞ্জ দেম...

আরে ভাই, বেকার কি বাত হ্যায়, ওসব, আদর্শ, সিদ্ধান্ত..."

সে প্রশ্ন করেছিল। দুর্নীতির অভিযোগ ছাড়াও বৃহত্তর নীতিগত প্রশ্নে সে বিতর্ক চাইছিল।

"বাস্তবিকই কি আমাদের নীতি দরিদ্রদের সহায়ক? নাকি আমরা ব্যবস্থার নিগড়কে আরও বলবান হতে সাহায্য করছি? ....

.... কেন আমরা তাদের সহযোগিতা করব যারা কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স ফাঁকি দেয়? ....

কেন টাকাটা ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহৃত হবে জেনেও কিছু অসাধু গোষ্ঠীকে অর্থ সাহায্য করা হবে? ....

কেন সংগঠনেরই কিছু অসাধু অফিসারকে শাস্তি দেওয়া হবে না? .... দেশটাকে কি মেক্সিকো বানানোর চক্রান্ত চলছে না? ....

বিপরীত ফল হয়েছে। শুভেন্দু ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তাকে পাগল উপাধি দেওয়া হয়েছে। আড়ালে, কখনও বা প্রকাশ্যে। তার কাজের পরিধি ছোট করে দেওয়া হয়েছে। দিনের পর দিন তার ওপর বর্ষিত হয়েছে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ।

"ডু য়ু হ্যাভ আ পি.এইচ.ডি?"

"ডু য়ু থিংক দিস অফিস আ প্রপার প্লেস ফর য়ু?" এবং গতকাল গোধূলি লগ্নে মাতৃভূমি ভারতবর্ষ যখন স্নিগ্ধ হাওয়ায় আন্দোলিত হচ্ছিল তার সম্পূর্ণ অবয়ব নিয়ে, উঁচু নিচু প্রভেদ, বিভাজন, তার দারিদ্র তার বৈদগ্ধ্য নিয়ে, শুভেন্দু বড় সাহেবের কাছ থেকে শোনে,

"য়ু ব্লাডি ইন্ডিয়ান"।

।পাঁচ।

রাত্রে ঠিক কী কী হয়েছিল তার মনে নেই কিন্তু জনার্দনের স্পষ্ট মনে ছিল। আজকাল বেশি বেশি করেই মনে থাকে তার। দিন যেতে, বছর যেতে সাহাব বদলে গেছে। সেই ডোপালের সাহাব যে তাকে বলেছিল, "সাহাব নহি, ভইয়া বল," সেই সাহাব সত্যি সত্যিই মস্ত এক সাহাব হয়ে উঠেছে। দিল্লি আসার পর শুভেন্দু আরও বেশি করে প্রভুত্বে উত্তীর্ণ। দূরত্ব ছিল, কিন্তু তার

প্রকৃতি ছিল ভিন্ন, প্রভুত্বের সঙ্গে এক প্রকার সৌভ্রাতৃত্বের মিশ্রণ। জনার্দনের বউ যখন প্রথম পোয়াতি, ছটফট অন্ধকার সেই রাত্রে শুভেন্দু গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেছে তাকে নার্সিংহোমে, জনার্দন ও মিতালী পেছনের সিটে মাথার কাছে, পায়ের কাছে। জনার্দনের বউ যখন দ্বিতীয় বার গর্ভবতী হয় মাত্র এক বছরের ব্যবধানে, কৃত্রিম রাগে ধমক দিয়েছে সে জনার্দনকে, বড় ভাই সুলভ অথবা বন্ধুসুলভ ধমক,

"খা পি কে তুমকো একহি কাম আতা হ্যায়? বিস্তর কা কাম? ...আরে বেহদা কন্ডোম কিউঁ নহি ইস্তেমাল করতে হো?" মিতালীও হাসত শুভেন্দুর কথা শুনে। নির্মল আনন্দে হাসত। জনার্দন লজ্জা পেত।

সে এক সময় ছিল। সকালে সন্ধ্যায় জনার্দন ও শুভেন্দু — প্রভু ও ভৃত্য, দুটি মানুষ — প্রায় সমবয়সী দুটি পুরুষ কখনও নিকট হত। মাঝে মাঝেই দূরত্বের বেড়া ভেঙে তারা পরস্পরের অনেক কাছাকাছি আসত। সে অন্য দরদম দিন ছিল, যখন শিশিরে পা ডুবিয়ে শুভেন্দু হাঁটত, পাশে মিতালী, অদূরে জনার্দন।

তারপর জনার্দনের বউ আরও দু'বার সন্তানবতী হয়েছে। তারপর তার বড় মেয়ে স্কুলে যাওয়া শুরু করল। মেজ মেয়ে স্কুলে যাওয়া শুরু করল। তারপর কোনও এক আবহাওয়া সময়ে শুভেন্দু ভুলে গেছে জনার্দনের বাচ্চাদের নামও। সাহাব বাস্তবিকই মস্ত উঁচু এক পাঁচিল ঘেরা দুর্গের চূড়ায় একটি খুপরিতে উঠে গেছে যেখানে জনার্দন তো দূর মিতালীও পৌঁছতে পারে না।

প্রায় রাত্রেই চিৎকার চেঁচামেচি বাড়ছিল। প্রায় রাত্রেই জনার্দন প্রায় কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেত শুভেন্দুকে বিছানা পর্যন্ত। কখনও সখনও চড় চাপড়ও খেয়ে যেত। মিতালী বলত, অকালে সকালে যদি কোনওদিন সুযোগ পেত, বলত, কি অত্যাচার সে জনার্দনের উপর করে এবং এ কথাও যে, তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তথা নারী সুলভ তথ্যসংগ্রহ ক্ষমতায় — জনার্দনের স্ত্রীও বড় একটা সন্তুষ্ট ছিল না এবং সে ক্রমাগত জনার্দনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছিল অন্য কাজ খুঁজে নিতে।

শুভেন্দু পাত্তা দেয়নি।

"ওকে কে বলে বসে থাকতে? গাড়ি গ্যারেজে লাগিয়ে চলে গেলেই পারে।"

"তুমি তো জানো ও সেটা করবে না, আর অভ্যেসটা তো তুমিই গড়ে তুলেছ, এটা ওটা ফরমাশ, ও ছাড়া কে করবে?"

"খাটে, তার জন্য টাকা পায়, ওকে অনেক টাকা দিই আমি। জানো চাওলা কত মাইনে দেয় তার ড্রাইভারকে? জনার্দন যা পায় তার অর্ধেকেরও কম।"

"টাকা দিয়ে মাথা কিনে নিয়েছ," বিড়বিড় করে মিতালী।

টাকা দিয়ে যে মাথা কিনে নেওয়া যায় না, জনার্দনের মতো পরম প্রভুভক্তের মাথাও না, তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

জনার্দন পরম ভালবাসায় বলেছিল, "অওর মত পিজিয়ে সাহাব, বহুত হো গয়া।"

"চোপ, অপনা কাম করো।"

"নহি সাহাব, হমসে দেখা নহি যাতা হ্যায়, আপ খানা নহি খাতে হো, তবিয়ৎ কা কোই খয়াল নহি"....

"বললাম না নিজের কাজ করো, গেলাসটা ভরে আনো"

"সাহাব সমঝা কর"

"চোপ", চিৎকার করে উঠেছিল শুভেন্দু, "আমাকে জ্ঞান দিতে এসেছে, দো টকে কা নওকর", এবং সে সেই দুর্বিষহ শব্দ উচ্চারণ করেছিল, "শালা, মাদর..."

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল জনার্দন।

কতদিন কত না গালাগাল শুনেছে। "শুয়ার, ইডিয়েট, গাধা..." কতদিন কত না মাতলামি করেছে শুভেন্দু, হাতও চালিয়েছে, পাও, কিন্তু কোনওদিন কোনও মুহূর্তেই মা-বোন তোলেনি।

জনার্দনের কানের ভেতর এরোপ্লেন উড়ে যাওয়ার শব্দ।

বিশ্বাসই হচ্ছিল না। "শালা, মাদর ..." ওঃ অসহ্য, অসহ্য জ্বালা।

নীরবে বেরিয়ে গিয়েছিল জনার্দন। শুভেন্দুকে বিছানায় তুলে না দিয়েই।

সকালবেলা সে মিতালীকে বলে গিয়েছিল,

"সাহাব অপনা সাহাব সে গালি খাকে হমকো গালি দেতে হ্যাঁয়, অগর উনকো ইতনা হি গুস্সা হ্যায় তো কিউঁ নহি উঠাকে পটক দেতে অপনা সাহাব কো?"

মিতালী সে কথা শুভেন্দুকে বলতে পারেনি। সে জানে...।

। ছয়।

গাড়ি সাধারণত চালায় না শুভেন্দু। অনভ্যাসের অস্বস্তিতে গাড়িটা রাস্তায় বার করে। ধীরে ধীরে এগোয়। পাশ দিয়ে হুশ করে একটা গাড়ি বেরিয়ে যায়। জনার্দন ড্রাইভ করছে। সামনে দিয়ে একটা গাড়ি আসছে। জনার্দন ড্রাইভ করছে। ট্রাফিক সিগন্যালে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে গাড়িগুলি। ঠিক পাশের গাড়িটার ড্রাইভার .... "জনার্দন", ডাকতে গিয়েও সম্বিত ফিরে পায় শুভেন্দু। ড্রাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে দৃষ্টি ঘোরায়। চতুর্দিকে অসংখ্য জনার্দন। কালো, বাদামি, রোদে পোড়া, শক্ত চেহারাগুলি। কত কত জনার্দন।

অফিসের গেট দিয়ে ঢুকে নির্দিষ্ট জায়গায় গাড়িটা থামায় সে। নেমে আসে। হাতে ব্যাগ, লাঞ্চ বক্স। সামনে দিয়ে মাথা উঁচু করে রাস্তা পার হচ্ছে একটা লোক। পায়ে চটি, মাথায় কোঁকড়া চুল, দীর্ঘ পেটানো চেহারা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

জনার্দন।

মাথা নিচু করে অফিসে ঢুকে যায় শুভেন্দু।

ধারাবাহিক সন্দভ

বঙ্গসংহার এবং

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

"আসল কথা, নেহেরুজী সুচেতা কৃপালনীকে পাঠিয়েছিলেন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নির্বাচনী সংগঠনকে সাহায্য করবার জন্য। আমার স্ত্রী অবশ্য ভিতরে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎও হয় সুচেতা কৃপালনীর।

আমার স্ত্রী ভোট দিয়ে বেরিয়ে আসার পর আমরা কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা লক্ষ্য করছিলাম। ঐ লোকগুলো তখন যে রকম মারমুখি ছিলো, তাদের হাত থেকে সুচেতাদেবীকে রক্ষা করতে পুলিশকে সে দিন কম বেগ পেতে হয় নি। তিনি বেরিয়ে আসা মাত্রই লোকগুলো তাঁর দিকে তেড়ে গেল, মুখে যা-তা বলতে লাগলো, ইত্যাদি। কিন্তু আশ্চর্য মানুষটির ধৈর্য ও সাহস! অবিচলিত ভাবে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন, পুলিশরা তাঁর চারদিকে একটা বেষ্টনী তৈরি করে তাঁকে ঘিরে রাখলো। এই ভাবে তিনি গাড়িতে উঠে বেরিয়ে গেলেন। লোকগুলোর উচ্ছৃঙ্খলতা আর তাঁর শান্তভাব, এই-ই ছিল লক্ষণীয় বিষয়।

ঐ দিনই সন্ধ্যাবেলা মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হলো, তখন সব বললাম। এও বললাম, কংগ্রেস প্রার্থীর ভাগ্য যে সুপ্রসন্ন হবে এমন অনুমান করা যাচ্ছে না।

ভোটের ফলাফল ঘোষিত হলো ১৪ই জুন রাত সাড়ে সাতটায়। সুরেশ দাসের ৫,৭৫০ ভোটের উত্তরে শরৎচন্দ্র বসু পেয়েছেন ১৯,৩০০ ভোট। তখনও পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোনো সংগঠিত ফ্রন্ট ছিল না। শরৎবাবু ভোটে জিতেই সেটা করলেন। একে যুক্তফ্রন্ট গঠনের ভিৎ বলা যেতে পারে। আর শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের এই পরাজয় মন্ত্রিসভার ভিৎ-ও যে টলিয়ে দিয়েছিলো, এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রাদেশিক কংগ্রেস সংগঠন-ও বেশ চোট খেয়েছিলো। এ সব কারণে কয়েকজন প্রথম সারির মন্ত্রী ভোটগ্রহণের খুঁৎ টুঁৎ খুঁজে যাতে নির্বাচনী ফলাফল উল্‌টে দেওয়া যায়, তার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু এ সব পরামর্শে ডা. রায় কান দেন নি। গণতন্ত্রের প্রকৃত উপাসকের মতোই তিনি তাঁর এককালের বন্ধু ও সহযোগী শরৎবাবুকে সংসদীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বাগত জানাতে কুণ্ঠিত হন নি। শরৎবাবু কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব থেকে তাঁকে হঠাৎই অপসারিত করা হয়েছিল। এবং তাঁর ও নেহেরুজীর মধ্যে বিরোধ এক সময় খুবই চরমে উঠেছিল।

কিন্তু সে যাই হোক, কংগ্রেসের দক্ষিণ কলকাতার পরাজয় কিন্তু ঐ ১৯৪৯ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ডা. রায়কে দুরূহ পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। তাঁর সাড়ে চৌদ্দ বছরের মন্ত্রিত্বের কালে বহুবার তাঁকে সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু এই সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছিল চরম। স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের সেই ছিল বহিঃপ্রকাশের প্রথম স্তর। সেজন্য ভোটের মাধ্যমে জনগণের মতামতের অভিব্যক্তির ফল যে সুদূর প্রসারী হয়েছিল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ২০শে জুন সকালে প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর একটি ভাষণ কাগজে কাগজে বেরিয়ে গেল যাতে তিনি মন্তব্য করেছিলেন বলে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার পদত্যাগ করা উচিত। এ মন্তব্য বলা বাহুল্য ডা. রায়ের চোখ এড়িয়ে গেল না। সকাল সাড়ে আটটায় আমার ঘরে ইলেকট্রিক বেল বেজে উঠলো ক্রিং ক্রিং। বুঝলাম ডাক পড়েছে। কাছে গেলাম। গম্ভীর মুখ। ডিক্‌টেশন দিয়ে তখ্‌খুনি যে চিঠি লেখালেন, তাতেই তাঁর তখনকার মনের অবস্থা ধরা পড়লো। এবং যে সিদ্ধান্তের কথা তিনি চিঠির মাধ্যমে প্রকাশ করলেন, তার জন্য তিনি তাঁর কোনো সহযোগীর সঙ্গেই পরামর্শ করলেন না, তাঁরা অবশ্য তখনো এসে পৌঁছন নি। এই চিঠিতে তিনি পদত্যাগের ইচ্ছা পর্যন্ত প্রকাশ করলেন। বললেন, নির্বাচনের ফলাফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার জন্য প্রয়োজন হলে তিনি পদত্যাগ করতেও পশ্চাৎপদ নন। চিঠিটি হলো এই :

কলকাতা
২০শে জুন ১৯৪৯

প্রিয় জওহর,

নয়া দিল্লীতে প্রাদেশিক রাজনৈতিক পরিষদের খোলা বৈঠকে তুমি যে বক্তৃতা দিয়েছিলে, তা আজকের সকালের কাগজে ছাপা হয়েছে। তুমি দুটি জিনিস বলেছো বলে কাগজগুলো বলছে। এক, দেখা যাচ্ছে যে, ঐ নির্বাচনী এলাকার জনগণ হয় পশ্চিমবঙ্গের

প্রাদেশিক কংগ্রেসের ওপর, আর নয় ত প্রাদেশিক সরকারের ওপর চটে গেছে। দুই, সরকারে মন্ত্রীরা রয়েছেন জনপ্রতিনিধি হিসাবে, কিন্তু এই জনপ্রতিনিধিত্বের ধারামূর্তি যখন তাঁরা খুইয়েছেন, তখন তাঁদের পদত্যাগ করা উচিত।

তোমার মতামতের এই দুটো দিক আমাকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। প্রথমতঃ আমি স্বীকার করি না যে দক্ষিণ কলকাতার পুনর্নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওপর প্রকাশ পেয়েছে সর্বতোভাবে জনগণের রাগ আর ঘৃণা। সত্যি কথা বলতে কী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের লোকেরা কালা ভেংকটারাওকে যা বলেছিল তার সঙ্গে এই মন্তব্য প্রায় মিলে যাচ্ছেবলা চলে। কালা ভেংকটারাও নির্বাচনী প্রচারকার্যের সময় আগাগোড়া উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেখে শুনে বলেছিলেন, নির্বাচনে পরাজয়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনপ্রিয়তা হারানোই দায়ী, এ কথা বলা মূর্খতারই পরিচায়ক। আসলে নির্বাচনের সময় ধ্বংসাত্মক ও ঈর্ষাকাতর কিছু লোক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে ততটা নয়, যতটা কেন্দ্রীয় সরকারের ও তাঁদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যথেচ্ছ প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিল। তা সে যা-ই হোক কেন, আমার মনে হলো, তোমার ভাষণের প্রতিক্রিয়া আমার অন্তরে যা হয়েছে তা তোমাকে জানানো দরকার।

রাজ্যের স্বার্থে আমি যখন আমার জীবিকাক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়াই, তখন আমার মনে হয়েছিল, ব্যক্তিগতভাবে রোগীর সেবা করার থেকে সমগ্রভাবে রাজ্যের সেবা করলে সেটা বেশি কাজে লাগবে। এ কর্তব্য করায় আমার অবসর বা স্বাস্থ্য কোনোটার দিকেই ভ্রূক্ষেপ করি নি। একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক হিসাবে যদি মনে করো দক্ষিণ কলকাতার পুনর্নির্বাচনের পরাজয়ের মাধ্যমে আমার সরকারের বিরুদ্ধে জনমত প্রকাশ পেয়েছে, তাহলে আমি যা করবো তা আমার কাছে খুবই স্পষ্ট। তোমার দ্বিতীয় মন্তব্য অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার আর জনমতের প্রতিনিধিত্ব নেই, এবং সেক্ষেত্রে একমাত্র সঙ্গত কাজ হচ্ছে আমার পদত্যাগ করা। এ বিষয়ে আমার সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করি নি। মাত্র ঘন্টাখানেক আগে তোমার ভাষণ পড়েছি। আর তখ্‌খুনি মনে হয়েছে তোমাকে আমার মতামত জানাতে একটুও দেরি করা উচিত নয়, যাতে আমি আগামী বৃহস্পতিবার সকালে সুইজারল্যাণ্ড যাবার আগেই তোমার উত্তরটা পেয়ে যেতে পারি। বিশ্বাস করো, যে দায়িত্ব স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছিলাম, তা যদি আমাকে ত্যাগ করতে বলা হয় তাতে আদৌ দুঃখিত হবো না। শুধু আমার সহকর্মীদের কথাটা জানাতে হবে, আর তা আমি জানাবো তোমার উত্তর পাওয়া মাত্র। যার ফলে, আমার ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা কার্যে পরিণত করা যেতে পারবে।

দ্রুত উত্তর আশা করছি।

তোমার বিশ্বস্ত
বিধান

এই চিঠিখানা শেষ হওয়া মাত্র দ্বিতীয় একখানা চিঠির ডিক্‌টেশন তিনি দিতে লাগলেন। এটি হচ্ছে তাঁর বন্ধু সর্দার প্যাটেলের উদ্দেশে লেখা।

কলকাতা
২০ শে জুন ১৯৪৯

প্রিয় বল্লভভাই,

পণ্ডিত নেহেরুকে আজ যে চিঠিখানা লিখলাম, তার একখানা কপি তোমাকে এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। এতে আমি যা অনুভব করেছি, তা-ই বলেছি, তার প্রত্যেকটি অক্ষর আমার আত্মপ্রত্যয়ের অভিব্যক্তি। আমার একমাত্র দুঃখ পণ্ডিত নেহেরু এই কথা উড়িয়ে দিতে চান যে, কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে তাঁর নিজের কোনো প্রতিরোধ প্রবৃত্তি নেই, যদিও ভারতের কম্যুনিস্টদের তিনি অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলে মনে করেন। তাঁর মতামতের এই অভিব্যক্তি, তুমি হয়ত স্বীকার করবে, এই রাজ্যে আমাদের অবস্থা অত্যন্ত অসুবিধাজনক করে তোলে। পরিস্থিতি যে কী রকম, তা তিনি উপলব্ধি করুন এই আমার ইচ্ছা। আমার আরও ইচ্ছা এই যে, তিনি নিজে এসে এই প্রদেশে কিছুদিনের জন্য সরকার চালিয়ে দেখুন, তাহলে সঠিক বুঝতে পারবেন সমস্যাটা কোথায়। মতামতের এই ধরনের অভিব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকাকে আরও কঠিনতর করে তোলে। কবে যে তিনি এটা বুঝবেন কে জানে, অপর পক্ষে দেখ, আমাদের জনসাধারণের কষ্ট লাঘবের জন্য খাদ্যের কোটা বাড়াবার যত চেষ্টা করেছি, ততবার সে প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় খাদ্যদপ্তর। সমস্যাগুলো যদি পুরোপুরি উপলব্ধি না করেন বা সহযোগিতা না করেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, তাহলে প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে কাজ চালানো সম্ভব নয়।

তোমার বিশ্বস্ত
বিধান

বাইশে জুন প্রধানমন্ত্রী উত্তর দিলেন অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাষায়, যাতে ডা. রায় তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজটা না করে বসেন। চিঠিটা হলো এই :

প্রিয় বিধান,

এই মাত্র তোমার ২০শে জুনের চিঠি পেলাম। আর পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে এই উত্তর লিখছি।

সবার আগে, আমার ব্যক্তিগত যে শ্রদ্ধা আছে তোমার প্রতি, তার আর পুনরুল্লেখ করতে চাই না। আমি স্থির জানি, জনসেবার প্রেরণা থেকেই তুমি মুখ্যমন্ত্রীত্বের বোঝা কাঁধে তুলে নিয়েছিলে। তা না হলে সরকারী বেসরকারী যে বহুবিধ কাজে তুমি যথেষ্ট ব্যাপৃত ছিলে, তার ওপরে এই বাড়তি ঝঞ্ঝাট পোয়াবার কোনোই দরকার ছিল না তোমার।

বর্তমান অবস্থায় তোমার পদত্যাগের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তুমি সুইজারল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসো, তখন হয়ত পরিস্থিতি আর একটু স্বচ্ছ হয়ে আসবে। আর তখন আমরা কথাটা বিবেচনা করে দেখবো। বাংলায় নতুন করে আবার সাধারণ নির্বাচনের সম্ভাবনাটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আরও অন্য উপায়ও আমাদের বিবেচনা করবার আছে।

আমি আবার বলছি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সম্পূর্ণভাবে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছেনা, এমন ধারণার কথা আমি একটুও বলি নি। যা আমি বলেছি তা হচ্ছে, দক্ষিণ কলকাতা এই রকম ধারণা করেছিল এবং কংগ্রেস ও মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছিল, কিন্তু প্রদেশের বাকি অংশ কী ধারণা করেছিল, সে হচ্ছে অন্য কথা।

সে জন্য আমি তোমাকে এখন তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে পরামর্শ দিচ্ছি না, তোমার চিকিৎসার জন্য তুমি সুইজারল্যাণ্ড ও অস্ট্রিয়ায় চলে যাও, সেখানে পুরোপুরি বিশ্রাম নাও, দুশ্চিন্তাও দূরে সরিয়ে রাখো, যতদূর সম্ভব কলকাতা ও তার সমস্যাবলীর কথা ভুলে থেকো।

তোমার প্রীতিমুগ্ধ
জওহরলাল নেহেরু"

দক্ষিণ কলকাতাকেন্দ্রের উপনির্বাচনে শরৎচন্দ্র বসুর জয়লাভ দেশবিভাগের পর বঙ্গরাজনীতির আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই উপনির্বাচনের ফলাফল কেবল বিধানচন্দ্র রায়কেই তাঁর মন্ত্রীসভার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তিত করে তোলেনি, জওহরলাল নেহরু ও সর্দার প্যাটেলকেও ওই ঘটনা সমভাবে চিন্তিত করে তুলেছিল। কিন্তু আবারও সেই ভবিতব্য, যা বারবার বঙ্গ রাজনীতির ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে। এই নির্বাচনের পরিশ্রমের জন্য তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি আইন ব্যবসা পুরোদমে চালিয়ে যান। এর একটা বড় কারণ হল 'দি নেশন' পত্রিকা প্রকাশনার ব্যয়ভার। এতে তাঁর শরীর আরও ভেঙে পড়ল। সেই সঙ্গে তাঁর প্রিয়তম ভাই সুভাষচন্দ্রের অস্তিত্ব ও অবস্থান সংক্রান্ত খবরাখবর তাঁকে আরও ব্যাকুল করে তোলে। এই অবস্থার মধ্যে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী শরৎবাবু ১৯৪৯ সালের পুজোর আগে আইনসভার স্বল্পকালীন অধিবেশনে যোগ দিতে পারলেন না। ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারিতে আইনসভার বাজেট অধিবেশনের আগে তিনি স্পিকারকে অনুরোধ করলেন, তাঁর জন্য যেন আইনসভার কক্ষে একটি ইজিচেয়ারের ব্যবস্থা করে রাখা হয়। স্পিকার ঈশ্বর দাস জালান শরৎ বসুর অনুরোধ মতো ইজিচেয়ারের ব্যবস্থা করে রাখলেন। কিন্তু আইনসভার বাজেট অধিবেশনের একদিন আগে শরৎচন্দ্র বসু চিরবিদায় নিলেন! সেই পুরুষোত্তম সত্য 'Thy Hand,

Great Remarche - শরৎবাবুর এক সময়কার সেক্রেটারি নীরদচন্দ্র চৌধুরি তাঁর Thy Hand Great Anarch (দাই হ্যান্ড গ্রেট অ্যানার্ক) গ্রন্থে শরৎচন্দ্র বসুর মৃত্যুকে এভাবেই চিহ্নিত করেছেন।

১৯৫০ বঙ্গজীবনের ইতিহাসে এক শোচনীয়তম অধ্যায়ের সূচনা করল। দেশবিভাগের যে বিষপাত্র গান্ধীজি বাঙালির হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন সেই বিষপাত্র এক অদৃশ্য নায়ক বাঙালির হাতে ফের তুলে দিল ১৯৫০-এর জানুয়ারির শেষের দিকে। গান্ধীজির হত্যার পর সামগ্রিকভাবে এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক শান্তির এক বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল। পূর্ববঙ্গের (পূর্ব পাকিস্তানের) হিন্দুরা নিজেদের অনেকটা নিরাপদ বোধ করতে আরম্ভ করেছিল। পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমানদের মনেও হিন্দুদের এই মুহূর্তে বিতাড়নের মানসিকতা গড়ে ওঠার কোনও লক্ষণও দেখা দেয়নি। ফলে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারে ২৫ থেকে ২৮ শতাংশ হিন্দু কর্মচারি নিযুক্ত ছিল। বেসরকারি জীবনে অর্থাৎ শিক্ষা, আইনব্যবসা এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে ওই সংখ্যা তখন ৫০ শতাংশেরও বেশি ছিল। সমাজজীবনের ওই অংশগুলি থেকে হিন্দুরা বিতাড়িত হলে বাঙালি মুসলমানেরা ওই শূন্যস্থানগুলি পূরণ করবে, এমন অবস্থা তখন তাদের ছিল না। ফলে কোনও রকম পূর্বাভাষ ছাড়াই ১০ জানুয়ারির (১৯৫০) পর প্রদেশের প্রায় বারোটি জেলায় হিন্দুবিরোধী দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল। এই দাঙ্গার এক ধাক্কায় প্রায় ৩৫ লাখ হিন্দু চলে এল পশ্চিমবঙ্গে, ত্রিপুরায় এবং অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও কাছাড় জেলায়। প্রতিহিংসামূলক দাঙ্গায় বিপন্ন হল পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলের কাছাকাছি জেলার মুসলমানেরা। বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের সম্পৃক্ত সমাজজীবনকে এ রকম বড় আঘাত দেশবিভাগও দিতে পারেনি। এই দাঙ্গা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা প্রায় ত্রিশ লাখ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালির জীবনবোধ, মমত্ব, দায়ভাগ ও মূল্যবোধকে একেবারে ওলট-পালট করে দিল। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে এক নতুন প্রজন্ম দেখা দিল যাদের জন্ম রেললাইনের পাশে জবরদখল জমির কুঁড়েঘরে এমনকী রেলগাড়ির পরিত্যক্ত কামরায়। শিয়ালদা স্টেশনের ৭৫/৮০ মাইলের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা ধুবুলিয়া, বাদকুল্লা, রূপশ্রী, কুপার্সক্যাম্প, তাহেরপুর, রাণাঘাট, ঘোলা প্রভৃতি শরণার্থী শিবিরের মেয়েদের দেখা যেতে লাগল সন্ধ্যার অন্ধকারে ধর্মতলা, চৌরঙ্গি, এসপ্ল্যানেডের মোড়ে। পাওয়া যেতে লাগল কলকাতার পতিতালয়গুলিতে 'বাঙাল' উচ্চারণভঙ্গির মেয়েদের অস্তিত্ব। শুধু বেঁচে থাকা, ভাইবোন ও বৃদ্ধ মা বাপের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নিজেদের মানুষের ভগ্নাংশে পরিণত করা। সীমান্তশহর বনগাঁর লাখ লাখ শরণার্থীর মাঝে দাঁড়িয়ে ওই সময় সমাজজীবনের

এই অবনমনের কথা মনে রেখে জওহরলাল নেহরুকে বলতে হয়েছিল 'Partition of the Country brought many evils at its train....' । গান্ধীজির সেক্রেটারি অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু বোধহয় একমাত্র বাঙালি যিনি তাঁর অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে শরণার্থীদের মানসিকতা সম্পর্কে কিছু গবেষণা করে ওই সময় রচনা করেছিলেন 'Social tension among East Pakistani refugees' ।

এবার বলছি ওই দাঙ্গার সূত্রপাত কীভাবে ঘটল। ১৯৫০ সালের জানুয়ারির শেষ দিকে পশ্চিমবাংলা সরকারের গোয়েন্দাসূত্রে এ রকম সংবাদ পাওয়া গেল যে খুলনাজেলার বাগেরহাট মহকুমার কয়েকটি দূরবর্তী গ্রামে হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর কিছু আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। খুলনা রেল স্টেশনের প্ল্যাটফরমে বহু লোক ভিড় করে রয়েছে। কিন্তু বিশদ কোনও খবর নেই। কিন্তু ১১ জানুয়ারি খুলনা থেকে যে বরিশাল এক্সপ্রেস ট্রেনটি দুপুরের পর শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছানোর কথা, সেটি তখনও সীমান্তবর্তী বনগাঁ স্টেশনে পৌঁছায়নি। অবর্ণনীয় ভিড়ে ঠাসা ট্রেনটি এক শীতের বেলার শেষে বনগাঁ স্টেশনে এল। যাত্রীদের আকুল ক্রন্দন ও হাহাকার ছড়িয়ে পড়ল। রাজ্য সরকারের নির্দেশে পুলিশ ট্রেনটি কয়েকঘণ্টা আটকে রাখল। যে সব যাত্রীর পশ্চিমবাংলায় থাকার কোনও জায়গা নেই, তাদের ট্রেন থেকে নামিয়ে রাখা হল। পরদিন থেকে কলকাতা হাওড়া চব্বিশপরগনা ও হুগলির শহর ও শিল্পাঞ্চলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। মুসলমান সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হতে লাগল। সারা পশ্চিমবাংলায় ১৪৪ ধারা জারি হল। কলকাতা শহর ও শিল্পাঞ্চলে কার্ফু বলবৎ করা হল। বহু এলাকা সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেওয়া হল। ১৫ জানুয়ারি থেকে পূর্ববাংলার জেলাগুলির ভয়াবহ দাঙ্গার সংবাদ আসতে লাগল।

সব চেয়ে শোচনীয় অবস্থা ছিল বরিশালজেলার। জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ফজলুল হক সাহেব কলকাতায় আসেন তাঁর ঝাউতলা রোডের বাড়ি বিক্রির বন্দোবস্ত করতে। কলকাতায় তিনি তাঁর পুরনো বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন। কলকাতায় আসার দিন থেকেই পশ্চিমবাংলা সরকার তাঁর চলাফেরার জন্য তাঁকে একটি গাড়ি ও নিরাপত্তা রক্ষী দেন। কিন্তু ওই সময়ে বরিশাল শহরে ও গ্রামাঞ্চলে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে কলকাতায় হিন্দুরা হক সাহেবকে খুন করে ফেলেছে। এই গুজবের প্রতিক্রিয়ায় বরিশাল শহর এবং ভোলা, পটুয়াখালি ও পিরোজপুর মহকুমার পাঁচ থেকে সাত হাজার হিন্দু খুন হয়েছে। বরিশালের পরিস্থিতি এমন এক অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল যে ফজলুল হক সাহেব তাঁর কলকাতার সম্পত্তির বিক্রি বন্দোবস্ত স্থগিত রেখে দ্রুত বরিশালে ফিরে যান। শোনা গিয়েছিল যে হক সাহেব স্টিমার থেকে বরিশালের মাটিতে পা দিয়ে শহরে ও তার আশেপাশে ১৬টি জায়গায় সভা করে বলেছিলেন, 'তোমরা দেইখ্যা যাও আমি মরি নাই। কিন্তু তোমরা এই কী করলা।' এই দাঙ্গায় বরিশাল শহর থেকে স্টিমারে প্রায় সোয়া-ঘণ্টার দূরত্বে অবস্থিত সায়েস্তাবাদ নামের একটি গ্রামের একজন হিন্দুও আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। বরিশালের পর দাঙ্গা ভয়াবহ আকার নেয় খোদরাজধানী ঢাকায়, নারায়ণগঞ্জে, কুমিল্লার চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়, নোয়াখালি, শ্রীহট্ট এবং ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ ও মাদারিপুর মহকুমায়।

ভারতীয় উপমহাদেশের তপশিলি সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা এবং পাকিস্তানের স্রষ্টা মহম্মদ আলি জিন্নার অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল সে সময় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আইনমন্ত্রী। তাঁর পরিবারের একাংশ ঢাকায় ভাড়া করা একটি বাড়িতে বাস করতেন এবং তাঁর এক মেয়ে ঢাকার এক কলেজে পড়তেন তখন। তাঁরাও আক্রান্ত হন এবং পূর্বপাকিস্তান সরকার তাঁদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়। ঢাকার ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের সিক্রেট সার্ভিসের লোকেরা অত্যন্ত সতর্কতা ও তৎপরতার সঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের মেয়ে ও পরিবারের কয়েকজনকে পশ্চিমবাংলায় নিরাপদে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। আর একটি ঘটনা ঘটে মুকুন্দবিহারী মল্লিককে নিয়ে। মুকুন্দবাবু অবিভক্ত বাংলায় নাজিমুদ্দিন ও সুরাবর্দি মন্ত্রিসভায় (মুসলিম লিগ মন্ত্রিসভা) মন্ত্রী ছিলেন। তিনি কলকাতা হাইকোর্টের খুব নামকরা উকিল ছিলেন। দেওয়ানি মামলায় তাঁর খুব খ্যাতি ও পশার ছিল। দেশবিভাগের সময় কলকাতা হাইকোর্টের প্রবীণতম মুসলিম বিচারপতি মহম্মদ আক্রাম ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মনোনীত হন। দেওয়ানি মামলায় প্রসিদ্ধ যে সব উকিলের পূর্ববাংলায় ঘরবাড়ি বিষয়সম্পত্তি রয়েছে সে সব হিন্দু উকিলদের বিচারপতি আক্রাম ঢাকা হাইকোর্টে এসে প্র্যাকটিস করার আবেদন রেখেছিলেন। তখনকার দিনে কলকাতা হাইকোর্টের মোট দেওয়ানি মামলার ৬০ শতাংশ মক্কেলই ছিল পূর্ববাংলার। বিচারপতি আক্রামের অনুরোধে বহু হিন্দু উকিল সাড়া দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মাঝে মাঝে ঢাকায় গিয়ে মামলা করে আসতেন। আবার কেউ কেউ ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে ওকালতি করবেন এই ইচ্ছা নিয়ে ঢাকায় চলে গিয়েছিলেন। মুকুন্দবিহারী মল্লিক ছিলেন এই শেষোক্ত দলেরই একজন। তিনি আইনের বহু বইপত্র নিয়ে ঢাকায় চলে গেলেন এবং সেখানে উয়াড়ি এলাকায় বাড়ি ভাড়া করলেন। দাঙ্গার সময় ৪/৫ দিন তিনি সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েন। তাঁর ভাড়া করা বাড়ির একাংশ আগুনে পুড়ল। ফলে বাড়ির বিদ্যুৎ ও ফোনের লাইন বিকল, দোকানবাজার বন্ধ। বাইরে বের হওয়ার উপায়

নেই। ওই অবস্থার মধ্যে একদিন ঢাকা ফায়ার ব্রিগেডের একজন অ্যালো ইন্ডিয়ান অফিসার তাঁর খোঁজ নিতে এলেন। ওই অফিসার যখন কলকাতা ফায়ার ব্রিগেডে কাজ করতেন, সে সময় মুকুন্দবিহারী মল্লিক ওই দফতরের মন্ত্রী ছিলেন এবং মন্ত্রীর কাছ থেকে তিনি কোনও একটি সরকারি ব্যাপারে সাহায্য পেয়েছিলেন। তিনি ঢাকাতেও মুকুন্দবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। মুকুন্দবাবু ওই অফিসারের সাহায্যে স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দরে এলেন। তখন কলকাতা — ঢাকার মধ্যে দিনে একবার একখানা প্রাইভেট ডাকোটা বিমান চলাচল করত। ওই বিমানে কোনওপ্রকারে আসন পেয়ে মুকুন্দবিহারী মল্লিক কলকাতায় ফিরে এলেন।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের গোয়েন্দারা মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়কে খবর দিল যে বরিশাল, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দ, খুলনা প্রভৃতি জংশন স্টেশন ও স্টিমারঘাটে কয়েক লাখ হিন্দু জড়ো হয়ে পশ্চিমবাংলায় চলে আসার জন্য আর্তনাদ করছে। এ সম্পর্কে বিধানবাবু ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার সন্তোষকুমার বসুর কাছ থেকে কোনও খবরাখবর পাচ্ছেন না। ফলে ডেপুটি হাইকমিশনারের ভূমিকায় তিনি ক্ষুব্ধ। এই অবস্থার মধ্যে ময়মনসিংহের মহারাজ শশীকান্ত আচার্য চৌধুরীর পুত্র কমিউনিস্ট নেতা স্নেহাংশুকান্ত আচার্য তাঁদের ময়মনসিংহ ও ঢাকার বিভিন্ন সেরেস্তার নায়েব ও ম্যানেজারদের এবং নিজেদের আত্মীয়স্বজনদের খোঁজ নেওয়ার জন্য বিধানবাবুর কাছে এলেন। বিধানবাবুর অনুরোধে স্নেহাংশুকান্ত আচার্য ঢাকা যেতে রাজি হন। বিধানবাবু জানতেন যে জনপ্রিয় স্নেহাংশুবাবু ঢাকা হাইকোর্টের বহু বিচারপতির ব্যক্তিগত বন্ধু। সুতরাং সরকারের কূটনৈতিক প্রতিনিধির চেয়েও স্নেহাংশুবাবুর কাছ থেকে অনেক বেশি কাজ পাওয়া যাবে। স্নেহাংশু আচার্য ঢাকা বিমানবন্দরে নেমে দেখলেন যে ঢাকা শহর কার্ফু কবলিত। তিনি তাঁর বন্ধু ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মহম্মদ আক্রামকে ফোন করলেন। বন্ধুবৎসল আক্রাম সাহেব কার্ফুর মধ্যে নিজে গাড়ি চালিয়ে স্নেহাংশুবাবুকে ঢাকা বিমানবন্দর থেকে বাড়িতে নিয়ে এলেন। কেবল তাই নয়, ঢাকা শহরের উপদ্রুত অঞ্চলগুলি যেখানে হিন্দু সংখ্যালঘুদের জীবন ও ধনসম্পত্তির সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে সে সব জায়গা দেখিয়ে দিলেন। পূর্বপাকিস্তানের সে সময়কার মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন সাহেবও স্নেহাংশু আচার্যের বিশেষ পরিচিত ছিলেন। এক দিকে নুরুল আমিন সাহেব কলকাতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন এবং উভয়েই একই জেলা ময়মনসিংহের লোক। স্নেহাংশুবাবু নুরুল আমিন সাহেবের সঙ্গে ও দেখা করলেন। স্নেহাংশুকান্ত আচার্য তাঁর তিন দিনের ঢাকা সফরে সব চেয়ে বিরক্তিকর ব্যবহার পেয়েছিলেন ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার সন্তোষকুমার বসুর কাছ থেকে। তিনি কলকাতা ফিরেই সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের সঙ্গে দেখা করলেন এবং ঢাকা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীকে বিশদভাবে জানালেন। ডা. রায় স্নেহাংশুবাবুর কাছ থেকে সব শুনলেন এবং ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারের ভূমিকা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে একটি রিপোর্ট পাঠালেন। বিধানবাবুর পরামর্শ ও প্রস্তাব মেনে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ঢাকার ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার সন্তোষকুমার বসুকে অপসারিত করলেন এবং তাঁর জায়গায় নিযুক্ত করলেন অসমের বাঙালি মন্ত্রী বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে। বৈদ্যনাথবাবু খুব সাহসী লোক ছিলেন।

ঢাকা, বরিশাল সহ পূর্বপাকিস্তানের বিভিন্ন জেলায় যখন ওই অবস্থা চলছে, তখন চব্বিশ পরগণার বারাকপুর, হাওড়া এবং হুগলির শিল্পাঞ্চলে বিশেষ করে চটকলগুলিতে বীভৎস ঘটনা ঘটতে থাকে। ওই চটকলগুলির ৯০ শতাংশ শ্রমিকই ছিল বিহারের কোন এবং তাদের মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ হল মুসলমান। নির্বিচারে ওই চটকলগুলির শ্রমিকবস্তির মুসলমানেরা আক্রান্ত হতে লাগল। বহু জীবনহানি ঘটল।

ওখানে একটি বৃহৎ চটকলের মালিক ছিল এন্ড্রু ইয়ুল (Andrew Yule) কোম্পানি। এই কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা জর্জ ইয়ুল (George Yule) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম। ১৮৮৮ সালে জাতীয় কংগ্রেসের এলাহাবাদ অধিবেশনে এই জর্জ ইয়ুল ছিলেন সভাপতি। ১৯৫০ এর দাঙ্গার সময় জর্জ ইয়ুলের নাতি (মেয়ের ছেলে) মি. এ এল ক্যামেরন (A L Cameron) প্রাচীনতম বণিকসভা বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের (Bengal Chamber of Commerce) সভাপতি। তিনি তাঁর দাদামশাইয়ের কোম্পানির সব চেয়ে বড় অংশীদার এবং কোম্পানির চটকলের প্রধান। হাওড়া ও হুগলিতে গঙ্গার পশ্চিমপাড়ের এসব চটকলগুলির শ্রমিকবস্তিগুলির আক্রমণকারীদের নেতা ছিলেন রাম চ্যাটার্জি (পরবর্তীকালে তিনি প্রগতিশীল মার্কসবাদী আন্দোলনের নেতা হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন)। ওই চটকলের সাহেবমালিক ও প্রহরীরা গুলি চালিয়ে কয়েকবার আক্রমণকারীদের হটিয়েও দিয়েছিল। মি. ক্যামেরন, বেঙ্গল চেম্বারের সভাপতি দাঙ্গাকারীদের প্রতি পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে রাইটার্স বিল্ডিংসে কিছু অভিযোগও জানিয়েছিলেন। তিনি তাঁর শ্রমিকদের রক্ষার জন্য বস্তি থেকে সরিয়ে চটকলের অফিসে ও কারখানার মধ্যে আশ্রয় দেন। এসবের জন্য ক্যামেরন সাহেব দাঙ্গাকারীদের এক প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হন। এই পরিস্থিতির মধ্যে তিনি চটকলগুলির অবস্থা দেখতে বের হন তাঁর মুসলমান ড্রাইভারকে নিয়ে। কয়েকটি চটকল এলাকা দেখে তিনি যখন ফিরছিলেন, সে সময় ব্যান্ডেলের

একটি লেভেল ক্রসিং-এ তাঁর গাড়ি আটকে যায়। ওই সময় আক্রমণকারীরা ক্যামেরন সাহেবের গাড়ি ঘিরে ফেলে। প্রথমে তারা তাঁর মুসলমান ড্রাইভারকে ও পরে তাঁকে খুন করে। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে ১৯৫০ সালের ২৬ মার্চ। মাত্র এক মাস আগে ক্যামেরন সাহেব বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি হয়েছিলেন।

এই ঘটনায় ভারতীয় গণপরিষদ স্তম্ভিত হয়ে পড়ে এবং গণপরিষদের অধিবেশন মুলতুবি রেখে ইয়ুল সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছুটে আসেন কলকাতায়। তিনি হাওড়া ও হুগলির শিল্পাঞ্চলগুলিতে যান। রাম চ্যাটার্জিকে গ্রেফতার করতে না পারার দরুন তিনি হাওড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অধিক্রম মজুমদারকে (Adhikram Majumdar) 'বেতমিজ' বলে তিরস্কার করেন এবং এর পরপরই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বদলি করে দেওয়া হয়।

জানুয়ারি মাসের (১৯৫০) শেষ নাগাদ পূর্ববাংলার জেলাগুলিতে হিন্দুদের উপর আক্রমণের ঘটনা কমতে আরম্ভ করলেও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা ভেবে দেশত্যাগের স্রোত বাড়তে লাগল। ওই সব জেলা থেকে রেলপথে কলকাতার দিকে আসতে হলে সেই সময় প্রধানত তিনটি জায়গা থেকে ট্রেন ধরতে হত। ওই জায়গাগুলি হল গোয়ালন্দ, পাবতীপুর ও খুলনা। ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও ফরিদপুর জেলার উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের হিন্দুরা গোয়ালন্দে এসে জড়ো হতে লাগল। পূর্ব বাংলা প্রদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলির হিন্দুরা পার্বতীপুর থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত বিস্তৃত রেলপথের বড় স্টেশনগুলিতে জমায়েত হত। অন্য দিকে ফরিদপুরের পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের এবং যশোর ও খুলনা জেলার দক্ষিণাঞ্চলের এবং সমগ্র বরিশাল জেলার হিন্দুরা লাখে লাখে এসে দাঁড়াত খুলনা স্টেশনে।

খুলনা থেকে শিয়ালদা স্টেশনের দূরত্ব ১১৬ মাইল। খুলনা থেকে পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত পর্যন্ত সড়ক যোগাযোগ ভাল থাকায় হাজার হাজার হিন্দু শরণার্থী বাসে করে সীমান্তে আসত। কিন্তু বরিশালজেলার হিন্দুদের ভিড় গোয়ালন্দ স্টিমারঘাটে এত বেড়ে গেল যে স্টিমারে স্থান সংকুলান অসম্ভব হয়ে পড়ল। ওই স্টিমার তাদের খুলনা পৌঁছে দেবে। বরিশাল থেকে জলপথে খুলনা আসতে সময় লাগে প্রায় বারো ঘণ্টা। সমুদ্রের মতো অনেকগুলি বড় নদী পাড়ি দিতে হয় স্টিমারকে। ফলে নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি লোক স্টিমারে তোলা যায় না। এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় ওই ব্রিটিশ স্টিমার কোম্পানির (আর-এস-এন এবং আই-জি-এন নামে এই দুই কোম্পানি পরিচিত ছিল) লন্ডন ও কলকাতার কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। বিধানচন্দ্র রায়ের অনুরোধে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ প্রায় একমাসব্যাপী বিশেষ স্টিমার চালাল বরিশাল স্টিমার ঘাট থেকে কলকাতার জগন্নাথ ঘাট পর্যন্ত। বরিশালের প্রায় এক লাখ হিন্দু এ ভাবে ৭২ থেকে ৭৫ ঘণ্টা স্টিমারে থেকে কলকাতা এসে পৌঁছায়। এই শরণার্থীদের নিয়ে আসা স্টিমারগুলি জগন্নাথ ঘাটে ও 'ম্যান অব ওয়ার' জেটিতে নোঙর করলে অপেক্ষমাণ আত্মীয় স্বজনেরা কান্নায় ভেঙে পড়ত।

এদিকে ট্রেনে করে হিন্দু শরণার্থীদের আসা চলছে অবিরাম। পূর্ববঙ্গের এই দাঙ্গা এবং তার প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করল সে সম্পর্কে সরোজ চক্রবর্তী তাঁর 'মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে' গ্রন্থে বলেছেন —

"কিন্তু ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে পূর্ববঙ্গ থেকে যে উদ্বাস্তু-জনস্রোত আসতে লাগলো, সংখ্যায় তা হলো বৃহত্তম। এই সংখ্যা পূর্বের সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করলো। খুলনা জেলার নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের ওপর ব্যাপক অত্যাচার হয়েছিল, এবং তার ফলে নরনারী ও শিশুদের এক বিশাল জনতা বনগাঁ সীমান্ত পার হয়ে ভারতে এসে পড়লো। পাকিস্তান সরকার হিংসাত্মক ঘটনার খবর প্রথম দিকে একেবারে চেপে দিয়েছিল। ডাঃ রায় সাবধান-বাণী উচ্চারণ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী তার প্রত্যুত্তর করলেন। এ সব বাদবিসম্বাদ সত্ত্বেও হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের ভয়াবহ কাহিনী চারদিকে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়লো, ১৩,০০০ উদ্বাস্তু সীমান্তবর্তী নগর বনগাঁয় এসে হাজির হলো। রাজশাহী ও ঢাকাতে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল, কিন্তু সব থেকে ভয়াবহ ঘটনা ঘটলো বরিশালে। রেল স্টেশনে, স্টীমার-ঘাটে, আর ঢাকা বিমানবন্দরে অসহায় উদ্বাস্তুর দল আটকে পড়ে রইলো। ডাঃ রায় এদের ভারতে আনবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশের অপেক্ষায় না থেকে তিনি নিজের দায়িত্বে ১৬ খানি ভাড়া-করা প্লেন ঢাকায় পাঠালেন ঐ আটকে পড়া মানুষদের নিয়ে আসতে। এয়ার ওয়েজ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের তিনি নিজে ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। সেই হিসাবে ঐ কোম্পানীর কে ফোন করে টেলিফোন করে বললেন, — যতখানি সম্ভব প্লেন ঢাকায় পাঠাও, আর যাদের আনবে, তাদের কাছ থেকে ভাড়া চাইবে না।

ওদিকে ট্রেন বা স্টীমারে যে সব হিন্দুরা আসছিল, তাদের কোতল করার কাহিনী ছড়িয়ে পড়ছিল, স্থলপথে অথবা জলপথে, উভয় পথেই পূর্ববঙ্গ থেকে বন্দুকধারী রক্ষীর সাহায্য ছাড়া চলে আসা খুবই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি অফিস থেকে বাড়ি এসে শুনলেন, সীমান্ত থেকে কয়েকটি রেলের বগী এসেছে সম্পূর্ণ খালি, তাতে শুধু শাঁখা-ভাঙা, ছেঁড়া শাড়ী-ধুতি আর জামার অংশ, রক্তের দাগ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি টেলিফোনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। আমরা যারা নিচের তলায় ছিলাম শুনতে পাচ্ছিলাম তাঁর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। উত্তেজিত কণ্ঠে

চেঁচিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বলছেন — সংখ্যালঘুদের রক্ষা করা আর আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। মানুষের এই চরম দুর্ভোগের শেষ করতে হলে চাই এখন যুদ্ধ।

বাস্তবিকই তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। আর, এর পরেই কলকাতায় জ্বলেছিল আগুন। হাওড়ার অবস্থাও তথৈবচ। সেখানকার অবস্থা বরং আরও খারাপ। কলকাতা, হাওড়া এবং পশ্চিমবঙ্গের আরও কয়েকটি জায়গায় কারফিউ জারি করা হলো। হাওড়ার দাঙ্গা থামাতে একজন জবরদস্ত মিলিটারি অফিসার ব্রিগেডিয়ার রন্‌ধাওয়াকে কাজে লাগানো হলো। এক কথায়, পুলিশকে সাহায্য করবার জন্য মিলিটারি নামানো হয়েছিল।

কলকাতায় যখন জোর দাঙ্গা চলছে, তখন একদিন সন্ধ্যাবেলা অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক্ তাঁর বালক-পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে ডাঃ রায়ের বাড়িতে এসে হাজির। আমি তাঁকে ফটক থেকে ভিতরে অফিস-ঘরে নিয়ে এসে বসালাম। ডাঃ রায় তখন অফিস থেকে ফিরে আসেন নি। হক্ সাহেব অত্যন্ত ফূর্তিবাজ লোক, কিন্তু তাঁকে তখন অত্যন্ত গম্ভীর আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল। তিনি বললেন, পথে আসতে আসতে দাঙ্গার চেহারা দেখলাম ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবার দৃশ্যও চোখে পড়লো। মুসলমান সংখ্যালঘুদের বাঁচানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য চাইতে এসেছি। আমার ঝাউতলায় নিজের বাড়িও খুব নিরাপদ নয়।

আমি হক্‌সাহেবকে জানতাম সেই দিন থেকে, যে দিন তিনি অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। বিধানসভায় প্রদত্ত তাঁর বহু বক্তৃতাই আমাকে মাতিয়ে তুলেছিল একদিন।

আমি বিনীতভাবে তাঁকে প্রশ্ন করলাম — স্যার, দেশ ভাগ করে আপনারা যখন পাকিস্তান করলেন, তখন কি ভাবতে পেরেছিলেন, দুই বাংলার মানুষের জীবনেই এমন দুর্দশার করাল ছায়া নেমে আসবে?

হক্‌সাহেব উত্তরে নিচুগলায় বললেন — না এমন যে হবে তা আমি কোন মতেই ভাবতে পারি নি।

যাইহোক, একটু পরেই ফিরে এলেন ডাঃ রায়। দুইজনে রুদ্ধ দ্বার-কক্ষে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। শেষ হলে ডাঃ রায় আমাকে বললেন — ওহে, তুমি হক্‌সাহেবের সঙ্গে যাও, বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসো।

ওঁর গাড়ির পিছন পিছন বন্দুকধারী পাহারাদার সান্ত্রীপরিবৃত গাড়িখানাকেও চলতে বলা হলো। কিন্তু হক্‌সাহেব বিদায় নেবার আগে ডাঃ রায় তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন, — আপনি এখুনি বরিশাল চলে যান, সেখানে ঘোর দাঙ্গা বেঁধেছে। এই কারণে যে, গুজব রটেছে কলকাতার হাঙ্গামায় ফজলুল হক্ মারা গেছেন। আমি এখানকার পাগলামি বন্ধ করার সব রকম চেষ্টা করছি, কিন্তু আপনিও আমাকে সাহায্য করুন। আপনি আপনার নিজের দেশ বরিশালে গেলে লোকে আপনাকে সশরীরে দেখে বুঝতে পারবে যে, আপনি নিরাপদে আছেন এবং বেঁচে আছেন।

বলা বাহুল্য, হক্‌সাহেব রাজী হয়ে খুব শীগ্‌গিরই চলে গিয়েছিলেন বরিশালে। পূর্ববঙ্গ থেকে ১৯৫০-এর এই দ্বিতীয়বারের বিপুল উদ্বাস্তু-জনস্রোত, যার ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ছিল, তা রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক যন্ত্রকে প্রায় ভেঙে ফেলবার উপক্রম করছিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতো লোক পশ্চিমবঙ্গ নেবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। ডাঃ রায়ের পক্ষেও এই চাপ সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। কেন্দ্রকে তিনি লিখছিলেন ও টেলিফোনে বলছিলেন — ও দেশ ছেড়ে যারা চলে আসছে, তাদের জন্য বন্দুকধারী রক্ষীর ব্যবস্থা করার জন্য পাকিস্তানকে বলা হোক, উপদ্রুত অঞ্চলেও উপযুক্ত রক্ষীর ব্যবস্থা করা হোক, হিংসাত্মক কার্যকলাপে যারা লিপ্ত, তাদের গ্রেপ্তার করা হোক, পাকিস্তান সরকারের নেতারা উপদ্রুত এলাকায় ব্যপকভাবে ঘুরে বেড়িয়ে শান্তি স্থাপনা করুক।

তাঁর কথাতেই হোক আর যে জন্যই হোক, লিয়াকৎ আলি খান পূর্ব-পাকিস্তানে চার দিনের এক ভ্রমণসূচী পালন করেছিলেন। জনসভা করেছিলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। তিনি বরিশালেও গিয়েছিলেন। লাখুটিয়া ছিল সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা, তিনি সেখানেও গিয়েছিলেন। লাখুটিয়ার জমিদার-পরিবার উপদ্রবের লক্ষ্যস্থল ছিল। মেয়েদের হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এসে তাদের অপহরণ করা হয়েছিল। (এটা অবশ্য লিয়াকৎ আলি তাঁর একটি ভাষণে অস্বীকার করেছিলেন)। অভিজাত এক হিন্দু জমিদারের স্ত্রী কলকাতায় থাকতেন, কিন্তু ঐ সময় তিনি ওখানে ছিলেন। তিনি একদিন মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে এসে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। বর্ণনা করলেন তাঁর গ্রাম লাখুটিয়ার হিন্দুদের দুর্দশার কথা।

পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু ছাড়া, এই পশ্চিমবঙ্গেও এ জেলা ও জেলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক চলাচল শুরু হয়ে গিয়েছিল। যার ফলে এই প্রদেশে ভিতরে-বাইরে দুদিক থেকেই উদ্বাস্তুর চাপ সামলাতে হচ্ছিল। একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছিলাম, যখনই বড়োরকমের কোনো সাম্প্রদায়িক আগুন জ্বলে উঠতো, তখন কোনো চরমপন্থী আন্দোলন দেখা দিত না বললেই হয়, আর সে সময় সবাই সরকারকেই রক্ষাকর্তা বলে গণ্য করতো।

পরিস্থিতির মোকাবিলায় সাম্প্রদায়িক অথবা অন্যধরনের আন্দোলন দমনে সঠিক পন্থা অবলম্বন করায় ডাঃ রায় ও তাঁর সরকারের জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে স্থিতিশীলতা লাভ করছিল। যে সব রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপের ফলে সন্ত্রাসের সৃষ্টি হতে পারে তাদের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ডাঃ রায়। খবরের

কাগজের সম্পাদকদের ডেকে বললেন — এমন খবর আপনারা ছাপবেন না, যাতে উত্তেজনা বাড়তে পারে। এমন ঘটনার কথাও প্রকাশ করবেন না, যা থেকে সাম্প্রদায়িক সঙ্কট দেখা দিতে পারে।

তখনকার মতো খবরের সেন্সার করার ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন তিনি। কাগজওলোকে ছাপাবার আগে খবর-টবরগুলো সরকারের কাছে পাঠিয়ে সেন্সার করিয়ে নিতে হতো। উদ্বাস্তুদের আকস্মিক আগমনের ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, এবং পূর্ববঙ্গের কয়েকটি জেলায় সংখ্যালঘুদের যে কী শোচনীয় অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল, সে সম্পর্কে তিনি প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন ১৫ই ফেব্রুয়ারিতে লিখিত একটি চিঠিতে। লোক বিনিময়ের প্রস্তাব সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ উত্তর এসে পড়লো, যাতে ঐ সমস্যার বিষয়ে তাঁর তখনকার চিন্তাধারার একটা পরিচয় পাওয়া যায়।

নয়াদিল্লী, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০

প্রিয় বিধান,

তোমার ১৫ই ফেব্রুয়ারির চিঠির জন্য ধন্যবাদ। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের এই সমস্যার বিষয়টি আমরা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিচার বিবেচনা করছি। তোমার সঙ্গে আমি একমত যে আর গড়িমসি না করে কী নীতি নেওয়া হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে আমাদের আসা উচিত। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি লক্ষ লক্ষ লোককে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে সরিয়ে দেওয়া আমাদের ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে। এই কাজে হাত দিতে গেলেই বিরাট অসুবিধা ও সংকটের সৃষ্টি হবে। এটা স্থিরনিশ্চয় যে পাকিস্তান আমাদের এক ইঞ্চিও জমি ছেড়ে দেবে না, সম্ভবত একমাত্র যুদ্ধ ছাড়া। আমরা এখন সত্যিই চরম পন্থার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি।

আমার মনে হয় এই বিষয়টা আমাদের বিবেচনা করে দেখা উচিত অল্প কিছু দিন পরে, অবশ্য খুব বেশি দিনও নয়। আর দুই কি তিন সপ্তাহ পরে পরিস্থিতি স্বচ্ছ হয়ে আসবে।

সমগ্র জাতিগত এই পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার নিজের ধারনার কথা আমি তোমাকে বলতে পারি। আমার মনে হয় বর্ষার আগের মাসগুলি বেশ সংকটপূর্ণ। এই সময়টা যদি আমরা উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারি, তাহলে মানসিক চাপ আর বড়ো কোনো সংঘাতের সম্ভাবনা ধীরে ধীরে কমে যাবে। আরও সাত আট মাস কাটাতে পারলে ওটা বরং আরও কমবে। সেজন্য পরিস্থিতিকে আমাদের দেখতে হবে স্বল্পব্যাপী দৃষ্টিকোণ থেকে।

আমার পরামর্শ হচ্ছে, তিন সপ্তাহ বা ঐরকম কাছাকাছি কোনো সময় পরে তুমি এখানে চলে এসো, আমরা এ সব বিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে পুরোপুরি আলোচনা করতে পারবো। ইতিমধ্যে, তুমি জানো, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের ঘটনাবলী সম্পর্কে অনুসন্ধান করবার জন্য আমরা জয়েন্ট কমিশন বসানোর প্রস্তাব দিয়েছি। এই কমিশন যদি বসে, তাহলে আমাদের সাক্ষাৎকারের আগে এদের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করাই সমীচীন হবে।

তোমাদের
জওহরলাল

পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে কেন্দ্রকে অবশ্য ইতিমধ্যে পূর্ণ সচেতন করে দেওয়া হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী রাজ্যসভায় ২৩শে ফেব্রুয়ারি চার হাজার শব্দযুক্ত তাঁর ভাষণে খুলনার বিয়োগান্ত ঘটনাবলীর উল্লেখ করেছেন, করেছেন রাজসাহী আর বরিশালের দাঙ্গার উল্লেখ, তারপর বলেছেন মুর্শিদাবাদ, কলকাতা ও ঢাকার ঘটনার কথা। লোক বিনিময়ের প্রস্তাব তিনি সম্পূর্ণ অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তবে রাজ্যসভাকে এই আশ্বাসও তিনি দিলেন যে এবার থেকে বাংলার বিষয় পাবে সর্বাধিক প্রাধান্য, এবং বাংলা ও কাশ্মীর যার সমস্যা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, সে সম্পর্কে তিনি নিজে আত্মনিয়োগ করবেন সব থেকে বেশি। এই সংকল্প অনুসারে মার্চ মাসে তিনি কলকাতায় এলেন দু-দুবার। তাঁর প্রথম কার্যসূচি ৬ই মার্চ শুরু হয়ে ৯ই মার্চ শেষ হলো। ডেকে পাঠালেন তিনি তাঁর পুনর্বাসন মন্ত্রী মোহন লাল সাকসেনাকে, ডেকে পাঠালেন পাকিস্তানের ভারতীয় হাই কমিশনার ডঃ সীতারাম ও ঢাকা থেকে তাঁর ডেপুটি সন্তোষ বসুকে। প্রতিবেশী রাজ্য আসাম, বিহার ও ওড়িষ্যা থেকেও প্রতিনিধিরা এলেন কলকাতায়। রাজভবনে উচ্চপর্যায়ে একটি বৈঠক বসলো।"

সরোজ চক্রবর্তী তাঁর ওই গ্রন্থের ১০৬ থেকে ১০৮ পৃষ্ঠায় এক কৌতূহল উদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সময়টা ১৯৫০-এর মার্চ মাস হবে।

মুখ্যমন্ত্রী ডা. রায় একদিন নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কিছুটা আগে বাড়ি ফিরে এলেন। তিনি লিফটে করে দোতলায় না গিয়ে সরোজবাবুর কাজের ঘরে ঢুকে তাঁকে দ্রুত অবিভক্ত বাংলার ম্যাপ-নিয়ে আসতে বললেন। ম্যাপটা আনতে কিছুটা সময় লাগল। ম্যাপ এনে দোতলায় হলঘরে টাঙিয়ে দেওয়া হল। ডা. রায় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সরোজবাবুকে বললেন কয়েকজন বিশিষ্টলোক আসবেন। তাঁদের সোজা হলঘরে নিয়ে আসতে হবে। আর ওই বিশিষ্ট লোকেরা যতক্ষণ থাকবেন, ততক্ষণ যেন কোনও ফোন ডা. রায়কে না দেওয়া হয়। নির্দেশ নিয়ে নীচে নামার সঙ্গে সঙ্গে একটি গাড়ি ঢোকার শব্দ পেলেন তিনি। সরোজবাবু দ্রুত গাড়ির কাছে যেতেই গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন ভারতের প্রধান সেনাপতি জেনারেল কারিয়াপ্পা ও ফোর্ট উইলিয়মের বাঙালি অফিসার মেজর জেনারেল এস বি এস রায়। সরোজবাবু তাঁদের উপরে নিয়ে এলেন। অবিভক্ত বাংলার ম্যাপের সামনে দাঁড়িয়ে জেনারেল কারিয়াপ্পা তাঁর হাতের ব্যাটন দিয়ে খুলনা ও যশোর জেলার অবস্থান ডা. রায়কে বুঝিয়ে দিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে

ওই তিনজন ম্যাপটির সামনে দাঁড়িয়ে ম্যাপের কতগুলি জায়গা চিহ্নিত করলেন। পরের দিনও সন্ধ্যায় জেনারেল কারিয়াপ্পা ও মেজর জেনারেল এস বি এস রায় ডা. রায়ের কাছে এলেন এবং সেদিনও খুলনা ও যশোর জেলার সীমান্ত নিয়ে তাঁরা মত বিনিময় করলেন। যাবার সময় জেনারেল কারিয়াপ্পা মেজর জেনারেল রায়ের পিঠে ব্যাটনের চাপ দিয়ে ডা. রায়কে বললেন যে এখন থেকে এই অফিসারটি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। উল্লেখযোগ্য যে পূর্ববাংলায় ১৯৫০ সালের দাঙ্গায় এ রাজ্যে উদ্বাস্তু আগমন সবচেয়ে বেশি ঘটেছিল খুলনা ও যশোরের পথ দিয়ে। অবিভক্ত বাংলার ম্যাপ নিয়ে ডা. রায়ের সঙ্গে জেনারেল কারিয়াপ্পার আলোচনা কেন হয়েছিল, এ প্রসঙ্গে সরোজবাবু তাঁর পুস্তকে কোনও উল্লেখ করেননি, তবে এ সম্পর্কে এটা অবশ্যই স্মরণ করা যেতে পারে যে ওই সময় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও পূর্ববাংলার হিন্দুদের রক্ষার জন্য ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপের দাবি তুলেছিলেন। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী নেহরু পার্লামেন্টকে এই বলে আশ্বস্ত করেছিলেন "যদি পাকিস্তান সরকার পূর্ববাংলার সংখ্যালঘুদের জীবন ধন সম্পত্তি রক্ষা করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ভারত সরকার 'অন্য পন্থা' (the other method) গ্রহণ করতে দ্বিধা করবে না।"

পূর্ববাংলার দাঙ্গা নিয়ে যখন সমগ্র উপমহাদেশে প্রবল উত্তেজনা চলছে, তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খান বরিশালের দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকা সফরের সিদ্ধান্ত নিলেন। মার্চ মাসের (১৯৫০) মাঝামাঝি সময়ে লিয়াকৎ আলি বরিশাল সফরে গেলেন। কিন্তু পাকিস্তান মন্ত্রিসভার একমাত্র হিন্দু সদস্য আইনমন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল লিয়াকৎ আলির সফরসঙ্গী হতে রাজি হলেন না। বরিশাল সহ পূর্ব বাংলার জেলাগুলিতে দাঙ্গার সময় যোগেনবাবু করাচিতে ছিলেন। ফেব্রুয়ারির শেষে ও মার্চের গোড়ায় যোগেনবাবু ঢাকায় এসে তাঁর নিজের জেলা ফরিদপুরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে বরিশালে যান। ১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বাংলার শেষ নির্বাচনে যোগেনবাবু একাধিক কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছিলেন। বরিশালেও একটি কেন্দ্রে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। ওই নির্বাচনে মুসলিম লিগের সমর্থন নিয়ে যোগেনবাবু কংগ্রেস ও উচ্চবর্ণের হিন্দু প্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রায় ধর্মযুদ্ধের জিগির তুলেছিলেন। শোনা গিয়েছিল দাঙ্গার পর বরিশাল শহরে গিয়ে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বাংলার সর্বজনশ্রদ্ধেয় কংগ্রেস নেতা সতীন সেনের পা জড়িয়ে অঝোরে কেঁদেছিলেন। বরিশাল শহরে ফজলুল হক সাহেব লিয়াকৎ আলির সঙ্গে দেখা করে পূর্ববাংলার দাঙ্গার জন্য প্রাদেশিক সরকার এবং মুসলিম লিগকে সরাসরি দায়ী করেছিলেন। শোনা যায়, ওই সময় প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলির সঙ্গে হক সাহেবের কথা কাটাকাটি হয়। অন্যদিকে লিয়াকৎ আলি খানের ঢাকা অবস্থানকালেও পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন না। লিয়াকৎ আলি করাচি ফিরে যাওয়ার পর ঢাকায় নিযুক্ত পি টি আই-র বিশেষ সংবাদদাতা উইলফ্রেড ল্যাজারাস (Wilfred Lazaras) এই উপমহাদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক প্রচণ্ড বোমা বিস্ফোরণ ঘটালেন।

(ক্রমশ)

গ্রাহকদের প্রতি আবেদন

বার্ষিক গ্রাহকচাঁদা এখনও যাঁরা দেননি, যথা শীঘ্র সম্ভব তাঁদের তা মিটিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানাই। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে চিঠি দেওয়া সম্ভব নয়, তাই গ্রাহকদের কাছে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার আবেদন জানাচ্ছি। বার্ষিক গ্রাহকচাঁদা ৭২ টাকা। বিদেশবাসী গ্রাহকদের চাঁদা US $ 12। "CHATURANGA" নামে স্থানীয় গ্রাহকরা চেক/ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠাতে পারেন।

প্রবন্ধ

অমিয়ভূষণের আখ্যানের উৎস-সন্ধানে

বিজিতকুমার দত্ত

অমিয়ভূষণ মজুমদারের জন্ম ২২.৩.১৯৯৮তে এবং সম্প্রতি তাঁর প্রয়াণ ঘটেছে ৮.৭.২০০১য়ে। অমিয়ভূষণের বিশেষ পরিচিতি 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার লেখক হিসাবেই। তাঁর অধিকাংশ বিখ্যাত গল্প এবং উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল চতুরঙ্গে। যেমন নয়নতারা, চাঁদবেনে এবং রাজনগর উপন্যাসত্রয়; অনেক অসাধারণ ছোটগল্প এবং একটি নাটক। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হল। পরবর্তী সংখ্যায় তাঁর স্মরণে আরও লেখা প্রকাশিত হবে। — সম্পাদক

অরণ্য 'অবচেতন মনের মতো। যেন করাতের কলের শান দেয়া ধার, ইলেকট্রিকের উজ্জ্বল তার, বাস ট্রাকের দ্রুতগতিতে উচ্ছ্বসিত পীচ-সড়ক, এদিক ওদিক বনের গভীরে ডুবে থাকা গ্রাম, আর তাদের ঘিরে থাকা প্রাণীদের নিঃশব্দ কখনও বা চাপা তর্জনগর্জনযুক্ত পদসঞ্চারস্পন্দিত বন — এ সব মিলে যেন একটাই মন, বন যে মনের অবচেতন অংশ। আর তা যদি হয় তবে মহিষকুড়ার মতো গ্রামগুলি অস্ফুট আবেগের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে।' মহিষকুড়ার উপকথা উপন্যাসের মুখপাতে অমিয়ভূষণের এই চেতনা নতুন কিছু নয় — তবু এই অবচেতনের প্রতি কৌতূহল এবং জিজ্ঞাসা যে অমিয়ভূষণকে উত্তেজিত করেছে, আবেগে আপ্লুত করেছে সারাজীবন সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। মোটা দাগে বলা যায় মহিষকুড়ার উপকথা লিখেছেন এই চেতনাকেই রূপ দেবার জন্য। উপন্যাসটার ফ্রেম তৈরি হয়েছে এই চেতনারই অসংখ্য টানটোনে। লক্ষ করলেই দেখা যাবে একেবারে আদিম চেতনার সঙ্গে আধুনিক চেতনার অর্ণ্টোনে যে ঢেউ উঠেছে তার উথালপাতাল তর্জন গর্জন এবং নিঃশব্দের পদসঞ্চারের স্পন্দন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত।

আমাদের মনে হয় অমিয়ভূষণ এই অবচেতনের পরীক্ষা করেছেন তাঁর উপন্যাসে ছোটগল্পে এবং প্রবন্ধে। আর কে জানে অমিয়ভূষণ চিত্রীরূপে রঙের, রেখার, ছেনির শান-দেওয়া পাথর খোদাই এ সব নিয়ে শ্রমনিষ্ঠ ভাবনায় এবং সৃজনে মগ্ন ছিলেন? কেননা, তাঁর গদ্যে বারবার উঠে এসেছে চিত্রকরের কৌশল, ভাস্করের নিপুণ হাতের ছেনির ব্যবহার কেমন করে রূপে রূপান্তরে পৌঁছে যেতে থাকে। এই যাত্রাপথ কুসুমাস্তীর্ণ নয় নানা জটিলতায় ভরপুর।

অমিয়ভূষণ এর পরই কল্পনা, দিবাস্বপ্ন, অবচেতন, সমাজ, পরিবেশ, অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন। এবং একে কিছুটা বুঝে নিতে পারলে অমিয়ভূষণের সাহিত্যভাবনা সমাজচিন্তা এবং রসচেতনার সন্ধান পেতে পারি।

অমিয়ভূষণ স্বপ্নকে নেহাত অলীক বলে উড়িয়ে দেননি। কেন না স্বপ্নে আমরা যা প্রত্যক্ষ করেছি, জেনেছি, পেয়েছি তাকেই দেখি, জ্ঞান অর্জন করি এবং প্রাপ্তির আনন্দে নেচে উঠি। আর সেই স্বপ্নই নানা ফাঁকফুকর দিয়ে কোনও একটি ক্যানভাসে আঁকা হতে থাকে। লেখাকে অনেক কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারে। 'রূপসী বাঙলা' এমনই এক স্বপ্নের বাংলা। এই স্বপ্নের দেশকেই আমরা সাহিত্য বলব? চিত্রজগৎ গ্রহণ করব? অমিয়ভূষণ বলবেন না। কেন না স্বপ্নে অসংলগ্ন হয়ে থাকে অবচেতন, শৃঙ্খলার অভাব প্রতিনিয়ত পীড়া দেয়। তারও আগে স্বপ্নের সঙ্গে সমাজের যোগসূত্রকে আবিষ্কার করতে হবে। অমিয়ভূষণ বলেন প্রকৃতির দর্পণ শিল্প ঠিকই কিন্তু সে প্রকৃতিও নিয়তদৃষ্ট বলে সাহিত্যে শিল্পে তা প্রতিফলিত হলে তা হবে ব্যর্থ, দুর্বল। লেখকরূপে অমিয়ভূষণ অবশ্যই দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করেন। অমিয়ভূষণ সম্পর্কে আমাদের এ কথা স্মরণে রাখতেই হবে। সে জন্য তিনি সমাজের প্রসঙ্গটা ভুলে যান না। কিন্তু শিল্পীরূপে অমিয়ভূষণ আরও একটি কর্মকে মনে রাখেন। অমিয়ভূষণ এই শিল্পতত্ত্বকে গুরুত্ব দেন। একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়ে অমিয়ভূষণ তাঁর অভিজ্ঞতাকে বুঝিয়ে দেন।

আগে বলে নিই অমিয়ভূষণ চিত্রীও। যদিও প্রকাশ্যে সে রচনার হদিশ এখনও প্রায় কেউ-ই জানে না। কেননা, তিনি তাঁর ছবির প্রদর্শনী কখনও করেননি। যেমন অমিয়ভূষণ দীর্ঘকাল পোস্ট অফিসে কাজ করেছেন এ কথা আমাদের জানা। কিন্তু সেখানেই কর্মচারীদের ইউনিয়নের তিনি যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সে সংবাদও স্বল্পজ্ঞাত। আর এই নেতৃত্বই তাঁকে শিখিয়েছে মানুষের প্রতি, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার ভাব। যখন তিনি সংঘবদ্ধ নেতৃত্বে উঠে আসেন তখন যেমন, তেমনই তিনি শিল্পীরূপেও কতকগুলি মানুষ-মানুষীর নেতৃত্ব দেন। সেখানে তাঁর নেতৃত্বের চেহারাটা ভিন্ন রকমের। যুক্তি আছে তর্ক আছে বিতর্কও আছে আবার এ সব নিয়েও অমিয়ভূষণ সন্তুষ্ট নন। অস্বস্তি লেগেই থাকে। এলো মেলো, শিথিল হয়ে যায় তাঁর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির চাপে মানুষ মানুষী। তখনই তিনি বুঝতে পারেন শিল্পীর আরও কিছু চাই। সে চাওয়ার

উপাদান হচ্ছে অনুভূতি বা অনুভব। যেখানে বাস্তবকে স্বীকার করে কল্পনার সীমানায় আসা যায়। কল্পনাকে অমিয়ভূষণ বিশেষ জোর দিয়েছেন।

এবারে দৃষ্টান্তটিতে মনোযোগ দিই। তার আগে বলে নিই এই দৃষ্টান্তে অভিনব কিছু নেই। সৎ, যোগ্য শিল্পী মাত্রেই এই প্রকরণের মধ্য দিয়েই তার প্রতিমাকে গড়ে তোলেন। অমিয়ভূষণ বলেন 'আমার ধারণা কল্পনা শব্দটার ধাতুতে একের অন্যতে পরিবর্তিত করার ভাব আছে। প্রকৃত যা আমার মনে, পরিবর্তিত হয়ে যে রূপ নেয়, তাই আমার কল্পনা, এবং এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটাকেও আমরা কল্পনা করা বলে থাকি।' তারপর বলেছেন 'সাহিত্যিকের কল্পনা কোনও ক্রমেই প্রত্যক্ষীভূত সমাজকে বাদ দিয়ে হয় না। অভিজ্ঞতা শুধু কল্পনাদেবীর পাদপীঠ নয়। দেবীর অবয়বও অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি, যদিও মনে রাখতে হবে অবয়ব ও প্রাণসত্তা এক নয়।' মনে পড়ছে C.M. Bowra তাঁর রোমান্টিক ইমাজিনেশন গ্রন্থে কল্পনার প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে সৃষ্টির এবং নির্মাণ কলার উৎস কল্পনা। বিজ্ঞানী সৃষ্টি করে তার ল্যাবরেটরিতে আর শিল্পী সৃষ্টি করেন কল্পনার বীক্ষণাগারে। অমিয়ভূষণ এই বীক্ষণাগারটিকে ভোলেন না, ভোলা সম্ভবও নয়। তিনি বলেছেন তিনি রোমান্টিক। সে জন্য তিনি চাঁদবেনের নৌকা করে ভূপরিক্রমা করেন, তুলে আনেন সৃষ্টির রহস্য। ইতিহাস আর তখন অতীত থাকে না, অতীত বর্তমানে এসে উপস্থিত। অতীতও হয়ে ওঠে আধুনিক — জীবনচাঞ্চল্যে সুন্দর। এই জীবনের কোনও সীমা আছে? অথবা, জীবনের অন্ত? আমরা জানি তার অন্ত নাই গো।

যে দৃষ্টান্তের কথা বলছিলাম তাতে আছে শিল্পী যখন আঠা আর জিঙ্ক অক্সাইড দিয়ে ছবির জমি তৈরি করলেন এবং রোদে ক্যানভাসটি শুকোতে দিলেন, বিকেলে এসে দেখেন সে ছবিতে কালো কালো কয়েকটি দাগ। পরে বুঝলেন ছবিতে পড়েছে বিকেলের ছায়া। এই দাগ আসলে গ্রিলের ছায়া। কিন্তু এই ছায়া শিল্পীকে ভাবিয়ে তুলল। কোথাও কিছু বুঝতে পারছেন না যখন তখন তিনি অনুভূতিতে ডুব দিলেন। ধরে রাখলেন সে ছায়া কাগজে। একটু ইরেজারের ঘষাতে দুটি মানুষের রূপ যেন উঠে এল। মানুষ-মানুষী। একটিতে ভ্যানডাইক ব্রাউন, অপরটিতে কালচে রঙ ফুটে উঠেছে যেন। তারপর চলল ওই কাগজে নির্মাণ আর সৃষ্টির দ্বৈতভূমিকা। এল প্রস্ফুটিত গ্রান্ডিফ্লোরা। এল প্রায় ল্যাভেন্ডার রঙ-এর এক থোকা ফকসগ্লাব। নানা রঙের দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন অমিয়ভূষণ। শিল্পীর অবচেতন উঠে এসেছে উপরে। তার ঢেউকে বাধা দেবে কে? অমিয়ভূষণই এখানে চিত্রী। তাঁর ভাষায় 'এল এক ভার্মিলিয়ন অ্যামারন্থ, এল শাদা নাগকেশরের মতো এক কাল্পনিক ফুলের গুচ্ছ।' নরনারী দুটি যেন টেবিলে ব্রেকফাস্টে বসতে চায়। 'টেবিলের ঢাকনায় সকালের আলো কোবাল্ট ব্লু ও আলট্রামেরিনে ভেঙে সমুদ্রের ইমেজ আনে।' এবারে ক্যানভাসে তুলে নেবেন কল্পনাটিকে। গ্রিলের ছবিকে রূপান্তরিত করলেন অয়েলে। 'শার্সি ছিল জল রঙে, ফ্রেম ছিল না জানলায় অইলে, সিয়েনা, ক্যাডমিয়াম হলুদ, গেরুয়া হলুদে ফ্রেম রচিত হল জানলার, ভ্যানডাইক ব্রাউন, সিয়েনা, ক্যাডমিয়াম হলুদ, গেরুয়া হলুদ, ক্যাডমিয়াম হলুদ, ক্রোম হলুদ, কমলা, ভার্মিলিয়ন পিঙ্ক, ভায়োলেট শাদায় সাতদিনের মাথায় সামার বসন্তের ক্যানভাস শেষ হল। মনে মনে নাম দিলুম "আজি দক্ষিণ দুয়ার খোলা" উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হল। কিন্তু অমিয়ভূষণকে জানতে হলে ওই রঙে পাগল-হওয়া মানুষটিকে চিনতে হবে, এই বসন্তের ফুরফুরে পরিবেশে আনন্দময় মানুষটিকে চিনতে হবে। আর জানতে হবে সঙ্গীতপ্রিয় মানুষটিকে, কবিকেও। তিনি তো বলেইছেন রবীন্দ্রনাথের গানের সুরে সুরে, কথায় কথায় কত রহস্য আছে। আচমকা কোনও কোনও দিন তাকে ধরা যায়। এখানেও কী অমিয়ভূষণ অবচেতন মনের কথা বলেন? অথবা স্বপ্নের? ছবিটির পরে একটি ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়েছেন অমিয়ভূষণ। বলেছেন 'স্বপ্নের কাছে আমি কৃতজ্ঞ'। স্বপ্নে স্বপ্নে অমিয়ভূষণ আতুর। তাঁর গদ্যে স্বপ্নের ভাষা ফুটে ওঠে। যে সামান্য আলোচনা অমিয়ভূষণের গদ্য নিয়ে হয়েছে তাতে চিত্রীর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু স্বপ্নের প্রসঙ্গটি বাদ পড়ে গেছে। বাদ পড়লে উপন্যাসে গল্পে ছবি লেখার প্রসঙ্গটি থাকে না। গড় শ্রীখণ্ডই বলুন অথবা রাজনগর অথবা মহিষকুড়ার উপকথা প্রেম, অপ্রেম, বিষ এবং অমৃত সবই তো আসে এই স্বপ্নের পথ ধরে। অবশ্যই অবয়ব থাকে ছবিতে লেখাতে কিন্তু প্রাণসত্তা ওই স্বপ্নের দরজা দিয়েই আসে।

এখানে, অমিয়ভূষণের অভিমান, অহংকার এবং স্বাতন্ত্র্যের কথা একটু বলি। 'গড় শ্রীখণ্ড' উপন্যাসে পাই সুমিতির আত্মজিজ্ঞাসা 'সুমিতি ভাবলো, গঁগ্যার তুলনায় কি মনসার নিজের জীবনও বোঝা যায়। সে মেয়েদের শরীর আর মনের বিপ্লবের কথা বলেছিলো বটে। শহর থেকে দূরে যাকে অন্ধকার বলে মনে হয় তেমন এক গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবার কি সে সৃষ্টিশীল কিছু করেছে গঁগ্যার মতো। তা'লে তো তার জীবনটাকেই কাব্য বলতে হয়, যে কাব্য দুঃখ, সুখ, ভালোবাসা, অপ্রেমের দ্বন্দ্বে সংঘাতে তারই রচনা।' অমিয়ভূষণ এখানে নিজেকেই প্রক্ষেপ করেছেন, কোনও সন্দেহ নেই। তিনিও তো মধ্যবিত্ত এবং গঁগ্যার মতোই নিজের গোটা বাংলাদেশ বিশেষ করে কলকাতার নাগরিকত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু তার গর্ব তিনি সৃষ্টিশীল। উপন্যাসের দর্শন বোঝাতে গিয়ে অমিয়ভূষণ প্রশ্ন করেছিলেন, কার দর্শন? লেখকের না সৃষ্ট চরিত্রের? আমরা বলি এ প্রশ্নের উত্তর এক দিকে যেমন দু'য়েরই, অন্য দিকে কারও নয়। অতীত থেকে এই মুহূর্তের, জাগর থেকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত উপন্যাস। অন্তত অমিয়ভূষণের কাছে। সে জন্য বিচ্ছিন্ন অমিয়ভূষণ যতই বাস্তু আঁকড়ে থাকুন না, স্মৃতির দ্বীপে

লবণাম্বু জলরাশি ঘেরাটোপে বাস করুন না জগৎ-কে আঁকড়ে ধরেছেন অমিয়ভূষণ আর তুলে এনেছেন যেমন করে ঝিনুকের মধ্যে বালি ঢুকে মুক্তো নির্মাণ হয়, সৃষ্টি হয় এক পরমাশ্চর্য প্রতিমা।

২

বারবার কতকগুলি শব্দ অমিয়ভূষণ তাঁর গদ্যে ভাসিয়ে দেন। সাহিত্যসৃষ্টিকে তিনি দিবাস্বপ্ন বলেছেন। স্বপ্নের কথা আগেই বলেছি। সাহিত্য কী? অমিয়ভূষণের মতে এক ধরনের ক্যাথারসিস। এই অ্যারিস্টটলীয় পরিভাষাকেই তিনি গ্রহণ করেন। অমিয়ভূষণের মেধা ও মননের কথা বলিনি। বলা দরকার। ইংরেজি সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন ওই মানুষটি এক দিকে যেমন আদিবাসী জীবনের মননে অতি সহজে চলে যেতে পারেন, তেমনিই তাঁর অনায়াস যাতায়াত গ্রিক সাহিত্যে, রুশ সাহিত্যে। গ্রিক সাহিত্যের মহিমাতে তিনি মুগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, দান্তের কথা বলতে ভালবাসেন। বিশ্বের জ্ঞান আহরণে অমিয়ভূষণের ক্লান্তি ছিল না। প্রবন্ধে তিনি তাঁর বহুপঠনের সাক্ষ্য দিয়েছেন। গ্রিক সাহিত্য অমিয়ভূষণকে অনুপ্রাণিতও করেছে। সে যাক। এটা এমন কিছু নয়। আমরা বলছিলাম ক্যাথারসিস যেমন চিত্তের আলোড়ন উত্তেজনাকে প্রশমিত করে এক পরম শান্তিতে চিত্তকে স্থিত করে তেমনই সাহিত্যমাত্রেরই সেই ফল লাভ। জীবনের সব ক্ষেত্রে যেন ট্রমা? অমিয়ভূষণ বলেন, 'কেন ট্রমা, তা কি জীবনে প্রায় অবশ্যম্ভাবী? অনুমান, যে রকমই হয়ে থাকে, জন্ম থেকে ট্রমা, মায়ের স্তন্যচ্যুত হওয়া এক ট্রমা। গোপন পাপবোধ ট্রমা, শরীর ও মনে ধর্ষিত হওয়ার প্রতিকারহীন যন্ত্রণাও ট্রমা সৃষ্টি করে। এই ট্রমাগুলি থেকে অন্তত পালাতে হয়। দিবাস্বপ্ন তৈরি করে দেখতে হয় মাতৃজঠরের মতো কোনও আনন্দলোকে পৌঁছানো যায় কিনা।' এই দিবাস্বপ্ন অমিয়ভূষণের কাছে এলোমেলো বটে কিন্তু ওই এলোমেলোত্বের সঙ্গে সূত্র যোগ করে তা হয়ে ওঠে মহৎ সৃষ্টি।

অমিয়ভূষণ মনঃসমীক্ষণ বিদ্যা বিধ্যাবুদ্ধি দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছেন। এমনকী ফ্রয়েড ইয়ুং তাঁর অধীত বিদ্যা। তাঁদেরই টারমিনোলজি অমিয়ভূষণ গদ্যে ব্যবহার করেছেন তাঁর বক্তব্য বোঝানোর জন্য। এই বিষয়টি নির্দেশক হয়ে ওঠে অমিয়ভূষণের আলোচনায়। দিবাস্বপ্ন স্মৃতির অন্তর্গত। এই স্মৃতির বিশ্লেষণ করেছেন অমিয়ভূষণ। এই স্মৃতির ব্যাপ্তি শরীর জুড়ে, মন জুড়ে। এই স্মৃতির আদি-অন্ত খুঁজে বার করতে চান অমিয়ভূষণ। অমিয়ভূষণ বলেন 'গর্ভের ভ্রূণের মূক, অন্ধবৎ, গতিহীন, ভরহীন অনুভূতির স্মৃতি থেকে প্রথম স্মৃতির শুরু হয়।' একটু পরে অমিয়ভূষণ বলেন 'অনুমান করি এই চাপড়ানি (শিশুকে ঘুমপাড়াবার সময়) সেই অবস্থায় (মাতৃজঠরের) স্মৃতিতে নিয়ে যায় যখন শিশু ভরশূন্য অবস্থায় এক কোমল প্রায়াক্ষকারে অনায়াসলব্ধ পুষ্টির তৃপ্তিতে যোগস্থিতের মতো ভ্রূণরূপে জননীর রক্তপ্রবাহের ছন্দকে আত্মস্থ করেছিল।' লক্ষ করলে বোঝা যাবে অমিয়ভূষণের ভাষা আবেগদীপ্ত হয়ে উঠছে, তিনি নিজেই যেন মাতৃজঠরের সেই ছন্দস্পন্দনে ডুবে আছেন। অমিয়ভূষণের বলার কথায় আবেগের স্থান বিশিষ্ট রূপ নিয়েছে। সে জন্যই তিনি বলেন 'স্মৃতি যে আবেগেরও থাকে তা স্বতঃসিদ্ধ প্রায়।' এই আবেগই কল্পনা। সৃষ্টির দূতী যেন। সেই জন্যই তিনি 'মাতৃজঠরের মতো কোনও আনন্দলোকে'র কথা বলেন। এই মাতৃজঠরকে আমরা ভুলতে পারি না। অতএব মহিষকুড়া গ্রামের সেই ভূমিকম্পের মতো জঙ্গলের ভাষা লাফিয়ে ওঠে 'আঁআঁড়'। অতএব 'চাঁদ বেনে'তে বার বার আমরা সেই পিছনের স্মৃতিকে লালন করি। অতএব 'গড় শ্রীখণ্ডে' ইতিহাসের নিকট অতীত সুদূর অতীত আলোড়িত হতে থাকে। অবচেতনে মহিষকুড়ার মানুষের স্মৃতি এ কালের মহিষের মতো ট্রাকটাকে চিনিয়ে দেয়। আসফাক ফিরে যায় সেই যাযাবর জীবনে যেখানে কমরুন আর সে পাথরে পাথর ঘষে আগুন তৈরি করে, মাছ পুড়িয়ে খায়, আর পরম আগ্রহে কমরুনের স্তনের আহবানে সে সাড়া দেয়।

অমিয়ভূষণ সংস্কৃতির প্রসঙ্গ টেনে আনেন এই বলে 'সংস্কৃতিবানত্ব যে এক চিরস্থায়ী দ্বন্দ্বের নিরসনে শান্ত অবস্থা তা আমাদের মনে থাকে না। সে দ্বন্দ্ব অস্মিত্ব ও গুরু অস্মিত্বর (super ego), যার নিরসনে সংস্কৃতি। ফলত অস্মিত্ব যখন গুরু, অস্মিত্বর সত্য মেনে নিয়েছে। ফলত লিবিডো (মনসা?) যখন আর বিষময় নয়।' অস্মিত্বর কাজ হচ্ছে অচেতনে যা আছে তাকে অবদমিত রাখাই তার শ্রেয় মনে হয়। এই অবদমিত রাখা মানেই মানুষের ইচ্ছার কাছে সত্যের পরাজয়। অচেতনকে পরীক্ষা বিশ্লেষণ করতে হবে। যারা এই বিশ্লেষণে অবতীর্ণ হন তারা মানুষকে দেখেন সত্যের আলোকে। সেই জন্যই অমিয়ভূষণ বলেন উপন্যাস দুই শ্রেণীর, এক শ্রেণী স্মৃতিভিত্তিক, দ্বিতীয় শ্রেণীর শিকড় অচেতনে ছুঁয়ে থাকে। এই যে ফ্রয়েডীয় এবং ইয়ুং-এর অনুসরণ (ইদ্, ইগো, সুপার ইগো) এ অমিয়ভূষণের রচনায় তুষের আগুনের মতো জ্বলছে। ছাই সরালেই আগুন বেরিয়ে আসবে। অমিয়ভূষণ দিবাস্বপ্নকে ভিশন (vision) বলেছেন। এই ভিশন একদিক থেকে স্মৃতিচেতনার অনুভব। দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসে শিকড় অচেতনে ছুঁয়ে থাকে, অচেতনকে ভয় না করে মুখোমুখে ধিক্কার দিয়ে অমিয়ভূষণ স্মৃতির নগ্ন রূপকে ধরে থাকেন। এই স্মৃতির পশ্চাৎ টানে জাগতে থাকে মিথ। যে মিথের কথা বার বার লেখকের প্রবন্ধে গল্পে উপন্যাসে আসে।

আগে ইদের কথা বলে নিই। অমিয়ভূষণ ইদের সংজ্ঞা নিরূপণে নতুন কথা কিছু বলেননি। চেম্বারস ডিকশনারির Id এর অর্থ এইরকম in psycoanalytic theory, one of the three parts of the personality, being the unconcious mass of primitive emerges from which come instincts for the gratification of basic desires for food sex etc.

and for the avoidance of pain, modified by the ego and the superego. প্রায় অনুরূপ অর্থে গ্রহণ করলেও primitive বস্তুটি অমিয়ভূষণ গুরুত্ব দেননি। যদিও তাঁর লেখায় এর আভাস আছে। আগে যে অস্মিত্ব এবং গুরু অস্মিত্ব দুটি বাংলা শব্দ নির্বাচন করেছেন তা, বলা বাহুল্য, ego এবং superego.

অমিয়ভূষণ ওই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে মানুষের ব্যক্তিত্বের চেহারাটা ওই তিনের সমবায়ে গঠিত। এখন তা যদি হয় তবে মানুষের চরিত্রের (ব্যক্তিত্বের) সন্ধান করতে হবে ওই ত্রয়ীর অবস্থানের উপর। এমনকী সংস্কৃতি বলতেও অমিয়ভূষণ শব্দটির নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন মনের উৎকর্ষ যা ego এবং superego-র দ্বারা সম্পাদিত হয়। আমাদের ভাল লাগে এই জেনে যে অমিয়ভূষণ ইদ-কে স্বাভাবিক, অনিবার্য সৃষ্টি বলে মেনে নিয়েছেন। তিনি 'বায়াস' (bias) নন। কেবল ইদ সম্বন্ধে আমাদের ভুল ধারণা গুলিকে ভেঙে দিতে চেয়েছেন। আমাদের প্রতিদিনকার লালিত সংস্কারের মূলে আঘাত করেছেন। উদাহরণ দিই। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের গোড়ায় ঈশ শিব আছে। শিব তো লিঙ্গ-এর সঙ্গে অন্বিত। অমিয়ভূষণ বলেন 'কালিদাস লিঙ্গ উপাসক শৈব ছিলেন কি না, তা নিয়ে তর্ক থাকতে পারে। কিন্তু এই নাটকটিতে শিবলিঙ্গও কি সিম্বলরূপে উপস্থিত? যে শিবলিঙ্গ আদিতে শস্য, নবজন্ম, জনন, বসন্ত ইত্যাদির প্রতীক এবং পরিণতিতে যা জীবনসরণের অধীশ্বর। সমস্ত নাটকটায় কি লোকায়ত প্রজনন প্রতীকোপাসনা থেকে ব্রাহ্মণ্য জ্যোতির্লিঙ্গ উপাসনার সিম্বলও থাকতে পারে?' এই ভাবে শকুন্তলা নাটকের বিচারকর্মে অগ্রসর হওয়া সঙ্গত অসঙ্গত কি না সে প্রশ্ন তুলব না। তবে অমিয়ভূষণ সে মিথের প্রসঙ্গেই চলে যান। যে মিথ কল্পনা (?) ইদের ভাবনার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এই লোকায়ত ভাবনাই যখন ব্রাহ্মণ্য জ্যোতির্লিঙ্গে পৌঁছে যায় তা কি ego superego দ্বারা সংস্কৃত ইদের উদাহরণ। এই ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এ প্রবন্ধে নেই। কিন্তু সংবিত্তি অর্থাৎ যোগাযোগ (communication) সমস্যার সঙ্গে জড়িত এই রকম নূতন অর্থ করার। কে জানে অমিয়ভূষণ দর্শন-পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে সৃষ্টিকে দেখতে চেয়ে এই মিথের প্রসঙ্গে পৌঁছে যান কি না। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলার বিচার করেছেন, সে বিচারের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন অমিয়ভূষণ, কিন্তু মিথের ব্যাখ্যা তাঁর নিজের।

একটি সাক্ষাৎকারে (উত্তরাধিকার, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, শারদ ১৯৯৪) অমিয়ভূষণ জানান মনসার মিথের প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণের কথা। তিনি মনে করেন মনসা এখনও সজীব, অন্তত কুচবিহারে। মনসা মিথ নিয়ে একটি চমৎকার প্রবন্ধও লিখেছেন অমিয়ভূষণ। সেখানে বলেছেন 'মনঃ-তে স্বার্থে টাপ করে যে মনসা তা তো মনই যেন। তা কি প্রাকচৈতন্য মন? শিব যদি পরম মানস হয়, যেখানে জ্ঞান ও জ্ঞাতা এক, মনসাও কি তার অংশ; সে জন্য শিবাত্মজা? পরবর্তীকালে যাকে লিবিদো বলা হবে, সেও তো মনেরই অংশ (Libido-Vital urge, either in general or as of sexual origin, sexual impulse, C.D)। সে তো বিষের আধার অথচ সে না থাকলে কিছুই কি ঘটে? সে জন্যই সজ্ঞান মনের সামনে কি তার প্রতিমা বসিয়ে বলা, হে বিষময়ী, তুমি জগৎপালিনী, বিষহারিণী হও? প্রমাণ। তা নেই।' সাক্ষাৎকারেও বলেছেন মনসাই লিবিডো, মনসা সেই দেবী। কুলকুণ্ডলিনী সর্পমুখী দেবী। এই লিবিডো মনের অংশ। যেখানে বিষ, পাপ, কাম, ক্রোধ, হিংসা জড়িয়ে আছে। যুবক যুবতীর মধ্যে এর অধিষ্ঠান। এ না থাকলে, এই vital energy র অভাবে পূর্ণ মানুষ হয় না। তার দুর্বার টানকে মানুষ এড়িয়ে যাবে কী করে? যিনি বিষময়ী তিনিই বিষহারিণী। অবশ্য বিষমুক্ত বিষহারিণীতে রূপান্তর একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ঘটে, ঘটে যায়। এই দেবীকেই অমিয়ভূষণ মানেন, জানেন, তার চৈতন্যে জাগ্রত হয়ে ব্যক্তিতে অস্থির করে তোলে। একেই তিনি বলেছেন, মনঃসমীক্ষণের ভাষায়, collective unconcious. ইনিই বাঙালির পূজ্য। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এঁর আরাধনা করেন। অমিয়ভূষণের আরাধ্যা দেবী। এই মনসাই পদ্মা। মহাদেব পদ্মবনেই মনসার সঙ্গে খেলা করেছেন, কেলিও করেছেন। অমিয়ভূষণ সাক্ষাৎপ্রার্থীকে বলেছেন, 'দেখবে "গড় শ্রীখণ্ড" প্রথমেই আরম্ভ হয়েছে "দুর্ধর্ষা গণগামিনী গঙ্গা", বলে। এই পদ্মা-পদ্মিনী বাংলাদেশের প্রাণ। সেই পদ্মিনীই মনসা।' তাহলে 'গড় শ্রীখণ্ড'উপন্যাসের প্রোটাগনিস্ট কে? বোধ করি পদ্মা, গঙ্গা থেকে যে পৃথক হয়ে অধুনা বাংলাদেশকেউর্বর করে তুলছে, নড়ে চড়ে বসলে কখনও সে হয়ে ওঠে কীর্তিনাশা। অমিয়ভূষণকে চেনবার জন্য, তাঁকে সম্পূর্ণ পেতে হলে নীচের উদ্ধৃতিটি অবশ্যই বুঝতে হবে। একটু দীর্ঘ হলেও আমরা সে অংশটি ('সাক্ষাৎকার' অনিন্দ্য সৌরভ, উত্তরাধিকার) উদ্ধার করছি। 'পদ্মা বাঙালীর জিনিয়াসের সিম্বল। জিনিয়াস বলতে প্রতিভা নয়। জিনিয়াস বলতে জাতির গভীরতম সত্তা — তার সিম্বল পদ্মা। পদ্মা নেই তো বাঙালী নেই। পদ্মা যেখানে, সেখানে পদ্মা দেবীও আছে। পদ্মা মানে মনসা, সে আছে। কাজেই বাঙালীর কাব্য যদি লিখতে হয়, যদি বাঙালীর মারামারি, হিন্দু মুসলমানের মারামারি, দেশভাগ থেকে অন্য কোথাও গভীরে যেতে হয়...এক রকম ছিল, 'গড় শ্রীখণ্ডে' আছে, এ পারে মুসলমান, ওপারে হিন্দু। মানে যেখানে বাংলাদেশ, ওখানে হিন্দু, এখানে মুসলমান। এক আধ বছরে নয়, দেড়শ' বছর ছিল। তেমনি এখন এ পারে হিন্দু ওপারে মুসলমান। আমি সেই গভীরে নেমেছি যেখানে তোমরা "সেকুলাররা" পৌঁছোয় না। যেখানে হিন্দু-মুসলমান এক। সকলে মনসা পূজা করে।' অমিয়ভূষণ যখন পাকশী অঞ্চলে ছিলেন তখন পদ্মাতেই বাস

করতেন। প্রৌঢ়ত্বে এসে অমিয়ভূষণ বলেন পদ্মা বা মনসা পূজার সেই গভীরে নেমে বুঝতে পারেন বাঙালি এখানেই মিথ তৈরি করে। সেখানে একটা জাতি মিথ তৈরি করে। এখানেই তো জাতির শিকড়। এই শিকড়ের সন্ধানে অমিয়ভূষণের উপন্যাস বিস্তৃত হয়। আমরা একটু অস্বস্তিতে পড়ি যখন অমিয়ভূষণ পদ্মার কথা বলতে গিয়ে আবেগে আত্মবিস্মৃত হন। রবীন্দ্রনাথ ও পদ্মা এবং পদ্মা ও রবীন্দ্রনাথ — এই গভীরতা এবং গুরুত্ব তিনি যেন মানতেই চান না। গঙ্গাকেও তিনি পদ্মার তুলনায় যেন বুঝতে চান না। চাঁদবেনে-তে চাঁদ নামটি হয়ত নেই কিন্তু সেই মনসা মিথই তাড়িত করছে, আকাঙ্ক্ষাকে স্বর্গমুখী করে দিচ্ছে, ধনের লিপ্সাই এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখন আমরা সবাই উদ্বাস্তু, অমিয়ভূষণের ভাষায় কালচার উদ্বাস্তু। এই কালচার কী? ফিরে আসি অমিয়ভূষণের কালচারের স্বরূপ নির্ধারণ ব্যাপারে। অমিয়ভূষণ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ধারণ করেছেন। তারপর বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছেন। লেখক নেতি নেতি করে এগিয়ে গিয়েছেন। দেশে দেশে সংস্কৃতির ভিন্নতা, ধর্মে ধর্মে ভিন্নতা, ভাষায় ভাষায় পার্থক্য, ভৌগোলিক পরিবেশে ভিন্নতা যাকে সংস্কৃতি বলা হয়ে থাকে তার কোনও সাধারণ রূপ খুঁজে পাওয়াই মুশকিল।

অমিয়ভূষণ আবার মন-স্মৃতিকে টেনে এনেছেন। ইদ, লিবিডো, ইগো, সুপারইগো এ সব প্রসঙ্গও আছে। ইদ অপরিবর্তনীয়। সুপারইগো যা আপাতদৃষ্টিতে লুপ্তপ্রায় আদেশ নির্দেশ-নিষেধের স্মৃতি। সুপারইগোর উৎকর্ষ ঘটানো সম্ভব। কিন্তু তা আমাদের কাম্য নয়। ওই উৎকর্ষের যদি পরিবর্তন ঘটানোও যেত তা হলে ব্যক্তিত্বের অপনোদন হত। ইগোর উৎকর্ষ ঘটা সম্ভব তা ঘটতেও পারে।

ইগোর কোন অংশকে সংস্কৃতি বলা যাবে? অমিয়ভূষণের ব্যাখ্যা : 'ইগো হয় ব্যক্তিত্বের সেই সচেতন অংশ যা বাস্তবের সংস্পর্শে ইদের বিকার (সংস্কৃত ভাষার অর্থে) এবং যা ইদ বহির্জগৎ এবং সুপারইগোর মধ্যে মধ্যস্থতা করে।' ইগোর দুটি বৈশিষ্ট্য — এক ইদবিকার, দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য মধ্যস্থতা করা অথবা সামঞ্জস্য বিধান করা। সক্রিয় ইদের সাহায্যে কোনও সুন্দরীকে দেখে কামকম্পন ঘটলে তাকে শান্ত অবস্থায় অবদমিত করা যায়। হয়ত একেই উৎকর্ষ বলা যায়। 'আমরা জানি, বিচারশীলতা, এক; যুক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান ইত্যাদি যত শক্তিশালী হোক তৎক্ষণাৎ আবেগকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, যদি না আবেগ নিয়ন্ত্রিত হতে অভ্যস্ত হয়। নিয়ন্ত্রণ অভ্যস্ততার সহতে এবং পরিবর্তিত আবেগের প্রস্থানকে আমরা সম্ভবত সংস্কৃতি বলতে পারি।

অমিয়ভূষণের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ বিদ্যাবুদ্ধির একটা পরিমাপ করা যায়। এবং তাঁর শিল্পী সত্তার ঝোঁক বা প্রবণতা, রুচি অথবা বিশ্বাসের পরিমাপ করা যায়। অমিয়ভূষণের যে মানুষ-মানুষীর পরিচয় আমরা পাই তারা সংস্কৃতি নিয়ে ভাবে কি না জানি না কিন্তু ইদ, লিবিডো, সুপারইগো ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আবেগ নিয়ন্ত্রিত হয়ে আমাদের কাছে ধরা দেয়।

আগে ট্রমা থেকে মুক্তির কথা বলা হয়েছে। এই মুক্তির জন্য দিবাস্বপ্ন দেখেন লেখক। কাম ক্রোধ হিংসা থেকে মুক্তির জন্য পালিয়ে তিনি আসেন শিল্পের আকাশে নদীতে — যে নদী বহে চলে দূরে, অনন্তে। দিবাস্বপ্নকে তিনি বলেন সৃজনকর্ম। এই স্বপ্ন কতকগুলি মানুষকে নিয়ে, অনুষঙ্গ হিসাবে আসে ঘটনা, পরিবেশ, চিত্র, সুর এবং মনন এবং আবেগজাত গঠনচিত্র। তাঁর লেখা সেই সুস্থির প্রস্থানে অবয়বী এবং প্রাণসত্তায় চঞ্চল হয়ে ওঠে।

এক এক সময় অমিয়ভূষণ এই দিবাস্বপ্নকে এমন গুরুত্ব দেন মনে হয় যেন তিনি তার সৃষ্টিকে ভারতীয় আলঙ্কারিকদের ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর থেকে আলাদা করে দেখতে চান। ব্রহ্মচিন্তায় জগৎ নেই, জীবন নেই, সংসার নেই। তাই কি? অন্তত অমিয়ভূষণ তাই মনে করেন। সেই জন্য যোগীর এবং কবির হয়ত প্রবেশ একই কিন্তু প্রস্থান দুই ভিন্ন ক্ষেত্রে। সাহিত্যের সৃষ্টি ব্রহ্মস্বাদ নিশ্চয়ই কিন্তু ব্রহ্মের মতো, ব্রহ্ম সেখানে থাকতেও পারেন নাও থাকতে পারেন। কিন্তু এই স্বাদের জীবন আছে যাকে পাওয়া যায় ট্রমা থেকে সরে গিয়ে শিল্পীর নিজস্ব ক্ষেত্রে। রস সেখানে ছোট ছোট ঢেউ তুলে এক প্রগাঢ় শান্তিতে বিরাজ করে। কখনও কখনও সেই রস বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বের কথা। সব বৃত্তির সামঞ্জস্যের জন্য অনুশীলনের প্রয়োজন। ওই অনুশীলন তত্ত্বেরই একটা ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন অমিয়ভূষণ তাঁর সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধানের ক্ষেত্রে। শরৎচন্দ্রের এক রমণীরত্নের সন্ধানে অমিয়ভূষণ নিপুণ বিশ্লেষণে, তাঁর নিজের সাহিত্যমতের সমর্থন খুঁজেছেন। স্বপ্ন, ইদ, লিবিডো, সুপার ইগো সব প্রসঙ্গগুলিই ঘুরে ফিরে এসেছে ওই প্রবন্ধে। ওই প্রবন্ধ শেষ করেছেন, একটি অনুমানকে পাঠকের চিত্তে নিক্ষেপ করেছেন। পারল, চন্দ্রমুখী, মাধবী কিরণময়ী, সাবিত্রী, অচলা, কমলের বিশ্লেষণে তিনি যেমন দেখেন নায়কের বা লেখকের অন্তরতর পুরুষের সৃজনক্রিয়া তেমনই দেবদাস, সুরেন্দ্র, সুরেশ, ওয়াবাবু, উপীন, শ্রীকান্ত চরিত্রগুলির বিশ্লেষণে খুঁজে পান পুরুষের আগ্রহ, লিপ্সা, স্বপ্ন, প্রেম, প্রেমদাত্রীর উপেক্ষা এবং স্নেহ, জায়া-জননীর মমত্ব ইত্যাদি। সেই রমণী রত্নের সন্ধান প্রায় কলম্বাসের 'ভারত' আবিষ্কারের মতোই বিস্ময়কর। সার অনুমানটি কি? অমিয়ভূষণের ধারণা নিশ্চয়ই কোনও বাস্তব নারীর প্রেরোচনা এর মূলে ছিল? এই ভাবেই তাঁর বিচার প্রচলিত বিশ্লেষণ থেকে সরে যায়। সমালোচনার নতুন ফর্ম আমরা এখানে পেয়ে যাই। কিন্তু এখনও আমাদের মনে হয় ফ্রয়েড আর মিথ তত্ত্ব বেশি ভাবিয়েছে অমিয়ভূষণকে। মিথের সন্ধানে সভ্যতার উষালগ্নে ফিরে যান অমিয়ভূষণ। যাযাবর জীবনে পৌঁছে তিনি এ কাল সে কালকে একই সূত্রে বেঁধে দেন। এক দিকে জাফরুল্লার মহিষের মতো ট্রাক, অন্যদিকে কন্য মহিষের আঁ-আঁ-ড় বুকভাঙা চিৎকার। জঙ্গল হারিয়ে গেছে। এখন জঙ্গল জমি একাকার। জঙ্গলও নিজের সত্তায় নেই যদিও তার মন আছে। এই মনের শিল্পী অমিয়ভূষণ।

প্রবন্ধ

সুধীন্দ্রনাথের গদ্যশৈলী ও সাহিত্যভাবনা

অর্পণ মিত্র

দুরূহের সাধনা

সুধীন্দ্রীয় গদ্যের মর্মোদ্ধার করতে গিয়ে হোঁচট খাননি, এমব পাঠক নিতান্তই দুর্লভ। ফলে এটা বাঙালি পাঠকের কাছে স্বতঃসিদ্ধ যে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গদ্য অনায়াস নয়। তাঁর গদ্য ভঙ্গিমার দুরূহ বলয় ভেদ করে বক্তব্যের মর্মে পৌঁছতে পাঠককে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করতে হয়। সেই শ্রম অবশ্য নিষ্ফলা নয়; পাঠকবিশেষে কেউ হয় মুগ্ধ কেউ বা বিভ্রান্ত। গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্যে সুধীন্দ্রনাথ একক। তাঁর প্রদর্শিত ঘরানায় বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য নতুন কোনও মান স্পর্শ করলেও করতে পারত, কিন্তু কার্যত কেবলই হয়েছে তাঁর গদ্যরীতির গুচ্ছ গুচ্ছ অক্ষম অনুকরণ।

কবিতার মতোই সুধীন্দ্রনাথের গদ্য লেখাও সংখ্যায় গুরুভার নয়। অযথা বিস্তার তাঁর প্রতিভার লক্ষণ নয়; এক ধরনের গাঢ়নিবদ্ধ শৈল্পিক সংহতিই তিনি খুঁজেছেন তাঁর লেখায়। নতুন লেখার চাইতেও সুধীন্দ্রনাথের কাছে বেশি জরুরি ছিল পুরনো লেখার অবিরাম পরিমার্জন। এও তাঁর অভীষ্টের ইঙ্গিত।

গদ্য রচনার ক্ষেত্র হিসাবে প্রবন্ধসাহিত্য বেছে নেওয়াটা ছিল তাঁর মানসিকতার সঙ্গে মানানসই। কোনও গল্প বা নাটক তিনি লিখেছেন বলে শুনিনি, কবিতা, প্রবন্ধ ও আত্মজীবনীর ভগ্নাংশ (যা তিনি লেখেন ইংরেজিতে) ছাড়া একটি অসমাপ্ত উপন্যাসের হদিশ পাওয়া গেছে। সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ গ্রন্থের সংখ্যা মাত্র দুটি। 'স্বগত', 'কুলায় ও কালপুরুষ' প্রবন্ধ সংকলন দুটির বাইরেও রয়ে গেছে বেশ কিছু প্রবন্ধ ও প্রবন্ধপ্রতিম রচনা।[১] তাও সংখ্যায় বেশি নয়। এক দিকে এই মিতসংখ্যক রচনাকর্ম, অন্য দিকে নিত্য ঘষামাজা : সুধীন্দ্রনাথের দুরূহতা বুঝতে গেলে এই তথ্য দুটি খেয়াল রাখা জরুরি।

অন্য যে কোনও ভাষাশিল্পীর মতোই, সুধীন্দ্রনাথের গদ্য প্রকরণের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে তাঁর শব্দ চয়ন, শব্দ প্রয়োগ ও বাক্য গঠনের আঙ্গিকে। লোকায়ত শব্দকে খুব বেশি প্রশ্রয় দেননি সুধীন্দ্রনাথ, তাঁর ঝোঁক ছিল সংস্কৃত তথা তৎসম শব্দের প্রতি। শব্দ নির্বাচন বিশেষ করে তৎসম শব্দের নিখুঁত নির্বাচন ও অন্যান্য প্রয়োগে সুধীন্দ্রনাথ তুলনারহিত। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর ছিল প্রশ্নাতীত দক্ষতা। ফলে সংস্কৃতজাত নতুন শব্দনির্মাণেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অধুনা বাংলাভাষায় চালু বহু 'কঠিন' শব্দ ব্যবহারের ভগীরথ সুধীন্দ্রনাথ। এ ছাড়া বাংলা ভাষার প্রকরণগত দিকটিতেও তাঁর ছিল অপরিসীম আগ্রহ। এ ক্ষেত্রেও তাঁর অনবদ্য দক্ষতার স্বীকৃতি রয়েছে বুদ্ধদেব বসুর লেখায়। 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : কবি' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখছেন : 'বানান ও ব্যাকরণ বিষয়ে তাঁকে [সুধীন্দ্রনাথ] আমরা অভিধানের মতো ব্যবহার করেছি— আমার সমবয়সী বাঙালি লেখকদের মধ্যে তিনি একমাত্র, যিনি বাংলায় ও বাংলায় ব্যবহারযোগ্য প্রতিটি সংস্কৃত শব্দের নির্ভুল বানান জানতেন, এবং শব্দতত্ত্ব ও ছন্দশাস্ত্র বিষয়ে যাঁর ধারণায় ছিল জ্ঞানাশ্রিত স্পষ্টতা। এই শব্দের প্রেমিক শব্দকে প্রতিটি সম্ভবপর উপায়ে উপার্জন করেছিলেন ....।' শুধু এইটুকুই নয়, বুদ্ধদেবের ওই প্রবন্ধে আমরা জানতে পারি, কীভাবে ছেলেবেলায়

বেনারসে অ্যানি বেসান্তের ইস্কুলে সংস্কৃত ও ইংরেজি শেখার পর পরবর্তী সময়ে তাঁকে স্বচেষ্টায় শিখে নিতে হয়েছিল বাংলা ভাষা। নিজস্ব গদ্যে সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষার প্রভাব সম্পর্কে সচেতন সুধীন্দ্রনাথ 'স্বগত'-র সূচনায় যেন কিছুটা অভিমান স্পৃষ্ট ভঙ্গিতেই লিখেছিলেন : 'বন্ধুমহলে আমার লেখা দুর্বোধ্য বলে নিন্দিত। হিতৈষীদের বিচারে সংস্কৃত আর ইংরেজি ভাষার বর্ণসঙ্কর ঘটিয়ে আমি যে অস্পৃশ্য রচনারীতির জন্ম দিয়েছি, বঙ্গভারতীর নাটমন্দিরে সে হরিজনের প্রবেশ নিষিদ্ধ ....।'[২] বর্ণসাঙ্কর্যের এই উপলব্ধি সুধীন্দ্রীয় গদ্যরীতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কলাকৌশল বুঝে নিতে সাহায্য করে আমাদের।

একাধিক ভাষায় প্রগাঢ় বুৎপত্তিসম্পন্ন এই মানুষটির চিরকালই ছিল যুক্তির প্রতি অপ্রমেয় টান। আবেগের সংক্রামের চাইতে যুক্তির পরম্পরায় কোনও সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ঢের বেশি জরুরি ছিল সুধীন্দ্রনাথের কাছে। এই যুক্তির অন্বয়েই নির্মিত হয়েছে তাঁর ভাষাসৌধ, বাংলা গদ্যশৈলীর এক ধ্রুপদী নির্মাণ। গদ্যভঙ্গিতে যে যুক্তির স্পন্দন ছিল সুধীন্দ্রনাথের অন্বিষ্ট, বাংলা ভাষা তার ভার কতটা সইতে পারবে সে বিষয়ে আদৌ দ্বিধাহীন ছিলেন না তিনি। এ ক্ষেত্রে তাঁর উপলব্ধি : 'আসলে যুক্তির বিস্তার বাংলার স্বভাব বিরুদ্ধ ; এবং নিরুক্তির নির্বন্ধেও একাধিক ভাবের অনুবন্ধ বাঙালির পক্ষে এতটাই কষ্টসাধ্য যে তার লেখায় শাখা সংবলিত বাক্য নাতিসুলভ। তৎসত্ত্বেও বঙ্গ ভাষা সাধারণ্যের পরিপন্থী ; এবং গুণবাচক শব্দের জন্যে আমরা তো সংস্কৃতের মুখাপেক্ষী বটেই, এমনকি আধুনিক সংসারের অনেক স্থূল ব্যাপারও বাংলাভাষার অতীত। ফলত ইংরেজীর সংমিশ্রণ ব্যতীত শিক্ষিত বাঙালীর আলাপ আলোচনা অচল ; এবং ভাষাসঙ্কর রসসৃষ্টির অন্তরায় ব'লে, সে প্রায়ই সোজা কথাকে ঘুরিয়ে লেখে।'[৩] এর আট বছর পর রচিত 'উক্তি ও উপলব্ধি' শীর্ষক প্রবন্ধেও এই ভাবনারই সমর্থন মেলে। উল্লেখ্য, এরও এক দশক পর সুধীন্দ্রনাথকে লিখতে হয়, 'জোরালো কথাকে ঘোরালো করে তোলার অভ্যাস পঁচিশ বছরের আত্মধিক্কারেই কাটেনি।'[৪] ওই প্রবন্ধেই আরও একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য উপস্থিত করেছেন তিনি। তা হল, তাঁর নিজের রচনাই তিনি ইংরেজি অনুবাদের ছকে ফেলতে অক্ষম। ভাষার স্বভাববিরুদ্ধ হলেও যুক্তির কাঠামো অগ্রাহ্য করেননি তিনি। এই যে নির্বিষ্ট যুক্তির আশ্রয়ে, রীতিমতো নৈয়ায়িক অন্বয়ের সাহায্যে সুদীর্ঘ বাক্যের মাধ্যমে সাক্ষ্য থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর প্রয়াস লক্ষিত হয় সুধীন্দ্রনাথের গদ্যে তা তাঁর দুরূহতার অন্যতম সোপান। দু'একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

১। 'হয়তো ব্যক্তিগত কারণে ঐক্যসাধনের প্রয়োজন আমার কাছে সব চেয়ে বড় ; এবং সেই জন্যে আলোচ্য গ্রন্থের এই দিকটায় আমি বেশি জোর দিয়েছি। কিন্তু এটাও আমি জানি যে কেবল সাধারণ সূত্রের উপরে যে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত, যাতে শুধু অভিন্নতাই সূচিত হয়, বৈষম্যের ব্যাখ্যা মেলে না, তার মূল্য অত্যল্প। সুতরাং অমূল্যধনের নির্দিষ্ট পথে বাংলা ছন্দের সমস্যামূলক ত্রিত্বের কোনও হেতু পাওয়া যায় কিনা, তার বিচারেই এ প্রবন্ধ শেষ করা প্রশস্ত।'[৫]

২। 'ফলত ব্যক্তিস্বরূপেও রহস্যঘনতার স্থান নেই ; পৃথক পৃথক মানুষের বৃত্তি পৃথক বলেই, তারা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং বৃত্তি যেহেতু বুত্তেরই গুণ, তাই নাস্তিজাত মানুষ যতক্ষণ নাস্তিতে না ফেরে, ততক্ষণ তার চক্রবরণের পরিচয় স্বতই অসমাপ্ত। অর্থাৎ ব্যক্তির স্বরূপ তার আয়ুর সঙ্গে জড়িত ; এবং ভবিষ্যদ্ব্যাহত মানুষের কাছে ও—দুটোই অনিশ্চিত ঠেকলেও, সে-অনিশ্চয় বিধিতে স্বৈরাচারের সুযোগ নেই। কারণ হেগেল-এর বিচারেও বিশুদ্ধ সত্তা শুধুই বিকল্প না, অস্তিত্ব বলতে সাধারণত একটা প্রক্রিয়াকেই বোঝায় ; এবং যারা তাঁর মত জ্ঞানবাদী নয়, তাঁদের কাছে নিরাধার সত্তা যদিও কথার কথা, তবু তাঁরা সুদ্ধ মানতে বাধ্য যে প্রাণের প্রথম সোপান যে-অচেতন অ্যামিবা, সেও আত্মরক্ষায় তৎপর।'[৬]

উপরোক্ত উদ্ধৃতি দুটিতে সুধীন্দ্রনাথের গদ্যশৈলীর বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্টত দৃশ্যমান। শব্দ চয়ন বা শব্দ প্রয়োগ প্রসঙ্গে কিছু বলার আগে দেখে নেওয়া যাক সুধীন্দ্রীয় বাক্য গঠনের রীতি। এ ক্ষেত্রে যা প্রথমেই নজর কাড়ে তা হল বাক্যের জটিল রূপায়ণ ও দীর্ঘ আয়তন। এ জটিলতা মূলত দৈর্ঘ্যের দরুন। দ্বিতীয় উদাহরণটির শেষ বাক্যটিতে শব্দ সংখ্যা ৪৩। প্রথম বাক্যের শব্দ সংখ্যা ৩২। প্রথম উদাহরণের দ্বিতীয় বাক্যটির শব্দ সংখ্যা ২৪। সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলিতে এর চেয়ে দীর্ঘায়তন বাক্য খুঁজে বার করা কঠিন নয়। জোরালো কথাকে ঘোরালো করার পাশাপাশি লক্ষণীয় এই সুদীর্ঘ বাক্যগুলি গাঁথা হয়েছে বিরামচিহ্ন সেমিকোলন ও, এবং, কিন্তু, তবু, সুতরাং, ফলত, সেহেতু-র মতো যোজকপদের সাহায্যে। ফলে তাঁর গদ্যভঙ্গিমায় 'নৈয়ায়িকী অন্বয়' সুপ্রকট। এই রীতি অবশ্য বাংলাভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ।[৭] অথচ এটা সুধীন্দ্রীয় গদ্যশৈলীর বিশিষ্ট লক্ষণ। তদুপরি, প্রায় প্রতিটি বাক্যাংশেই রয়েছে পূর্ণ ভাবনার ইঙ্গিত। ফলে একটির পর একটি বাক্য সাবলীলভাবে পাঠ করে যাওয়া পাঠকের পক্ষে হয়ে ওঠে শ্রমসাধ্য। গোটা লেখার নকশাটা বুঝে নেওয়াও হয় কঠিন। আবার এরই পাশাপাশি চার বা পাঁচ শব্দের মিতায়তন বাক্যও পাওয়া যায়। তেমন অনেক বাক্যই ক্রিয়াপদহীন।

সংস্কৃত ভাষায় নিছক জ্ঞানাশ্রিত স্পষ্টতাই নয়, ওই ভাষাটির প্রতি আলাদা আকর্ষণ ছিল সুধীন্দ্রনাথের। সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারের অকুণ্ঠ ঋণে সমকালের বাংলাভাষাকে ঋদ্ধ করে তোলার তাগিদ

ছিল তাঁর। আর কোনও বাঙালি সাহিত্যিকের রচনায় এত বিস্তৃত ভাবে সংস্কৃত ও সংস্কৃতজ শব্দের ব্যবহার নেই। বহু সংস্কৃত শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন আদি অর্থে (যেমন, শ্রেষ্ঠ কবি অর্থে কবিরাজ); সংস্কৃতজাত বহু শব্দ তিনি তৈরিও করেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত সাধারণ্যে স্বল্পপরিচিত তৎসম শব্দের কয়েকটি হল : বিবিক্তি (নিঃসঙ্গতা), প্রমা (প্রকৃত জ্ঞান), বভ্রু (পিঙ্গল), সংবিদ (সম্পত্তি), বৈহাসিক (ভাঁড়), উন্নিদ্র (নিদ্রাহীন), অনুলাপ (পুনঃপুনঃ কথন) প্রভৃতি।[৮] এই ধরনের শব্দের সাহায্যে তাঁর বক্তব্য হয়েছে সংহত; কেবল যেটুকু বলবার সেটুকুই বলেছেন নিখুঁতভাবে। কিন্তু অধিকাংশ পাঠকের কাছেই এই শব্দের বেড়াজাল পার হওয়া দুষ্কর। সব মিলিয়ে সুধীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির ধ্রুপদী শৈলী অদীক্ষিতের জন্য নয়। সুধীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় জগন্নাথ চক্রবর্তী বলেছিলেন, 'বুদ্ধি চর্বনে যার রুচি নেই তার পক্ষে সুধীন্দ্রনাথ সত্যিই দুষ্পাচ্য। সুধীন্দ্রনাথ হৃদয়কে মন্থন করেন বুদ্ধির দণ্ডে এবং আবেগকে মগজের কাছে বাধা রাখেন বরাবরের জন্য।' কেবল তাঁর বক্তব্যের মর্মে পৌঁছতেই নয়, মেধা ও শ্রমের প্রয়োজন সুধীন্দ্রীয় গদ্যে আঙ্গিকের রস উপলব্ধি করতেও।

সাহিত্য ভাবনার দিগদর্শন : ঐতিহ্যের অঙ্গীকার

বর্তমানে, অর্থাৎ এই সংকীর্ণ স্পেশালাইজেশনের যুগে মাঝে মধ্যে ভাবতেও অবাক লাগে যে সদ্যগত শতাব্দীতেও এমন মানুষ ছিলেন যাঁদের আগ্রহের পরিধিতে ঠাঁই পেতে পারত গোটা বিশ্ব। জ্ঞানের বিচিত্র মহলের সহাবস্থান খুব বেশি বিস্মিত করত না মননশীল মানুষকে। সেই প্রায় লুপ্ত প্রজাতিরই এক জন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। সৃষ্টিশীল কবি হয়েও আজীবন নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন নানা অ-সাহিত্যিক বৃত্তিতে। পরিচয় পত্রিকা সম্পাদনাকালে তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল একটি বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী। জ্ঞানচর্চার বিচিত্র বিভাগে ছিল যাঁদের আনাগোনা। সুধীন্দ্রনাথের মনন বিবর্তনে ওই গোষ্ঠীর প্রভাব নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্য ছাড়াও দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি বা সমাজতত্ত্বে সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের অধিকারী। বিচিত্র বিদ্যায় মননশীল আগ্রহ ও পারদর্শিতা সত্ত্বেও সুধীন্দ্রনাথের বেশির ভাগ প্রবন্ধের বিষয় সাহিত্যদর্শন। এই সমস্ত প্রবন্ধ থেকে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের জীবনদর্শনের একটা ধারণা করা নিতান্ত অসম্ভব না হলেও তা বর্তমান নিবন্ধের আয়ত্তের বাইরে। এমনকী তাঁর সাহিত্যদর্শনের গোটা পরিধি দাবি করে অন্তত একটি পূর্ণায়তন, স্বতন্ত্র গ্রন্থ। এখানে, সীমিত পরিসরে আমি চেষ্টা করব তাঁর সাহিত্যদর্শন সম্পৃক্ত কয়েকটি ধারণা তুলে ধরার।

প্রথমেই কবুল করা দরকার সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত ঐতিহ্যানুসারী। ১৯৩০ সালে লেখা 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধে সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল ভাষার সঙ্গত শাসন থেকে কাব্যের মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। ওই প্রবন্ধে কবিকে শব্দ প্রণয়নের সনাতন অধিকারে বঞ্চিত না করেও তিনি স্পষ্টই বলেন, শব্দের সক্রিয়তা অমিত নয়। বহু ব্যবহারে তা ক্ষয়িষ্ণু। পাশাপাশি তিনি এও জানাতে ভোলেন না, প্রাচীন শব্দের ব্যবহারিক মূল্য হ্রাস পেলেও বেড়ে ওঠে তার আলঙ্কারিক মর্যাদা। ভাষার সঙ্গত শাসন বা পুরনো শব্দের পুনরুজ্জীবন তো প্রকারান্তরে ঐতিহ্যেরই অনুশাসন। কাব্যের মুক্তিতে গদ্য-পদ্যের আবহমান দ্বন্দ্ব সম্পর্কেও সুধীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ। গদ্য ও পদ্য—ভাষার বৈধ মতে ভিন্নতার কারণ তিনি পেয়েছেন ওই দুই genre -এর স্বভাবগত পার্থক্যে। যেহেতু সুধীন্দ্রনাথের রচনাকর্মে শব্দের মূল্য অপরিসীম, তাই সেই সংক্রান্ত একটু উদ্ধৃতিরও প্রয়োজন। কারণটা পরে দিচ্ছি। সেটা এই রকম : 'শব্দ মাত্রেরই দুটো দিক আছে; একটা তার অর্থের দিক, অন্যটা তার রসপ্রতিপত্তির দিক। গদ্যের সঙ্গে শব্দের সম্পর্ক ওই প্রথম দিকটার খাতিরে; গদ্যে শব্দগুলো চিন্তার আধার। কিন্তু কাব্য শব্দের শরণ নেয় ওই দ্বিতীয় গুণের লোভে কাব্যের শব্দ আবেগবাহী। ... [কাব্যে শব্দব্যবহারের] অনির্বচনীয়তার মূলে শুধু শব্দার্থ নেই, আছে শব্দের অন্তর্শীল আবেগ, সমাবেশ ও ধ্বনিবৈচিত্র এবং ছন্দের শোভনতা।'

অল্প আগেই গদ্যরীতি নিয়ে যে আলোচনা করেছি সেই পরিপ্রেক্ষিতে এটা কি ভাববার বিষয় নয়, যে, গদ্যে সুধীন্দ্রনাথের শব্দপ্রয়োগ কি কেবলই অর্থাশ্রয়ী? শব্দব্যবহারের ধ্বনিবৈচিত্র অথবা রসপ্রতিপত্তি কি আদৌ নেই সুধীন্দ্রীয় গদ্যে? রূপের আভাসের পরিবর্তে সবটাই কি শুধু রীতির ইঙ্গিত? সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্যদর্শনে 'কাব্যের মুক্তি' প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ। হ্রাসমূল্য পুতনের নতুন করে মূল্য খোঁজার প্রচেষ্টা, তাকে সমকালের চিন্তারাজ্যে শরিক করে তোলা কি এক অর্থে ঐতিহ্যের আধুনিকীকরণ নয়? ত্রিশের দশকে বিশ্বব্যাপী অস্থিরতার কালে তাঁর লেখা আরেকটি প্রবন্ধের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। সেটি হল স্বগত-র অন্তর্গত 'ঐতিহ্য ও টি-এস এলিয়ট।' ওই প্রবন্ধে শিল্পসৃষ্টির অন্যতম শর্ত হিসাবে 'উদ্বুদ্ধ চৈতন্য'কে স্বীকৃতি দিয়েও তাঁর সতর্ক মন্তব্য 'ঐতিহ্য বা ট্রাডিশন ব্যতীত শিল্পসৃষ্টি কার্যত অসম্ভব।' বর্তমান যুগে যখন কোনও কোনও শিল্পী ঐতিহ্য পরম্পরা অস্বীকার করে ভুঁইফোড় শিল্পকলার আশ্রয় নিয়েছে সেই মুহূর্তে সুধীন্দ্রনাথকে বলতে শুনি : 'আমরা যে আজ ঐতিহ্যের শাসন মুক্ত, ব্যক্তিকে সমষ্টির ভগ্নাংশ বলতে আমরা যে আজ অনিচ্ছুক, তার কারণ এ নয় যে পুরাতন আদর্শ প্রগতির প্রতিবন্ধক, তার কারণ শুধুই এই যে আমাদের ইতিহাসে প্রগতি আর প্রলয়ের মধ্যে বিশেষ কোনও প্রভেদ নেই। .... সেই জন্য আমরা স্বাধীনতা খুঁজি না, চাই মাত্র নির্বিরোধ।'[৯] প্রগতি সম্বন্ধে

নিরুৎসাহ সুধীন্দ্রনাথের শিল্প তথা সাহিত্যভাবনা ছিল সুইস মনস্তত্ত্ববিদ ইয়ুং-এর জাতিভিত্তিক, সমষ্টিগত স্মৃতির তত্ত্বে আস্থাশীল।[১০] সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্যদর্শন সম্পর্কে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি এই যে ধ্রুপদী মানসিকতার এই মানুষটির কোনও আস্থা ছিল না কলাকৈবল্যবাদে। চিত্তশুদ্ধির সহায় হিসাবেই সাহিত্যের মূল্য ছিল তাঁর কাছে।

ভাবপ্রবণ ব্যক্তিবাদের প্রতিও মানসিক সাযুজ্য ছিল না সুধীন্দ্রনাথের। রোমান্টিক কবিদের কাব্যে সংযোগের অভাব হেতু জনসাধারণ কাব্যানুশীলন থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, এমন কথাও উচ্চারণ করেন তিনি। যেহেতু আধুনিক কবিরা জানেন সম্প্রসারণ ছাড়া কবিতা বাঁচবে না, তাই-এ বিষয়ে সুধীন্দ্রীয় নিদান : 'কবিতার লুপ্ত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করতে চাইলে খেয়ালি কবিদের ব্যক্তিগত উৎকর্ষের অন্বেষণ বৃথা, সে জন্য জাতিগত চৈতন্যের অঙ্গীকার অত্যাবশ্যক।'[১১] এ প্রবন্ধে কবিযশোপ্রার্থীকে স্বদেশের সাহিত্যের মূল সূত্র অন্বেষণের পরামর্শ দিলেও নিজস্ব রচনায় প্রাচ্য তথা ভারতীয় ঐতিহ্যের চেয়ে পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল সুধীন্দ্রনাথের কাছে। এ ছাড়াও আমার ধারণা, অভিজাত ব্যক্তিত্ব ও প্রখর বুদ্ধিচর্চা সুধীন্দ্রনাথকে নিয়ে গেছে এক উত্তুঙ্গ নৈর্ব্যক্তিকতায়। সেখানে জনতার জঘন্য মিতালি, প্রণয়ের মমত্ববন্ধন, পতঙ্গের সাম্যবাদ ও কৃপাজীবী ক্লীবের ক্রন্দন জীবনকে কেবলই করে তোলে দুঃসহ।[১২] প্রায় পাঁচ দশক আগে পরিচয়ে প্রকাশিত 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও নাস্তিবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধে মণীন্দ্র রায় দেখিয়েছিলেন, সুধীন্দ্রনাথকে কবিতায় বহাল থাকে এক আশ্চর্য পরস্পরবিরোধী প্রস্তাব — সাধারণ মানুষকে নগণ্য মনে করে তার জন্যই উৎকণ্ঠিত হওয়া। ঐতিহ্যকে বিমূর্ত নৈর্ব্যক্তিকতায় দেখার ফলে আপন অস্তিত্বের একাকিত্বকেও স্বীকৃতি দিতে অসুবিধা হয়নি সুধীন্দ্রনাথের। ফলে সাহিত্য বা জীবনদর্শনে জীবনের সমস্যাগুলো বাস্তব বিচ্ছিন্ন সমস্যা হিসাবেও বিচার করতে অসুবিধা হয় না তাঁর। নিখিল নাস্তিতে পৌঁছনোর এটাও পথ।

শেষে এটাই বলতে হয় কি ভাষাশৈলী, কি সাহিত্যদর্শন — সুধীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য বাংলাসাহিত্যে অনন্য। তুলনারহিত। বৃহত্তর পাঠকসমাজ লক্ষ্য ছিল না তাঁর, সকলে নয়, একান্ত সমানুরুম্পনের মানুষের সঙ্গেই কথা বলেছেন বাংলা সাহিত্যের শেষ অভিজাতপুরুষ। তাঁর নিজের উক্তিতে : 'বস্তুত আমি নিরবধি কাল বা বিপুলা পৃথ্বীর অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী নই, সমানধর্মীর সহানুভূতিই আমার একান্ত কাম্য'।

সূত্র নির্দেশ ও প্রাসঙ্গিক টীকা :

১। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ, দে'জ, অমিয় দেব লিখিত ভূমিকা।
২। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ, দে'জ, স্বগত : সূচনা, পৃ: ৩।
৩। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ, দে'জ, স্বগত : সূচনা, পৃ: ২৭৫।
৪। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ, দে'জ, পুনশ্চ, পৃ: ১৯৩।
৫। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ, দে'জ, বাংলা ছন্দের মূলসূত্র, পৃ: ৩১২।
৬। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ, দে'জ, সূচনা, পৃ: ৮।
৭। বাংলা ভাষা পরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলি (সুলভ সংস্করণ), ১৩শ খণ্ড, পৃ: ৬১৮-৬১৯।
৮। এমন বহু শব্দের তালিকা পাওয়া যাবে দে'জ পাবলিশার্স প্রকাশিত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থে, জগন্নাথ চক্রবর্তীর ভূমিকায়।
৯। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ, ঐতিহ্য ও টি এস এলিয়ট, পৃ: ১৪৪। উইন্ডাম ল্যুইস ও এজ্রা পাউণ্ড প্রবন্ধেও সুধীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন: একালের উদ্বাস্তু দৃষ্টিতে ছন্ন ঐতিহ্যের নির্বিঘ্ন গড্ডালিকাই অগতির গতি। পৃ: ১৩৪।
১০। দ্রষ্টব্য : সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা: তথ্য, তত্ত্ব ও শুভাশুভের দ্বন্দ্ব : সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, শিলীন্ধ্র, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সংখ্যা (১৪০৮)
১১। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ, ঐতিহ্য ও টি এস এলিয়ট, পৃ: ১৪৫-১৪৬।
১২। ক্রন্দসী কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'প্রত্যাখ্যান'।

প্রবন্ধ

আশাপূর্ণার ছোটগল্প: মেয়েদের আত্মদর্শনের দর্পণ

সুচিত্রা সেন

১

আলোচনাটির আরম্ভে রাখা যাক নারী-পুরুষের বিষমতা সম্পর্কে লেখিকা আশাপূর্ণার তীব্র ভাষণটি —

"আমরা মেয়েরা আজ পুরুষের সঙ্গে আইনগত সমান অধিকার লাভ করে যতোই কেন না পুলকিত হই, আজও আমাদের সমাজ রীতিমত পুরুষশাসিত। আজও দেশের সমগ্র কর্ম্মকেন্দ্রের আর ক্ষমতাকেন্দ্রের কলকাঠিগুলি পুরুষেরই হাতের মুঠোয়। আজও পুরুষের চোখে মেয়েরা তাচ্ছিল্যের আর অবহেলার পাত্রী। যুগ যুগ সঞ্চিত এই সংস্কার আজও মিশে আছে পুরুষের রক্তে মাংসে অস্থিতে মজ্জায়। মেয়েদের কর্ম্মতপস্যার দিকে অনুকম্পার দৃষ্টি ভিন্ন সত্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখার অভ্যাস তাঁরা আজও অর্জ্জন করেননি। তাই মেয়েদের স্বীকৃতি দিতে আজও তাদের লজ্জায় বাধে।

তাই ঐতিহাসিক সাহিত্য সভায় মঞ্চে দাঁড়িয়ে যখন অনেক শূরবীররা বাংলা সাহিত্যের দু'শো বছরের ক্রমবিকাশের আলোচনা করেন, সে আলোচনায় রামমোহন রায় থেকে সুরু করে বর্তমান কালের কনিষ্ঠতম লেখকটির নাম পর্যন্ত উল্লিখিত হয়, উচ্চারিত হয় না একটিও মহিলা সাহিত্যিকের নাম।

অন্তত: পথিকৃৎ হিসাবেও যে স্বর্ণকুমারী দেবী, অনুরূপা দেবী, মানকুমারী দেবী, কামিনী রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা উচিত, এই সহজ তথ্যটুকুও স্মরণে আসে না সেই শূরবীর পণ্ডিতবর্গের।"[১] — আত্মবোধের এই বিশেষ বর্ণমালার মধ্য দিয়েই লেখিকা আশাপূর্ণা নিজেকে পৃথক করে নিয়েছেন পুরুষ লেখকদের থেকে। প্রায় বিয়াল্লিশ বছর আগে লেখা প্রবন্ধটিতে তিনি নারীর প্রতি পুরুষতন্ত্রের অবজ্ঞা ও ইচ্ছাকৃত বিস্মৃতিকে চিহ্নিত করেছেন মুক্তকণ্ঠে। এই নারীজনোচিত জীবনদৃষ্টির বৈশিষ্ট্যেই আশাপূর্ণার লেখা অন্যতর গুরুত্ব অর্জন করেছে।

সাহিত্যের দুনিয়ায় আমরা জানি চিরকাল পুরুষেরই আধিপত্য। সাহিত্যের সৃজনে ও ব্যাখ্যানে পুরুষের প্রতাপী প্রাধান্যের পাশে মেয়েদের সংখ্যার স্বল্পতা এক সময় ছিল চোখে পড়বার মতো। তবে একথা উল্লেখ্য নারীর শোষণ ও অবনমনের রাষ্ট্রিক, সামাজিক কারণগুলি এখন আর অন্ধকারে নেই। বরং বহুমাত্রিক অনুসন্ধানে সমৃদ্ধ হয়েছে। আর সময়ের বিবর্তনে আজকের মেয়েদের জীবনযাত্রার নিরিখে একদা অবরোধবাসিনীরা ইতিহাসের বিষয়।

আশাপূর্ণা দেবী সাম্প্রতিক কালের লেখিকা নন। তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'পত্নী ও প্রেয়সী'-র প্রকাশ ১৯৩৬-এ। এরপর লেখার জগতে তিনি অপ্রতিহত। একটানা গল্প-উপন্যাস লিখে গেছেন নববইয়ের দশক পর্যন্ত। পুরুষ নিয়ন্ত্রিত বাংলা কথাসাহিত্যে তিনি জায়গা করে নিয়েছেন নিজের কলমের জোরে।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে নারী পুরুষের ভেদ সঙ্গত কি? স্রষ্টা নারী হলে তাঁর সাহিত্য কি আলাদা গোত্রের হবে? তা সম্ভব নয়। কারণ সৃষ্টির নিশ্চিত অনুষঙ্গ গুলি উভয়ক্ষেত্রেই এক। তা হলে মেয়েদের সৃষ্টির বিশেষ মূল্যটি কোথায়? এ ক্ষেত্রে মূল্যটি দৃষ্টিকৌণিক। প্রকৃতপক্ষে পুরুষের আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণের অধীন একটি মেয়ের যে জীবনচেতনা তা বলা যায় শাসকের নয় শাসিতের। অধীনস্থের অনুভূতি, মনোভঙ্গি তো পৃথক হওয়াই উচিত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বেড়ে ওঠা লেখিকার নারী-মন কোন চেতনার শরিক হল? দেশ, কাল, সমাজ, মানুষ সম্পর্কে কোন দৃষ্টি অর্জন করলেন তিনি? লেখিকা পুরুষ অপেক্ষা কোনও বিপরীত বীক্ষণের কেন্দ্রে নিজেকে স্থাপন করলেন অথবা মেনে নিলেন পুরুষেরই চাপিয়ে দেওয়া দৃষ্টিভঙ্গিকে। এই সব দিকগুলি পাঠকের উদ্দীপ্ত কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠতে পারে।

২

সাধারণ ঘরোয়া জীবনের কেন্দ্রে বসে নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যচর্চা করে গেছেন আশাপূর্ণা। অত্যন্ত রক্ষণশীল পরিবারে জন্ম, ফলে বিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষা তাঁর ছিল না, ছিল অজস্র পঠনের অভিজ্ঞতা। পড়বার কী অদম্য তৃষ্ণায় তিনি তাড়িত ছিলেন বারবার তার উল্লেখ করেছেন স্মৃতিচর্যায়। পড়বার সঙ্গে সঙ্গে লেখবার দুর্মর তাগিদও তিনি অনুভব করেছিলেন। কবিতা লেখা দিয়ে তাঁর সাহিত্যের পাঠ শুরু হয়েছিল।

আশাপূর্ণা তিরিশের দশক থেকে রীতিমতো লিখতে শুরু করেন। তখন লেখার বিষয়টি মূলত পুরুষদের হাতে। মেয়েরা ছিলেন না এমন নয়, ছিলেন, ব্যতিক্রমী হয়ে। এই সময় 'রক্ষণশীল বাড়ীর মেয়ে', 'রক্ষণশীল বাড়ীর বৌ' আশাপূর্ণার সাহিত্যসৃষ্টির

জোরালো ইচ্ছাটি মুক্তি পেয়েছে নিজেরই চেনা পরিমণ্ডলকে অবলম্বন করে। নারী-লেখিকা হিসাবে তিনি নিজের গণ্ডিবদ্ধতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন — "প্রকৃতিপ্রেমিক লেখকের বর্ণাঢ্য রচনা আমায় আকৃষ্ট করে, আনন্দ আর বিস্ময়ের স্বাদ এনে দেয়, কিন্তু ও আমার সাধ্যের বাইরে। সাধ্যের মধ্যে শুধুই মানুষ, মধ্যবিত্ত ঘরোয়া মানুষ, যে আমার একান্ত চেনা জানা। আমি আমার জানা জগতের বাইরে কখনো হাত বাড়াতে যাই না।"[২]

আশাপূর্ণা নিভৃতে আর এক ধরনের সাহিত্যচর্চা করে গেছেন। যে সাহিত্য সৃষ্টির মূল কেন্দ্র হয়ে উঠেছে সাধারণ বাঙালির সমাজ ও পরিবারজীবন। তিনি নিতান্ত ঘরোয়া অভিজ্ঞতার পুঁজি দিয়েই পাঠককে সংসারের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে ছেড়েছেন। স্বকীয় ভঙ্গিতে বাংলা কথাসাহিত্যে লোকপ্রিয় হয়ে উঠেছেন।

সাহিত্য চলিষ্ণু মানবজীবনের ইতিবৃত্ত। সমাজের ক্রমিক পরিবর্তন আসে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পথে। সৃজনশীল মন এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন অবশ্য লক্ষ করে। লেখিকা তাঁর সাহিত্যজীবনে পুরাতন কাল থেকে নতুনের দিকে যাত্রা করেছেন। এই পরিবর্তমান কালস্রোতের অনুভব তাঁর গল্প উপন্যাসে অলক্ষ্য থাকেনি।

বিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে মেয়েদের অবস্থা পরিবর্তিত হতে থাকে। যে সব পরিবার মেয়েদের অবস্থান্তরে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তারা সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠিত ও উল্লেখ্য পরিবার। এই সব শিক্ষিত প্রগতিশীল মনোভাবসম্পন্ন পরিবারগুলির বাইরে ছিল বৃহৎ জনসমাজ, সাধারণ ছাপোষা মধ্যবিত্ত পরিবার। এই সব পরিবারের অন্ধকূপে খুব একটা আলোকপাত ঘটেছিল এমন কথা বলা যায় না। গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতা এই সব পরিবারে চেপে বসেছিল বহুকাল পর্যন্ত। সেই মধ্যবিত্ত সাধারণ মেয়েদের অবস্থা কেমন ছিল, আশাপূর্ণার গল্পে তার বিস্তৃত ইতিহাস ধরা আছে। এইসব মেয়েদের মনের গড়ন, চরিত্র, মানবিক সম্বন্ধগুলির বৈচিত্র, এদের জীবনের রীতিনীতি, প্রথা, আচার-বিচার, সংস্কারসমন্বিত বিশিষ্ট পরিমণ্ডল গল্পগুলিতে উপস্থিত।

৩

'মেয়েদের কথাই বেশী করে ভেবেছি' — আর এই ভাবনার মূলে ছিল নারীজীবনকে ঘিরে আশাপূর্ণার বিক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা — "মেয়েদের সবকিছুতেই এমন অধিকারহীনতা কেন? তাদের উপর অন্যায় শাসনের জাঁতা চাপানো কেন? তার জীবন অবরোধের মধ্যে কেন?"

মেয়েদের জীবন সম্পর্কে আশাপূর্ণার এই চেতনার মধ্যে নতুনত্ব নেই। কারণ এই প্রশ্নগুলো উনিশ শতক থেকেই চলে আসছিল — অনেক আন্দোলন আলোচনার মধ্য দিয়ে, পুরুষেরই ধ্যানধারণাবাহিত হয়ে। তা হলে লেখিকার ভাবনাটিকে আমরা গুরুত্ব দেব কেন? প্রথমত লেখিকার প্রশ্নগুলি আমাদের একটি সহজ সত্যের প্রাপ্তি ঘটায় সেটি হল মেয়েদের জীবনে তখনও তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। মেয়েরা যে জীবনযাপন করে তা থেকে তাদের মুক্তির প্রয়োজন আছে। দ্বিতীয়ত, আশাপূর্ণা এমন একজন লেখিকা যিনি রক্ষণশীলতার গোঁড়ামিকে নিজের জীবনেই অনুভব করেছিলেন। তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত 'আস্ত একটা বই' প্রকাশের কথা ভাবেননি। কারণ 'আশাপূর্ণা দেবী তো তখন অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরচারিণী।'[৪] বাইরের জগতে মিশেছেন চল্লিশের পর 'চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত কেউ জানতো না আসল আশাপূর্ণা দেবী কে? ওটা কোনো পুরুষ লেখকের ছদ্মনাম নয়তো?'[৫] সংসারের সবরকম দায়িত্ব কর্তব্য পালন করেই তিনি সার্থক লেখিকা হতে পেরেছেন। অর্থাৎ সমাজ-নির্দিষ্ট কন্যা, বধূ, জায়া, জননীর ভূমিকাটি যথাযথ পালন করেছিলেন আশাপূর্ণা। বলেছেন "সারাজীবন আরামকে হারাম করে যা বলতে চেয়েছি তা হয়তো অন্যদের বোঝাতে পেরেছি। 'বিদ্রোহিনী' সৃষ্টি করার প্রশ্নে বলব আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত জীবন (আর আমার লেখা) পাশাপাশি রাখলে 'বিদ্রোহিনী'কে কোথাও ধরা যাবে না। তবে সবাই উঠে এসেছে আমার জীবনের পারিপার্শ্বিক পটভূমি থেকে।"[৬] মেয়েদের জীবন সম্পর্কে তাঁর বোধ ও বোধির পরিচয় বিস্তৃত হয়ে রয়েছে তাঁর সমগ্র সাহিত্যচর্চায়। নিজের জীবনে কোনও বিদ্রোহ না থাকলেও নারীজীবনকে ঘিরে ভেতরের প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহের ভাব, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিকে প্রভাবিত করে অন্যতর নারীভাষ্য রচনার দিশারী করেছে। মেয়েদের সম্বন্ধে অতি সচেতনতা থেকেই সৃষ্ট হয়েছিল তার স্মরণীয় ট্রিলজি গ্রন্থ প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা, বকুলকথা। তবে আমাদের আলোচনাটি উপন্যাস নয়, তাঁর ছোটগল্পপাঠের অভিজ্ঞতায় নিবদ্ধ।

৪

বামাবোধিনী পত্রিকায় ফাল্গুন ১৩০৯ সংখ্যায় সতীশচন্দ্র রায়ের 'তুমি কি?' রচনায় নারীর যে মর্মোদ্ধার করা হয়েছে তার কয়েকটি অংশ তুলে দেওয়া গেল: "তুমি রমনীকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; তোমার জীবনে সংসারে বড় মূল্যবান তোমার জীবনের কর্তব্য বড় ভীষণ। সুতরাং পুরুষ অপেক্ষা তোমার জীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অধিক।"

"তোমাকে সুমাতা হইতে হইবে। তজ্জন্য কচি বয়স হইতেই বিশাল আয়োজন কর। একদিন দুইদিনের চেষ্টায় সমাজের অধিষ্ঠাত্রী জননী হইবার ইচ্ছা বিড়ম্বনা। ..... শৈশবের খেলা শীঘ্র শীঘ্র ভুলিয়া যাও। বাল্যের চাঞ্চল্য পরিহার কর। সংসারে যোগিনী সাজ। কর্ত্তব্যের অনুরাগিনী হও।"

আশাপূর্ণার গল্পগুলি থেকে দেখা যাক পুরুষের প্রয়োজনে

তৈরি করা অন্দরমহলে শুদ্ধান্তঃপুরিকার শতাব্দীব্যাপী ঐতিহ্য বহন করতে করতে বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি নারী কোন অবস্থায় পৌঁছল? সমাজ আর অর্থনীতির চাপে তার কী পরিণতি ঘটল? মেয়েদের ওপর আরোপিত পাতিব্রত্য আর মাতৃত্বের মহিমময় সুউচ্চ আদর্শের উত্তরাধিকার এবং এই সংস্কারের অন্তরাবদ্ধ টান আর তারই সঙ্গে পরিবর্তমান বাস্তবতার বিপ্রতীপতা তাদের কোন রূপ নির্মাণ করল?

আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের যথার্থ স্থানটি কোথায় তা নির্ণয়ের চেষ্টা রয়েছে। মেয়েদের জীবনে বঞ্চনা ও শোষণের প্রকৃত চেহারা লেখিকার অজানা ছিল না। প্রত্যক্ষ বাস্তবের সেই কঠিন শানিত মুখ তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে অলিখিত থাকেনি। তাঁর কয়েকটি প্রতিনিধিকল্প ছোটগল্পের উদাহরণে বিষয়টি বিশদ করা যেতে পারে।

'পদাতিক' লেখা হয়েছে ১৩৫৬-য়। গৃহিনীপণার অগোচর ইতিহাসের কথা পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার প্রয়োজনীয়তা আশাপূর্ণা অনুভব করেছিলেন। গল্পটির অনুসরণে দেখা যাক কীভাবে তিনি রচনা করেছিলেন মেয়েদের উপেক্ষিত গার্হস্থ্য ভাষ্যটি। চাকুরিরতা শিক্ষিতা জয়ন্তীর সাম্যবাদের সঙ্গে পরিচয় থাকায়, গণ্য আর অ-গণ্যদের কথা তার জানা ছিল। এই মেয়েটির কাছে সংসার জ্বালায় অতিষ্ঠ মা সাবিত্রীর অনর্গল রাগ ও বিরক্তির কটূভাষণগুলি কুৎসিত বলে মনে হয়। মায়ের কর্মজগৎ সম্পর্কে তার প্রাথমিক ধারণাটি এই রকম "সামান্য কয়েকটা লোকের আয়োজন আয়োজন করতে .... তুচ্ছ এই সংসারটাকে সামলাতে এত বিরক্তি সাবিত্রীর? এত অক্ষমতা?" নিজের সঙ্গে তুলনায় মনে হয় 'কী হাড়ভাঙা পরিশ্রম জয়ন্তীকে করতে হয়। সে কথা কোনোদিন ভেবে দেখেছে কেউ? মাতৃস্নেহের কোমল দৃষ্টিতে না হোক সাধারণ মনুষ্যত্বের দৃষ্টিতে ও কি দেখতে পায় না সাবিত্রী? যে মেয়ে সংসারটাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে নিজেকে পিষে ফেলছে তার কানের কাছে এই নির্লজ্জ নালিশগুলো নিয়ে ক্রুদ্ধ চীৎকারে একযোগে যমকে আর ভগবানকে ডাকাডাকি করতে বিবেকে বাঁধে না?" মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা হত মেয়ের কাছে বাড়িটাই অসহ্য হয়ে ওঠে। হঠাৎ উচ্চরক্তচাপে অচল হয়ে গেলেন মা। মেয়ের উপর সংসারের বোঝা চাপল। সেই বোঝার ভার বইতে গিয়ে মেয়ে মর্মে মর্মে বুঝতে পারে তাদের শীর্ণ কঙ্কালসার মা নিজের অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে কীভাবে সচল রেখেছিলেন স্বামী, মেয়ে ও অন্যান্য সন্তানদের জীবনযাত্রা। 'মা' সম্পর্কে নতুন উপলব্ধির জন্যে উত্তরিত হয় মেয়েটি।

এই গল্প পাঠের অভিজ্ঞতা আমাদের তিনটি সূত্রে সচেতন করে দেয়। (১) অফিসের কাজের কাছে ঘরের কাজ নিতান্ত তুচ্ছ, উপেক্ষারই বস্তু। সে ক্ষেত্রে সাধারণে তো বটেই এমনকী

নিজের চাকুরীরতা মেয়েও মায়ের গৃহস্থালীর হাজারো কাজকে তাচ্ছিল্য করতে দ্বিধা করে না (২) সমকালীন সাম্যবাদী ভাবধারার সঙ্গে মিলিয়ে শোষিত শ্রমিকের জীবনের সঙ্গে এই নারী জীবনকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে— "'পদাতিক' মানে কি? .... কারা তারা? ...শুধুই কারখানার শ্রমিকরা?" (৩) সমগ্র উপলব্ধিটি এখানে ঘটেছে অপর এক নারীর হৃদয়ে। মা সাবিত্রী ও মেয়ে জয়ন্তীর প্রথমে সংঘাত পরে মায়ের অস্বীকৃত, উপেক্ষিত গৃহকর্ম সম্পর্কে মেয়ে হৃদয় বিদারক করুণ উপলব্ধিতে পৌঁছেছে। লেখিকা মা ও মেয়ের অতি নিকট সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে মেয়েদের গৃহশ্রমের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছেন।

পরিবারের নির্মম পেষণ মেয়েদের পরিণত করেছে যন্ত্রে। এই প্রসঙ্গে 'দাসত্ব' গল্পের শুভ্রাকে মনে পড়ে। এই মেয়েটি সম্পর্কে লেখিকা বলেই দেন — 'চবিবশ ঘণ্টার মধ্যে আঠারো ঘণ্টা যাকে খাটতে হয় কলের মত'। ভাড়াটের বাড়ির একফালি বারান্দা তার জীবনে মুক্তির স্বাদ নিয়ে আসে। যুদ্ধের বাজারে স্বামীর চাকরি গেলে তার সেই বারান্দাটুকুও যেতে বসে। শুভ্রা বাইরে বেরিয়ে উপার্জনের কথা ভাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক মন্দা মেয়েদের কর্মজগতে টেনে আনতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু পরিবর্তনের সূচনায় মেয়েদের অনেক প্রতিবন্ধকতা পার হতে হয়েছে। এখানে স্বামী প্রভাত শুভ্রার চাকুরি করার প্রস্তাবে বিদ্রূপে মুখর হয়ে বলেছে — 'আপত্তি? কিসের? বরং এতোদিন যে দয়া করে এ অধমের অন্ন গ্রহণ করেছো তার জন্যে কৃতজ্ঞ।' এই অন্ন গ্রহণ যে বিনিময় লব্ধ সেই প্রখর সত্য মুহূর্তে, আহত শুভ্রার চেতনায় ঝলসে উঠেছে — "কত পরিশ্রমের বিনিময়ে কত ত্যাগ স্বীকারের পরিবর্তে সে অন্ন গলাধঃকরণ করে শুভ্রা প্রভাত জানে তার ইতিহাস।" গল্পটির রচনাকাল ১৩৫৫।

পুরুষতান্ত্রিক পরিবারে মেয়েরা সব সময়ই যন্ত্রের মতো — কখনও সংসার চালানোর, কখনও সন্তান উৎপাদনের, কখনও জৈবিক চাহিদা মেটানোর। মেয়েদের মানুষী মুখটি বারবার ঢাকা পড়ে গেছে সামাজিক অবিচারের জালে। মেয়েদের না-মানুষে পরিণত করার আরেকটি গল্প 'লাল শাড়ী' (১৩৫২)।

অনাদিবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী স্বামীর কঠোর শাসনের অবরোধ থেকে মুক্তি পেয়েছে আত্মহনন জনিত মৃত্যুতে। স্বামী অফিসের কাজে বাইরে থাকায় মৃতার সৎকারের ভার গিয়ে পড়েছে পুরুষ প্রতিবেশীর ওপরে। করুণাবিহ্বল প্রতিবেশী মেয়েটির অন্তিম যাত্রায় পরিয়ে দিলেন মেয়েটির বিয়ের দামি লাল বেনারসিটি। ফিরে আসবার পর স্ত্রীর মৃত্যুতে অনাদিবাবু কিছুমাত্র দুঃখিত হন না। বরং ক্রোধ আর কুৎসিত সন্দেহে অধীর হয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে কলহে লিপ্ত হন — দামি লাল বেনারসিটি

নষ্ট হয়ে যাওয়াতে। তার চীৎকৃত ঘোষণা — " মেয়ে মানুষের আবার জিনিসের স্বত্ব কিসের? কন্যাদান করবার সময় গয়না কাপড় সবই স্বামীতে অর্শায় তা জানেন?" অনাদিবাবুর সঙ্গে লাল বেনারসির গাঁটছড়ায় বাঁধা তৃতীয়পক্ষকে ঘরের চৌকাঠ পার হতে দেখে, পুরো ঘটনাটি সেই প্রতিবেশীর স্মৃতিধার্য ব্যাখ্যায় বিশ্লেষিত হয়েছে। লক্ষণীয় এই কাহিনির কথক এবং বিশ্লেষক পুরুষটি। লেখিকা পুরুষের চোখ দিয়ে পুরুষের নির্মমতার প্রতিলিপি উদ্ধার করে নিজের প্রতিবাদটি অন্তরিত রেখেছেন।

এখানে একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন — আশাপূর্ণার গল্পপাঠে লক্ষ করা যায় — অনেক গল্পেরই কথক নারী নয় একজন পুরুষ। এই পুরুষের উপস্থিতি কখনও ঘটেছে সর্বজ্ঞ লেখক রূপে, কখনও বা পুরুষের দৃষ্টিকোণে বিষয়টির উন্মোচন ও বিশ্লেষণ ঘটেছে। জিজ্ঞাসু পাঠকের মনে হয় — পুরুষতন্ত্রের চশমাটি কখনও কখনও পরে নেওয়া তিনি জরুরি মনে করেছিলেন কেন? দৃষ্টিভঙ্গির এই বিশেষ কোণটি নির্বাচনের কারণ কী? আমাদের লেখায় তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি।

কোনও কোনও গল্পে তিনি মেয়েদের গৃহজীবনের সমস্যা কতখানি উৎপীড়ক হতে পারে তার পরিচয় দিয়েছেন। সমাজে পরিবারে মেয়েদের উৎপীড়ন ও অবমাননার বিচিত্ররূপের দলিল হয়ে আছে তার গল্পগুলি। বাড়ির পুরুষেরা উপার্জনে অক্ষম হয়ে পড়লে স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি, সন্তান পরিবৃত বৃহৎ সংসার চালানোর দায় এসে পড়ে বাড়ির বউটির ওপর। তখন উঞ্ছবৃত্তির ওপর নির্ভর করে সংসার চালানো ছাড়া মেয়েটির কোনও উপায় থাকে না। কারণ 'ধুক ধুক করা প্রাণগুলো বাঁচাতে হবে।' এর জন্য 'অঙ্গার' (১৩৫৩) গল্পের 'নতুন বৌ'-চরিত্রটি সমগ্র পরিবারের কাছে কোনও সহানুভূতি পায় না বরং স্বামী শাশুড়ীর নিয়ত সন্দেহ, কটূভাষণ তার অন্তরযন্ত্রণাকে আরও তীক্ষ্ম করে তোলে। এই নিরুপায় মেয়েটির তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে অঙ্গারে পরিণত হওয়ার যন্ত্রণা চোখে পড়ে বহিরাগত আত্মীয় সুকান্তর সহানুভূতির দৃষ্টিতে। 'অপরাধ' (১৩৫৫) গল্পের কল্যাণী স্বামী এবং পরিবারের সম্মান বাঁচাতে বড়লোক কুটুম্বের সোনার বোতাম চুরি করতে বাধ্য হয়েছে। বড়লোক আত্মীয়টির দরদি দৃষ্টিতে মেয়েটির 'নিরুপায় মনুষ্যত্বের গ্লানি' ধরা পড়েছে।

সংসারের জন্য সংগ্রাম করে চলা এই সব সাধারণ মেয়েদের জীবনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা আত্মক্ষয়ী মহিমা আশাপূর্ণার গল্পে উদ্ভূত হয়েছে।

মেয়েদের মূল্যহীনতা, দুর্গতি ও অবমাননার দিকগুলি আশাপূর্ণার ছোটগল্পে গুরুত্ব পেয়েছে। নারীর মানবিকতাবোধের পরিণাম স্থান পেয়েছে 'অনাচার' (১৩৫৯) ও 'ইজ্জত' গল্পে। পুত্রবধূ স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ লুকিয়ে রেখেছিল বৃদ্ধ শ্বশুরের কাছ থেকে — ফলে নিজের বৈধব্য সংস্কারও পালিত হল না। গভীর মমতায় উদ্বুদ্ধ মেয়েটি এই ভাবে বৃদ্ধ পিতাকে পুত্রশোকের আঘাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছে। সমাজ-মানসের মেয়েটির এই মানবিকতা বোঝার দৃষ্টিভঙ্গিই নেই — তাই শ্বশুরের মৃত্যুর পর আসল খবর প্রকাশিত হলে সুভাষ কাকিমার এই অনাচারে নিন্দা সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

'অঙ্গার', 'অপরাধ', 'অনাচার' — তিনটি গল্পেরই কথক পুরুষ কেন? পুরুষের অনুভবেই বা কেন ধরা পড়ল এই সব সাধারণ মেয়েদের অজানা মহত্ত্বের দিকগুলি? এ ক্ষেত্রে লেখিকা চেয়েছেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের দৃষ্টির সামনেই উদ্‌ঘাটিত হোক নারীর নিগৃহীত রূপ। এই নিগ্রহের ছবি তোলার দায় কোনও নারীর ওপর বর্তায় না। দ্বিতীয়ত নিগ্রাহকে ভেদ করে সত্য অনুভব করবার দায়ও পুরুষেরই। ফলে মেয়েদের অবস্থার প্রকৃত চিত্রটি এখানেও উঠে এসেছে পুরুষের সংবেদী বিশ্লেষণে।

মেয়েদের আত্মপ্রকাশের পথটি খুব সুগম ছিল না কোনওকালেই। তবে সেই বাধা কত বিচিত্র ও তুচ্ছ হতে পারে ১৩৬৩-তে লেখা 'তুচ্ছ' গল্পটিতে বলা হয়েছে। সমগ্র গল্পটি প্রকৃত পক্ষে প্রতিফলিত করেছে নারীজীবনের তুচ্ছতাকে। মেয়েদের আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা আর পারিবারিক বাধার রূপটি পদে পদে উল্লিখিত হয়েছে এই গল্পে। ভাল গান গাইবার প্রতিভা সত্ত্বেও অরুণিমার গান শেখার ইচ্ছা বাবার অনুমোদন পায়নি। জীবনে একবারই সে গান শেখবার সুযোগ পেয়েছিল কিছুদিনের জন্য মাসতুতো ভাই নীলুদার কাছে — " সেই প্রথম আর সেই শেষ হারমোনিয়ামের ছোঁয়া।..... কিন্তু কল্পনার আঙ্গুলে পৃথিবীর সমস্ত হারমোনিয়ামের রীডগুলি তো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখেছে অরুণিমা, মনের কণ্ঠে গুঞ্জন তুলেছে অজস্র সুরের।" বিয়ের পর স্বামীও স্ত্রীর এই প্রতিভাকে স্বীকার করতে অনিচ্ছুক। আর সেই সময়ের সমাজে বিশেষত মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে বা বউএর পক্ষে গান শেখার বা গাওয়ার প্রচলন ছিল না। তাই গান গাইতে চাওয়ার গর্হিত ইচ্ছাটি অরুণিমাকে গোপন রাখতে হয় শাশুড়ির কাছে। অথচ সঙ্গীতের প্রতি গভীর ভালবাসায় শিল্পী হওয়ার স্বপ্নকে মনে মনে লালন করে চলে অরুণিমা। অবশেষে বাল্কবী সুরূপা তাকে সুযোগ করে দেয় গানের জলসায় গাইবার। অরুণিমার স্বপ্ন চরিতার্থ হবার সুযোগ আসে। কিন্তু বহু অপেক্ষিত দিনটিতে কী ঘটল! একাদশীর উপবাসে শাশুড়ি চলে যান কালীঘাটে, যথাসময়ে ঠিকে ঝি কাজে আসে না — বাড়িতে চাবি দিয়ে অরুণিমার পক্ষে গান গাইতে যাওয়া সম্ভব হয় না — বড় হয়ে ওঠে পারিবারিক মূল্যবোধ। উপবাসক্লিষ্ট শাশুড়ি বাড়ি ফিরে দরজায় চাবি দেখে কী ভাববেন। উৎকণ্ঠায় অধীর মুহূর্তগুলি গুণতে গুণতে জলসার সময় পার হয়ে যায়। অরুণিমার "জীবনের

চরম সার্থকতা হাতের মুঠোয় এসে পিছলে গেলো কি না ঠিকে ঝিটা কামাই করলো বলে।" খুব তুচ্ছ বিষয়ও একটি মেয়ের আত্মপ্রকাশের পথে গুরুতর হয়ে উঠতে পারে। মেয়েদের আত্মসত্তার বিসর্জনের মূল্যেই বজায় থেকেছে পরিবারতন্ত্র।

মেয়েদের দাম্পত্যজীবনের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে 'যা নয় তাই' গল্পে (১৩৬২)। পারিবারিক নিরাপত্তার নিশ্চিন্ত আশ্রয় ও পতিপুত্রবতী নারীর সামাজিক মর্যাদা অবিচলিত রাখতে দাম্পত্য লড়াইয়ে অনেকক্ষেত্রে মেয়েরা অসম পরাজয় মেনে নেয়। গায়ত্রী ও শ্রীপতির দাম্পত্যে — স্বামী শ্রীপতির অবিশ্বাস ও সন্দেহের তাড়নায় স্ত্রী গায়ত্রী সদা শঙ্কিত। বাড়িতে পুরুষদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। অবিবাহিত গায়ত্রীর নৃত্যগীতপটীয়সী বলে খ্যাতি ছিল। স্বভাবতই এই রকম দাম্পত্য জীবনে সেই গায়ত্রী লেখিকার কথায় 'চাপা পড়ে গিয়েছিলো কবরের মাটিতে'। আট বছর বাদে তার বাপের বাড়ির পাড়ার ছেলের দল জোর করে গায়ত্রীকে নিয়ে যেতে চায় বিচিত্রানুষ্ঠানে গান গাইবার জন্য। স্বামীর শাসনে তার পক্ষে বাইরে যাওয়া সম্ভব নয় — এই সত্য গায়ত্রী প্রকাশ করতে পারে না, সামজের চোখে ছোট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়। বরং দাম্পত্য প্রেমের নানা মনোহারী অজুহাত উপস্থাপন করে সত্যকে আড়াল করে রাখতে। অবশেষে নিজের আত্মসম্মান বাঁচাতে স্বামীর শাসন উপেক্ষা করে গায়ত্রী। ক্রুদ্ধ শ্রীপতি কুৎসিত সন্দেহে, অপমান লাঞ্ছনায় অস্থির করে তোলে গায়ত্রীকে। গায়ত্রী জানে বিবর্ণ এই দাম্পত্যে ক্রীতদাসিত্ব ছাড়া কিছুই নেই। তবু সে বিদ্রোহ করে না, নিত্য আত্ম-অবমাননার যন্ত্রণার মূল্য ধরে রাখে লোক-দেখানো দাম্পত্যের গৌরব।

৫

মনুতন্ত্রের কায়েমি দুর্গ বলা যায় বাঙালি মধ্যবিত্তের পরিবারগুলিকে। অন্দরমহলের সংকীর্ণ বৃত্তে পাক খাওয়া মেয়েলি জীবনে — রীতি, সংস্কার প্রথার শিকড় প্রবেশ করেছিল সত্তার গভীরে। এরই সূত্র ধরে দেখা যাক বিশ শতকের তিন, চার, পাঁচের দশকে বাঙালি বিধবার জীবন কেমন ছিল? আশাপূর্ণারই একটি গল্পের বেকার ছেলের বিয়ের কথা উঠলে, সে নিজের অবস্থা বোঝাতে গিয়ে বলেছে — "আমরা ত তোমাদের ঘাড়ে পড়া বিধবা মেয়ে বিয়ে আবার কি?" (ধাঁধার উত্তর 'গল্প')। 'অন্যঘরে' গল্পে বিপত্নীক আর বিধবা সম্পর্কে সমাজ বিবেকের বিষমতা উঠে এসেছে একটি বাক্যে — "বিপত্নীক ছেলেকে কেউ বিধবা মেয়ের মত শুধু সজল সহানুভূতি দেখিয়ে ছেড়ে দেয় না। তাকে আবার নতুনজালে জড়িয়ে দিতে না পারা পর্যন্ত ওপরওয়ালাদের বিবেক বাগ মানে না।" 'যুগলপাত্র' গল্পে বালবিধবা, আচারে-বিচারে শুদ্ধচারিণী স্বর্ণময়ী কোনওদিন শ্বশুরঘর করেননি। তবুও শ্বশুরবাড়ির ওপর তার টানটি মজ্জাগত। ভাইপোো স্নেহাংশুকে বলেছেন — "ঘর করিনি সত্যি, কিন্তু ওই ভিটেতেই তো একদিন ধানের কাঠা মাথায় নিয়ে তোর পিসেমশাইয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দুকেছিলাম। ওর তুল্য ঠাঁই কি আর জগতে আছে রে?" — উপরের তিনটি উদ্ধৃতি বৈধব্যের তিনটি তথ্যসূত্র সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে — অর্থনৈতিক পরাধীনতা, মেয়েদের ক্ষেত্রে সমাজবিবেকের পৃথক দৃষ্টি আর নিজস্ব সংস্কারের বন্ধন।

জল আর আগুন, রাজুর মা, প্রগলভা, সংস্কার — গল্পগুলিতে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে নারীজীবনের শোচনীয় অপচয়ের কথা। সদ্যবিধবা হওয়া তরুণীকন্যা সরযূ আর স্বামীপুত্রবতী মা বিমলার জীবন প্রতিফলিত হয়েছে জল আর আগুনের উপমায়। মা ও মেয়ের অতি কাছের সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে সরযূর বৈধব্যের শূন্যতাকে লেখিকা বুঝিয়ে দিয়েছেন। মেয়ের নিরাভরণ মূর্তির সামনে সধবা মা নিজেকে সাজিয়ে তুলতে পারে না আর মেয়ে বৈধব্যের কঠিন উগ্রতা দিয়ে যেন সমস্ত মানবীয় জীবনবাসনা নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায় — "ময়লা মোটা একটা সেমিজের উপর আধময়লা সাদা থান। অঙ্গে অলঙ্কারের আভাসমাত্র নাই। লালিত্য লাবণ্য কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া গেছে।" সরযূর কঠিন আত্মসংযমের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ছিল মানবীয় বাসনাগুলি। তাই নিজের বাবা মায়ের দাম্পত্য প্রেমের আবেগ সরযূর কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। আত্মবিস্মৃত সরযূ সেই দৃশ্য থেকে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করেছে। শুধু তাই নয় যন্ত্রণাকে গোপন করে এতকালের হাসিমুখ দেখানো সরযূর চোখে জল এসেছে। তবে আত্মবিশ্লেষণের তীব্র ধাক্কায় নিজেকে সংযত করে নিয়েছে মুহূর্তের মধ্যে — "এই মনে করিয়া হাসিতে থাকে সরযূ — কপাল ভাঙ্গিয়া গেলে অনায়াসে সহ্য করা যায়, অসহ্য হয় এতটুকু ধাক্কায়।"

'রাজুর মা' গল্পে মা ও মেয়ে রাজু দু'জনেই বিধবা। একদিকে মা আচার নিষ্ঠার শক্ত বাঁধনে নিজের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছেন মেয়েকে। কিন্তু অবচেতনে স্বীকার করতে পারেন না মেয়ের জীবনের ব্যর্থতাকে। পনেরো বছরের বৈধব্য দশা মায়ের মনে বিচিত্র দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। প্রতিবেশিনী ইন্দিরার সাজসজ্জা থেকে বৈধব্য অনুমান করে বলেন —

"ও হরি মধুসূদন। বলি 'ইরি মধ্যেই পোড়া কপাল পুড়িয়ে বসে আছে।" তার সহানুভূতির কারণ — "আমার রাজুর মতনই অদেষ্ট দেখছি।" জানলার ছিদ্র দিয়ে লক্ষ করেন ইন্দিরার জীবনযাত্রা। এক দিন মেয়ে রাজুই সত্য উদ্‌ঘাটন করে — ইন্দিরা বিধবা নয় অবিবাহিত, তার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। রাজুর মুখে অন্যের সুখের সংবাদ মায়ের সহ্য হয় না, গভীর অন্তর্জ্বালায় তিরস্কার করে ওঠেন — "লোকের সুখ ঐশ্বর্য্য দেখে দাঁত বার করে হাসতে লজ্জা করে না?"

সমাজের আর একটি নিষ্ঠুর দিকের পরিচয় রয়েছে 'প্রগলভা'য় (১৩৪৯-৫০)। অনাথা বিধবাদের জীবন ছিল স্রোতের শ্যাওলার মতো ভেসে বেড়ানোর। এই গল্পের বিধবা নিরুপমা চমৎকার কথা বলতে পারে। তার বাক্‌পটুত্ব জীবনরসবোধের পরিচায়ক হলেও সমাজ তাকে নিয়ে অস্বস্তিতে ভোগে। গ্রাম সম্পর্কিত ঠাকুমা আশ্রয় দিলেও স্পষ্টবাক, বেয়াড়া এই মেয়েটির দায় বেশি দিন বহন করতে চাইলেন না। তার ভাইপো শঙ্কুর রেলে চাকুরি — সে রেলের পাসে বিনা ভাড়ায় মেয়েটিকে তার মাসির বাড়ি মোগলসরাইতে পৌঁছে দিতে পারে। অতএব ঠাকুমার আগ্রহে নিরুপমা শঙ্কুর সহযাত্রী হল। নিরুপমার কৌতূহলে প্রকাশ হয়ে যায় অবিবাহিত শঙ্কুর স্ত্রীর পাসেই তার এই যাত্রার সুযোগ। শঙ্কুর দেশ ভ্রমণে যাবার খবর শুনে মেয়েটির মনে নতুন দেশ দেখার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। কিন্তু লোকনিন্দার ভয়ে শঙ্কুর পক্ষে নিরুপ আকুতি রক্ষা করা সম্ভব হয় না। গন্তব্যে পৌঁছে মাসির হতশ্রী বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে নিরুপমা বলেছে — "কে জানে — কেমন মাসী, কেমন সব বাড়ীর লোক! হয়তো এখানেও ঠাঁই হবে না। এরাও একদিন ঠাকুমার মতো দূর দূর করে বিদেয় করে দেবে, ভেসে ভেসে বেড়াবো আবার একটু আশ্রয়ের জন্যে। বিধবার মত এমন আপদ সংসারে আর নেই শঙ্কুদা।" — অজস্র বিধবার জীবন এই রকমই ছিল — এতে কোনও অভিনবত্ব নেই। অভিনবত্ব রয়েছে গল্পের সমাপ্তি পর্বটিতে। লক্ষ করবার মতো লেখিকা তাঁর এই গল্পে নিরুর জীবনকে দাঁড় করিয়েছেন পুরুষের দৃষ্টি ও চেতনার দর্পণে। নিরুর দুর্দশায় ব্যথিত শঙ্কুর চোখ জলে ভরে গেছে, সমগ্র সমাজের হয়ে সে ক্ষমা চেয়েছে নিরুর কাছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের তাগিদটি এখানে অনুভূত হয়নি। শাস্ত্র-সংস্কার নির্দিষ্ট সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে সাধারণ পুরুষসমাজ নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে। প্রতিবিধানের দায় আছে বলে মনে করেনি। বরং সমাজধর্মের পালনই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

অনেক সময় বিধবার বিয়ে দেবার মহৎ সংকল্প প্রহসনে পরিণত হয়েছে সংস্কারের প্রবল ধাক্কায়। 'সংস্কার' (১৩৪৮) — এরই উদাহরণ। ছেলের অসুস্থতা লুকিয়ে বিয়ে দেবার সাধ অনেক মা পোষণ করেন — তারপর পুত্রের মৃত্যু বউটির জীবনে অকাল বৈধব্যের যন্ত্রণা বয়ে নিয়ে আসে। তবে এই গল্পের বৈশিষ্ট্য পিতার আচরণে নিহিত। যিনি অসুস্থ পুত্রের বিবাহের বিরোধী ছিলেন। নিতান্ত অল্প বয়সী বিধবা পুত্রবধূ শ্বশুরের মনে এতখানি করুণার উদ্রেক করে যে তিনি অন্যায়ের প্রতিবিধানে তৎপর হয়ে ওঠেন। পুত্রবধূর আর এক বার বিবাহ দিতে চান। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয় না, শ্বশুরের মনে চিরাচরিত সংস্কারই শেষ পর্যন্ত বড় হয়ে ওঠে।

এই প্রসঙ্গে আশাপূর্ণার 'আগুন নিয়ে' এবং 'আত্মসর্বস্ব' — এই দুটি গল্পের কথা বলা প্রয়োজন। এই দু'টি গল্পে লেখিকা পুরুষ অপেক্ষিত কোনও পরিবর্তনকে গুরুত্ব দিলেন না। বরং এই সত্য উপস্থাপিত করলেন যে মেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছাটি লালিত হচ্ছে মেয়েদেরই নিজের মনে। 'আগুন নিয়ে' গল্পের বিধবা মেয়েটি পুরুষের অহং ও করুণার বিবাহপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নিজের মর্যাদাকে বিবাহ সংস্কারের উর্দ্ধে স্থান দিয়েছে। আর অন্য গল্পটিতে মেয়েটি পিতৃগৃহে পরিচারিকা হয়ে থাকার নিয়তিকে অস্বীকার করে নিজেই পুনর্বিবাহের মধ্যে মুক্তি নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'নিষ্কৃতি' কবিতার মঞ্জুলিকার মতো।

নারীর বৈধব্যজীবনের সমস্যা নিয়ে লেখা আশাপূর্ণা দেবীর অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য গল্প 'ছিন্নমন্ডা' (১৩৫৪)। সার্থক এই ছোটগল্পটিতে লেখিকার সচেতন ও নিপুণ বিন্যাস কৌশল থেকে পাঠক বুঝে নিতে পারেন, বিধবার ওপর চাপিয়ে দেওয়া বিধি নিষেধ এবং পরিবার ও সমাজের মনোভঙ্গি কেমন করে মা জয়াবতীকে ঠেলে দিয়েছে মনুষ্যত্বহীনতার অন্ধকার খাদে। এখানে শাশুড়ী ও পুত্রবধূর চিরন্তন দ্বন্দ্বের দিকটি অনুপস্থিত নয়; তবে পুত্রবধূ নয়, লেখিকা এখানে বলতে চেয়েছেন শাশুড়ি জয়াবতীর কথা। সামাজিক মানুষ, নিজের সংসার বাসনাটিকে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়ে তবেই স্বস্তি পায়। তাই ছেলের বিয়ে ও পুত্রবধূকে ঘিরে মায়ের মনে কিছু স্বপ্নরঞ্জিত আনন্দ সঞ্চিত হয়ে থাকে। একমাত্র সন্তানের ক্ষেত্রে তা মাত্রাতিরিক্তই হয়ে থাকে। জয়াবতী ও তার স্বামী দু'জনেই ছেলের বিয়ে নিয়ে স্বপ্ন — কল্পনায় বিভোর হয়েছেন। ছেলের জলপানির টাকা জমিয়ে বৌ-বরণের শাড়িটি পর্যন্ত মা সঞ্চয় করে রেখেছেন। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে বিধবা জয়াবতী হিন্দু বিধবার সংস্কারানুযায়ী সমাজের সমস্ত মাঙ্গলিক কর্ম থেকে দূরে সরে গেলেন। শিল্প নিপুণা জয়াবতী সধবা জীবনে — "আশেপাশের পাড়া হইতে আমন্ত্রণ আসিত তাঁহার পূজা-পার্বণে, বিবাহ-উৎসবে। সমারোহের বিবাহে ফুলশয্যার তত্ত্ব সাজাইতে, ছানার হাঁস, ক্ষীরের মাছ, মাখনের পদ্ম, মুগের ডালের ময়ূর ইত্যাদির গঠন-নৈপুণ্যে কুটুম্ববাড়ীর লোককে তাক্ লাগাইয়া দিতে পারিতেন।" সেই জয়াবতীর নিজের ছেলের বেলায় শুভকাজে হাত দেবার অধিকার রইল না। বহুদিন যত্নে রাখা বউ বরণের বেনারসিটি অন্যের হাতে তুলে দিলেন। ছেলের বিয়ে তার কাছে হয়ে উঠল 'আনন্দহীন গুরুদায়িত্বের বোঝা'। জয়াবতী ভেবেছিলেন তিনি বউকাঁটকী শাশুড়ী হবেন না। পরের মেয়েকে আপন করে নেবেন। কিন্তু কল্পনা আর বাস্তবে ফারাক বিস্তর। জয়াবতীর ধ্যানের ধারণা মূর্তি হয়ে ঘরে এল, কিন্তু নববধূ প্রতিভার অসহিষ্ণুতা, কটুভাষণ প্রতিপদে আঘাত করতে লাগল জয়াবতীকে। নতুন বউ-এর আগমন উপলক্ষে,

জয়াবতী বহু সাধে ঘর সাজিয়েছিলেন। সেই গৃহসজ্জা নববধূর উপহাস ও ব্যঙ্গের আঘাতে ভেঙে গেল। মনে জমে ওঠা তিক্ততার ভারে পুত্রবধূ আপন হয়ে উঠল না। মা ছেলের সঙ্গেও আর হৃদয়ের নৈকট্য অনুভব করতে পারেন না — অনুভব করেন পুত্রের ওপর বধূর আধিপত্য। যৌবনের ধর্মে ছেলে বউ-এর পক্ষই নেয়, মায়ের হয় প্রতিবাদ করে না। পুত্রবধূর ওপর ঈর্ষার তাড়নায় ছেলের ঘরে আড়ি পাততে শুরু করেন। ছেলের বউ-এর সঙ্গে রুচির সংঘাত, অধিকারের সংঘর্ষ পৌঁছয় মনের সবচেয়ে স্পর্শকাতর অংশে — যখন শোনেন প্রতিভা বলছে — "আসল কথা হিংসে, বিধবারা ভারি হিংসুটে হয়, বরাবার জানি আমি। নিজেদের সাধ আহ্লাদ সব ঘুচে গেছে কি না, তাই পরের সুখ দেখলে হিংসায় প্রাণ ফাটে।" জয়াবতীর স্বভাবের পরিবর্তন ঘটতে থাকে, শীতল স্বভাব জয়াবতী অশালীন কটুভাষী হয়ে ওঠেন। শাশুড়ী পুত্রবধূর সমস্ত চরমে ওঠে খাওয়াকে কেন্দ্র করে। সজনে খাড়া জয়াবতীর অত্যন্ত প্রীতির খাদ্যবস্তু। স্বামী এবং প্রতিবেশীরা তার সেই প্রীতিকে চিরকাল প্রশ্রয়ই দিয়েছে। জয়াবতীর সেই প্রিয় খাদ্যবস্তু প্রতিভা ঠেলে সরিয়েই দেয় না, প্রখর ভাষণে বলে বসে — "তা বলে বিধবা বুড়ীদের মতন গাদাগাদা চচ্চড়ি খাবার এত সখ নেই আমার। নামিয়ে দিয়ে নষ্ট করলেন কেন, রাখলেই পারতেন নিজের জন্যে। আপনার লোভের জিনিস।" সধবা এবং বিধবার আমিষ নিরামিষ আহারের তারতম্য বৈধব্যের বুকে কাঁটার মতোই বিঁধে থাকে — সেই খাওয়াকে কেন্দ্র করে নিষ্ঠুর আঘাত ক্রমাগত কোণঠাসা হতে থাকা জয়াবতীর দাঁড়াবার শেষ জায়গাটুকুও কেড়ে নিয়েছে। আত্মরক্ষার্থে মা পুত্রবধূর প্রতি অন্ধ ঈর্ষায় হিংস্র হয়ে উঠে, পৌরাণিক ছিন্নমস্তার মতোই নিজের রক্ত নিজে পান করেছেন। বাৎসল্যনাশী হিংস্রতায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন প্রতিভার সধবার গর্ব চূর্ণ হয়ে যাওয়ার। জয়াবতীর ইচ্ছাপূর্ণ হয়েছে ছেলের আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুতে। একমাত্র ছেলের মৃত্যুতে মা উন্মাদিনী হন না — স্বাভাবিক মানুষের মতোই আবার উঠে দাঁড়ান। কিন্তু মনের অভ্যন্তরে বহন করে চলেন পুত্রবধূর প্রতি সুতীব্র প্রতিহিংসা চরিতার্থতার বিষবাষ্প।

৬.

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পরিবারে মেয়েদের ওপর অত্যাচারের বহুবিধ দিক সহজেই দৃষ্টির সামনে চলে আসে। তবে অত্যাচারিতা মেয়েদের অভাবিত মনস্তত্ত্বের সন্ধান আশাপূর্ণার রচনার বৈশিষ্ট্য। এ ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রশ্নচিহ্নিত ভূমিকাটি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে তাঁর লেখায়। দেখা যায় অত্যধিক সংস্কারবাধ্যতা মেয়েদের একটি ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য। এই সংস্কারের নিগড় সংসারের কূটচক্রে আবর্তিত হতে হতে মেয়েদের নিয়ে গেছে বিচিত্র নৈরাজ্যের জগতে, যেখানে নিরাশ্বাস পাতিব্রত্য আর সতীত্বের সংস্কার শুধুমাত্র মাদকে পরিণত হয়েছে।

'বিচিত্র' (১৩৪৭) গল্পটিতে স্ত্রী অন্নপূর্ণা স্বামী শশিভূষণের শারীরিক মানসিক নির্যাতন সহ্য করে সংসার ও সন্তানদের পালন করেছেন সর্বংসহা জননী ও গৃহিণীর মতো। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তাঁর প্রতিবাদের উপায় নেই — অর্থনৈতিক নির্ভরতার জন্য। মায়ের এই লাঞ্ছনা ছেলে-মেয়েদের বিমুখ করে তুলেছে বাবা সম্পর্কে। বড় ছেলে কান্তি এক সময় সংসার চালানোর আর্থিক ভার গ্রহণ করে — উপার্জনহীন বাবা নেশাগ্রস্ত, এমনকী ছেলের টাকা চুরি করতেও তার বাধে না। এই বিবেকহীন বাবার হাতে প্রৌঢ়া মায়ের শারীরিক নিগ্রহ ছেলেমেয়েদের দীর্ঘকাল পুঞ্জীভূত ক্ষোভের প্রকাশ ঘটিয়েছে। ছেলে কান্তি নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে মায়ের অশান্তি ও সবকষ্টের মূল বাবাকে দেশের বাড়ির নির্বাসনে পাঠিয়ে মাকে শান্তি ও স্বস্তি দিতে চায়। কিন্তু সারাজীবন স্বামীর হাতে লাঞ্ছিতা মা কীভাবে নিলেন ব্যাপারটি? তিনি স্বামীর এই অপমানকে নিজের অপমান মনে করে স্বামীর অনুগামিনী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বলেছেন — "তোমরা ফেলতে পারো ওঁকে, আমার তো ফেলবার জো নেই।" প্রায় অনুরূপ আর একটি গল্প 'বন্দিনী' (১৩৫৫)। যেখানে অত্যাচারিত নারীর অত্যাচারীর কাছে সমর্পিত চেহারাটি আরও স্পষ্টতর। পিতৃতন্ত্রের দুই প্রতিভূ বাবা ও ছেলে। শিশুবয়স থেকে বাবার হাতে মায়ের নিগ্রহ দেখতে দেখতে ছেলে শঙ্করের মনে বাবা সম্পর্কে ঘৃণা জমা হয়ে উঠেছে — " পেশীবহুল শীর্ণ মুখখানায় যেন শৃগালের ধূর্ততা। এই বাপ শঙ্করের। পিতা হি পরমং তপঃ। ধিক্কার আসে নিজের ওপর।" মা ও ছেলের অন্তরঙ্গ জগতে ছেলের কাছে মা হয়েছে রূপকথায় শোনা দৈত্যের হাতে বন্দিনী রাজকন্যার মতো, দুঃখিনী অসহায় — "বড় হয়ে অনেক বড় হয়ে — দৈত্যটাকে মেরে মাকে উদ্ধার করবার একটা দুরন্ত কল্পনা যেন পেয়ে বসে থাকতো তাকে।" এখানেও এক সময় ছেলে সংসার চালানোর দায়ভার নিয়েছে। বাবার অত্যাচার তখনও থামেনি। একদিন ঝগড়ার সময় ক্রুদ্ধ বাবার ছেঁড়া কয়লার চাপড়ার আঘাতে মায়ের কপাল ফেটে রক্ত গড়াতে দেখে ছেলের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। মা-কে মুক্ত করবার আশৈশব বাসনা চালিত ছেলে বাবা তারানাথকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করতে চায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় চিরকালের অত্যাচারিত মা ছেলেকে সমর্থন তো করেইনি বরং অন্নপূর্ণার মতো চারুবালাও স্বামীর সহগামিনী হয়েছে। ছেলের সব বিশ্বাসকে আঘাত করে যে সত্যটি উঠে আসে — "পটিবাঁধা মুখখানা চিনতে পারছে না? ..... না কি বুঝতে চেষ্টা করছে বন্দিনী রাজকন্যাকে কোন ফাঁকে এমন নিশ্চিহ্ন করে গ্রাস করে ফেলেছে ভয়ঙ্কর দৈত্যটা?"

নিদারুণ অপমান ও লাঞ্ছনা উপেক্ষা করে স্বামীপ্রেমকে বড় করে তোলার আরেকটি গল্প উর্ণনাভ (১৩৬২)। এই গল্পটিও বলা হয়েছে পুরুষের দৃষ্টিতে — যে ঘটনাচক্রে যুক্ত হয়ে পড়েছে

মেয়েটির অবমাননার সঙ্গে। তারকদা স্ত্রীকে গৃহবন্দি করে রাখেন। বাইরের মুখ পর্যন্ত দেখতে দেন না — কারণ তিনি সন্দেহবাতিকগ্রস্ত। সমাজের আর পাঁচজনে মেয়েটির এই অবস্থাকে করুণার চোখে দেখে। গ্রাম সম্পর্কিত দেওরের (যে এই কাহিনির কথক) যুক্তিজালে তারকদা স্ত্রীকে বারোয়ারিতলার অনুষ্ঠানে নিয়ে গেলেন কিন্তু ফেলে রেখে পালিয়ে এলেন বাড়িতে। স্ত্রী বাধ্য হয়ে দেওরের সঙ্গে বাড়ি এলে বিপর্যয় ঘটে। তারকদা উচ্চকণ্ঠ অপমানে স্ত্রীকে বাড়িতে ঢুকতে দিলেন না, প্রতিজ্ঞা করলেন জলগ্রহণ করবেন না তার হাতে। স্বামীপরিত্যক্তা স্ত্রীর ঠাঁই হল গোয়ালঘরে। নিরপরাধ স্ত্রী এই অপমানিত জীবন থেকে মুক্তির জন্য আত্মহননের পথ বেছে নেয়নি। বরং অটুট প্রেমে সমাজের কাছে স্বামীর শপথের মান্যতা রক্ষা করেছে লুকিয়ে রান্না করে খাইয়ে। বিস্মিত পুরুষ কথকের ভাবনার মধ্যে লেখিকা নিজের প্রশ্নটি রেখে দিয়েছেন — "এ শক্তি সত্যিই ভিতরের, না চেষ্টাকৃত? যদি সত্যি হয়, কে এই শক্তির জোগানদার।"

স্বামীর সব রকম অত্যাচার নিঃশব্দে সহ্য করে যাওয়াকে হিন্দু নারী ধর্ম মনে করে এসেছে। এমনকী অনেক সময় মুক্তির সুযোগ এলেও তাকে গ্রহণ করবার ইচ্ছাটুকুও তার মধ্যে দেখা যায়নি। কেন? পতিব্রতা নারীর সংস্কারের বহুযুগসঞ্চিত শিকলটাই তাদের অত্যাচারী অপদার্থ স্বামীর প্রতি অন্ধ আনুগত্যের কারণ হয়েছিল। শুধু কি তাই, না এর মূলে কাজ করেছিল অন্য কোনও নিগূঢ় মনস্তত্ত্ব?

এখানে শরৎচন্দ্রের অন্নদাদিকে আমরা মনে করতে পারি। সেখানে সামাজিক মূল্য দিয়ে অন্নদাদিদি হত্যাকারী বিধর্মী স্বামীর অনুগামিনী হয়েছিলেন সহধর্মিনিত্বের কারণে। শরৎচন্দ্রের রচনায় নারীর এই ত্যাগ মহত্তর বৃহত্তর আদর্শে উত্তরিত হয়েছে। আশাপূর্ণার ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গির লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি এখানে নারীকে কোনও মহত্তর ভূমিকা দেননি বরং মেয়েদের এই আচরণ-প্রচ্ছন্ন জিজ্ঞাসার অন্তর্ভুক্ত করে দেখিয়েছেন।

৭.

লেখিকার মানবী ভাবনায় অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে 'দুই নারী'। এই দুই নারী প্রিয়া বা জননী নয়। নারীসত্তার প্রকৃত অস্তিত্বকে অনস্তিত্বের অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে সামাজিক নারীর প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ নারীর যে রূপ সমাজ স্বীকৃত তা তৈরি করা। আসল সত্তাকে হত্যা করে সমাজের ছাঁচে নিজেকে ঢালাই করেছে মেয়েরা। সমাজের দেওয়া অবগুণ্ঠনের আড়ালে হারিয়ে গেছে নারীর নিজস্ব সত্তা। তার আসল মুখটির সন্ধান সমাজ বা পরিবার রাখবার প্রয়োজন বোধ করেনি কখনওই — এমনকী মেয়েরা নিজেরাও নয়। কারণ কন্যা, জায়া, জননী, গৃহিণীর আত্মঅবলুপ্তির মহিমাতেই পরিবারতন্ত্র সচল থেকেছে।

আশাপূর্ণা দেখিয়েছেন সংসার মেয়েদের দিয়েছে অভিনেত্রীর ভূমিকা। যে অভিনয়ের পালা চলে সারা জীবন। 'অভিনেত্রী' (১৩৫৮) গল্পে অনুপমার জীবন দুটি পর্বে বিন্যস্ত। কিশোরী বধূ অনুপমার মন বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে রয়েছে — "কিন্তু বৌ বলে কথা! দু'যুগ আগের বৌ," মনের কথা মুখ ফুটে বলা সম্ভব নয়। অতএব দুর্দান্ত রাগি শ্বশুরের অনুমতি আদায় করতে হয় ইচ্ছেকে অনিচ্ছার বিবেচনাবোধে ঢেকে। আর স্বামী তারানাথের অভিমানকে নিরস্ত করে রাখে মায়ের অবুঝপনার দোহাই দিয়ে। জীবন পর্বে দু'যুগের বেশি সময় পার হয়ে অনুপমা প্রৌঢ়া গৃহিণী হয়েছেন তবে অভিনয়ের পর্ব তখনও তার শেষ হয়ে যায়নি। স্বামীপুত্রের দ্বন্দ্বে 'অনুগামিনী সতী' অনুপমা পতিদেবতার মান রক্ষা করতে এখনকার ছেলেদের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। আবার ছেলের কানে এই সমালোচনা ধরা পড়ে গেলে শঙ্কিত স্নেহময়ী জননী অনুপমা ছেলের মান ভাঙাতে ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। বাপের কথা ধর্তব্যের মধ্যে আনতে নিষেধ করেন, পুত্রকে প্রবোধ দিতে চান নিজের 'মনরাখা' ভূমিকার কথা বলে। ছেলে অভিযোগে মুখর হয় — "কিন্তু কেন? তোমার নিজের একটা সত্তা নেই? ভালোমন্দ বিচার বিবেচনা নেই? যুক্তিতর্ক নেই?" এই আঘাতে মেয়েদের স্বামী-পুত্রের মন জুগিয়ে চলার আত্মবিস্মৃত অভিনয়নৈপুণ্যের আবরণ ছিঁড়ে নির্ভেজাল মানবী মুখ বেরিয়ে আসে — "যুক্তি তর্ক? অনুপমার ভিতরে যুক্তি তর্ক নেই? এত অজস্র আছে যে, তার প্রবলস্রোত সমুদ্র স্রোতের মতো ভাসিয়ে দিতে পারে বাপ-ছেলে দুজনকেই। কিন্তু ভাসিয়ে দিলে চলে কই অনুপমার? ..... বিচার বিবেচনা? সেটা যে আছে, তার প্রমাণ দিতে গেলেই তো সংসার করা কবে ঘুচে যেত অনুপমার।"

পিতৃতন্ত্রের দুই ধারক বাবা ও ছেলের যে সংঘাত তা আত্মাভিমানের দ্বন্দ্বজাত। সেখানে স্ত্রী ও জননী উভয় ক্ষেত্রেই মন জুগিয়ে চলেন। অবশ্য এক সময় মেয়েদের নিরুপায়তার কারণটি মূলত নিহিত ছিল অর্থনৈতিক অসামর্থ্যে। এই অসামর্থ্যেই নদীর মতো আপন বেগে চলবার ক্ষমতা তার নেই। স্বামী ও পুত্রের — উভয়কূলের রক্ষা করাই হয়েছে তার লক্ষ্য। কারণ তখন মেয়েটির প্রতিষ্ঠার একমাত্র স্থান সংসার। তবে গল্পের শেষে লেখিকা সমাজ বাস্তবতা নয়, প্রতিষ্ঠিত করেছেন নারী প্রকৃতির করুণাকে। যেখানে ব্যক্ত হয়েছে অহংসর্বস্ব পুরুষের প্রতি অনাস্থা ও শ্লেষ — "কোনোটাই তার অভিনয় নয়? চিরন্তনী নারী প্রকৃতির মধ্যে পাশাপাশি বাস করছে সম্পূর্ণ আলাদা দুটি সত্তা, জননী আর প্রিয়া। নিজের ক্ষেত্রে সে স্বয়ংসম্পূর্ণ। মমতাময়ী নারী তার এই বিভিন্ন দুটি সত্তার বিশাল পক্ষপুটের আড়ালে সযত্নে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে চিরশিশু অবোধ পুরুষজাতিকে।

ছলনাটা তার ছলনা নয় করুণা! ..... এই করুণার আওতা ছাড়া ছলনালেশহীন উন্মুক্ত পৃথিবীতে বে-পরোয়া শিশু ভোলানাথের দলকে যদি মুখোমুখি দাঁড়াতে হত — কদিন লাগত পৃথিবীটা ধ্বংস হতে?" নারী ছলনাময়ী এই অপবাদের উত্তর গল্পটিতে রয়েছে — যে ছলনা নিজের জন্য নয়, পুরুষেরই জন্য।

নারীসত্তার জ্ঞাত অজ্ঞাত দুটি দিককে ব্যক্ত করবার সচেতন উদ্দেশ্য নিয়েই লেখা হয়েছে 'দুই নারী' (১৩৫৩) গল্পটি। মেয়েদের অন্তরাত্মার সংবাদটি সমাজের অগোচর থাকে। বাহ্যত যে নারীকে সমাজ দেখে স্বরূপত সে ভিন্ন। মেয়েদের দুই সত্তার টানাপোড়েনের যন্ত্রণা 'দুই নারী'র উপজীব্য হয়েছে। এই গল্পটিতে সুনন্দা এবং তার সুন্দরী সহযাত্রিণী ট্রেনে অত্যন্ত অল্প সময়ের আলাপেই আত্মিক সঙ্গী হয়ে উঠেছে। মেয়েটি সুনন্দাকে নিজের স্বপ্নদর্শিনী 'বড়বোন'কে খুন করবার যে গল্পটি শোনায় তা প্রকৃত পক্ষে তারই অন্য সত্তা 'আমারই আমি'- কে ধীরে ধীরে গলা টিপে স্তব্ধ করে দেওয়ার আত্ম বিশ্লেষণী। কেন সে তার প্রকৃত সত্তাটিকে খুন করেছিল? তার উত্তরে মেয়েটি বলেছে পৃথিবীটা মাটির স্বপ্নের নয় — আর সেই বাস্তবে ঘর সংসার, অর্থ সম্পদ, প্রাধান্য, প্রতিষ্ঠা সব কিছু পেতে গেলে স্বপ্নময়ীকে নিঃশেষে মুছে ফেলতেই হয়। নারী প্রকৃতির নিজস্ব রূপটি চিরদিনই সমাজের অলক্ষ থেকে গেছে। কিন্তু মেয়েদের মন থেকে অন্য সত্তাটির বিলুপ্তি ঘটলেও বিস্মৃতি ঘটে না, তাই মেয়েটির মনে হয় — "হয়তো আমার এই সুখের ছদ্মবেশ মনকে ছলনা, হয়তো নিজের মতো করে সে-ই সুখী ছিল। কিন্তু আমিই তাকে খুন করেছি,... আস্তে আস্তে গলা টিপে।"

এখানে সমস্ত কাহিনিটি উপস্থাপিত হয়েছে সুনন্দার স্বামীর দৃষ্টিকোণে। এই পুরুষ কথককে লেখিকা পৌঁছে দিয়েছেন এক নতুন উপলব্ধির জগতে। যেখানে এই কথক নিত্যদিনের অতি চেনা স্ত্রীটির মধ্যে আবিষ্কার করেছে নিঃশব্দে লুকিয়ে থাকা অচেনা মানবীকে — "শুধু যেদিন চলন্ত ট্রেনে জ্যোৎস্না নামে সহযাত্রীরা পড়ে ঘুমাইয়া ..... সোনার কাঠির স্পর্শে জাগিয়া ওঠে ভিতরের ঘুমন্ত নারী। .... পৃথিবীর লোকের অসম্মানের ভয়ে আপনার চারিপাশে দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলিয়া তুলিয়া যে গড়িয়া রাখিয়াছে নিজের কবর। ..... হঠাৎ দেখিলে যাকে চিনিতে দেরী হয়।" মেয়েদের হৃদয় খুঁড়ে লেখিকা খুঁজে এনেছেন তার হারিয়ে ফেলা ইতিবৃত্ত।

৮.

আশাপূর্ণার ছোটগল্পে সাধারণ মেয়েদের অব্যক্ত জীবন ইতিহাস অভিব্যক্তির আলোয় এসেছে। সামাজিক ও মানবিক দলিল হিসাবে এগুলির মূল্য কম নয়।

একজন ভারতীয় লেখিকার নারী ভাবনায় মানবিকতা বিশেষ তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠেছে। নারীর সম্পর্কে সমাজের মানবিকতাবোধের সঙ্গে মেয়েদের নিজস্ব মনুষ্যত্ববোধকেও আশাপূর্ণা গুরুত্ব দিয়েছেন। ফলে মেয়েদের ওপর অত্যাচারের কথা যেমন বলেছেন তেমনই মেয়েদের দোষ-ত্রুটি, ক্ষুদ্রতা, নীচতাগুলি দেখিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হন না। ফলত তিনি চেয়েছেন মেয়েদের স্বপ্রতিষ্ঠ মানবিক উত্তরণ।

আমরা জানি লেখার মধ্য দিয়েই একজন লেখিকা সংগ্রাম করতে পারেন সমাজের জন্য। লেখিকা সমাজ সংস্কারক নন কিন্তু তাঁর লেখা হয়ে উঠতে পারে সংস্কারের নির্দেশক। তিনি সমাজ বিশ্বের বহু দর্শনের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলেন তাঁর নিজস্ব প্রতিবাদী বিশ্ব। আশাপূর্ণা যাঁদের কথা বলেছেন তাঁর ছোট গল্পে, সেই মেয়েদের জীবনে পুরাতনকে সরিয়ে দিয়ে নতুন কিছু তৈরি করা সহজ ছিল না। প্রত্যক্ষত কোনও প্রাতিষ্ঠানিকতাকে ভাঙবার কথাও ও তিনি বলেননি। শুধু তাঁর অজস্র গল্পের মধ্য দিয়ে নির্ণয় করে গেছেন নারীর সামাজিক অবস্থানের প্রকৃত চিত্র। এই ভাবেই তিনি মেয়েদের হাতে তুলে দিয়েছেন আত্মদর্শনের দর্পণটি — রূপান্তরের প্রত্যাশা করেই।

উৎস-নির্দেশ

১। আশাপূর্ণা দেবী — আর এক আশাপূর্ণা, 'অনুরূপা দেবী', মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৪, পৃঃ ২০৫।
২। আশাপূর্ণা দেবী — আর এক আশাপূর্ণা, ' খেলা থেকে লেখা', মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৪, পৃঃ ৮।
৩। তদেব, পৃঃ ১০।
৪। আশাপূর্ণা দেবী — আর এক আশাপূর্ণা, 'আমার প্রথম বই' মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৪, পৃঃ ২৩।
৫। আশাপূর্ণা দেবী — আর এক আশাপূর্ণা, 'যা দেখি তাই লিখি', মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৪, পৃঃ ১৫।
৬। তদেব, পৃঃ ১৭।
৭। সম্পাদনা: ভারতী রায়, সেকালের নারী শিক্ষা বামাবোধিনী পত্রিকা, উইমেন স্টাডিজ রিসার্চ সেন্টার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪। পৃঃ ২৩৭, ২৩৮।

ছোটগল্পগুলির সময় ও উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়েছে আশাপূর্ণা দেবী গল্প সমগ্র, মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত ১ম (১৪০৫), ২য় (১৪০৫), ৩য় (১৪০৫), ৪র্থ (১৪০৪), ৫ম (১৪০৬) ও আশাপূর্ণা দেবীর বাছাই গল্প (মণ্ডল বুক হাউস থেকে প্রকাশিত, ১৪০৪) থেকে।

গ্রন্থসমালোচনামূলক নিবন্ধ

ছকের বাইরে খোপের বাইরে : ইলিয়াসের গল্পসমগ্র

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

"আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পসমগ্র গড়ে তোলবার এক সহজ পন্থা ছিল -- কালানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে দেওয়া যেত তাঁর গল্পের বইগুলিকে। পত্র-পত্রিকার থেকে আবিষ্কৃত দু চারটে লেখাকে এখানে-সেখানে গুঁজে দেওয়া খুব একটা শক্ত হত না। কালানুসারে বিন্যস্ত এই সংকলনের মধ্য দিয়ে ইলিয়াসের রচনার ধারাবাহিক বিবর্তনটি স্পষ্ট হয়ে উঠতো। সবই হত কিন্তু 'ইলিয়াস' হারিয়ে যেতেন। যে ট্যারা-ব্যাঁকা সময়ের ভেতর তাঁর চলাচল তার অসমান ঘাতের স্পন্দনটুকু পাঠকের চেতনায় সাড়া জাগাতো না।" (অধোরেখা এই নিবন্ধকারের)

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পসমগ্রর (প্রকাশ : ২০০০ ফেব্রুয়ারি, কলকাতা) গোড়াতেই সংকলন প্রসঙ্গে নির্বাচন বিন্যাস ও সম্পাদনা সম্পর্কে এই স্পষ্ট, দ্ব্যর্থবোধবিহীন মন্তব্য করেছেন সম্পাদকদ্বয় — কৌশিক গুহ ও তরুণ পাইন। পড়ে একটু খটকাই লাগে, একটু হয়ত দুঃখও হয় : পাঠকের বোধবুদ্ধি বা গ্রহণ শোষণ ক্ষমতা সম্বন্ধে এ-রকম একটি রায় দিতে গেলে এলেম লাগে, বুকের পাটা লাগে — কিংবা হয়ত বা দুঃসাহসও লাগে। তবে সম্পাদকদের আত্মপ্রসাদের ভাবটাও আদপেই অগোচর থাকে না। আমরা অন্য রকম — আমরা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে 'হারিয়ে যেতে' দেবনা — এবং দিইনি। পঠন-পাঠনের সূত্র বা খেইগুলো আমরা এমনভাবে ধরিয়ে দিচ্ছি, যে এরপর কোনও পাঠক আর অন্য কোনও রকম ট্যাঁ ফোঁও করতে পারবে না।

এই উদ্ধৃতির পাশাপাশি আরও একটা উদ্ধৃতি ইলিয়াসের মৃত্যুর পর লিখিত অন্য একজন লেখকের রচনা থেকে তুলে দিচ্ছি, যে-লেখক ইলিয়াসের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, ত্রিশ বছর ধরে তাঁকে চিনতেন, 'কিন্তু গত ত্রিশ বছরের পরিচয়েও আমি ওর সঙ্গে কথাবার্তায় আপনির নিচে নামতে পারিনি'। সম্ভবত হাসান আজিজুল হকের এই কথাগুলো থেকে ইলিয়াস একটু অন্য রকম ভাবেই আমাদের কাছে এসে হাজির হন — একটু ফর্মাল, একটু দূরত্বও হয়ত বজায় রাখতে চান — যদি অবশ্য কেউ ধরে নেন কাউকে 'আপনি' ব'লে সম্বোধন করলেই যৎকিঞ্চিৎ দূরত্ব গড়ে ওঠে। অথচ তা কিন্তু হাসান আজিজুল হককে খুব-একটা দমাতে পারেনি।

"তবু আজ অনুজের সম্বোধনেই এই কথাগুলো লিখছি। ও কত বড় লেখক ছিল সময় তা বলবে; এদেশের রসজ্ঞ, ভাবুক পাঠক, বিদগ্ধ সমালোচকেরা বলবেন, আমিও সারা জীবন সে কথা বলব। ...এদেশের সাহিত্যশিল্পের গতিপ্রকৃতি যেমনই হোক, তার সমান্তরাল বিচার-মূল্যায়ন হতে সাধারণত দেখি না। হঠাৎ হঠাৎই হুজুগ ওঠে, অজস্র কথা ব্যয় হয়, কি মূল্যে যে বিকোয় তা অবশ্য জানা কঠিন — অনেকে নিদান হাঁকেন, প্রচুর খনার বচন তৈরি হয়, চরম আত্মবিশ্বাসে ভরা অমোঘ সব বাণী না চাইতেই ঝরে পড়তে থাকে, তার পরেই সব চুপচাপ। ... তিন মাসের জন্য এক জন লেখক বা কবি সিদ্ধির শিখর দেশে উঠে যেতে পারেন, আবার বৎসরের মধ্যেই বাতিল কুমড়ো-বেগুনের মতো হাটে গড়াগড়ি যেতেও পারেন। এ রকম দেখছি। পাঠকরা মনে করে দেখতে পারেন, প্রায় আশি সাল পর্যন্ত আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কোথায় ছিলেন, কোন কোন কাগজে গল্প-কবিতা লিখতেন, কেমন লিখতেন, কি রকম পরিমাণ ছিল তাঁর লেখার? মাঝে মাঝে মনে হয় না কি আমাদের অন্যমনস্কতা ক্ষমার অযোগ্য এবং আমাদের অতিরিক্ত মনোযোগ কোনও না কোনও ঝোঁকে পরিচালিত? আমাদের অন্যমনস্কতা অবহেলায় গিয়ে ঠেকে। তখন তাকে এক ধরনের জাতীয় অসাড়তা বলা ছাড়া উপায় থাকে না। এর দায় আমাদের সবাইকেই নিতে হবে।"

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পসমগ্র নিয়ে কথা বলবার আগে হয়ত এই কথাগুলো আমাদের নিজেদের কাছেই আরও

এক বার মনে করে নেয়া উচিত কারণ সম্পাদকদের অতিরিক্ত অথচ অহেতুক উৎসাহের আধিক্যে মনে হয় ইলিয়াসেরই ক্ষতি হবে সব চেয়ে বেশি — অন্তত এই বইটির, কেন না এখন কে না জানে, বিশেষত খোয়াবনামা বেরুবার পর, ইলিয়াস এক জন সত্যিকার বড় মাপের লেখক, অন্য রকম লেখক — এবং সম্ভবত কোনও ছোট্ট খাঁচাতেই তাঁকে আটকে রাখা অসম্ভব। বইটির পেছনের মলাটে, সত্যেন্দ্রনাথ রায় ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬-এ আনন্দবাজার পত্রিকা-য় যে-কথা বলেছিলেন তা থেকে একটা ছোট্ট টুকরো তুলে দেয়া হয়েছে, সেটা স্মরণ করে নেয়া যাক :

"আখতারুজ্জামান ইলিয়াস শুধু শক্তিশালী গল্পকারই নন, তিনি একটু ভিন্নগোত্রের এক লেখক। ইলিয়াসের দৃষ্টি চাঁছাছোলা, একেবারে পর্দা-ছেঁড়া। কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে বুঝতে হলে সেই সত্যের আলোতেই তাঁকে দেখতে হবে। ইলিয়াসের চিন্তাভাবনা, বোধ ও অনুভব একেবারেই গতানুগতিক নয়। গল্প কি উপন্যাসকে তিনি কোনও পড়ে-পাওয়া ছাঁচ বা বাঁধা প্যাটার্নের মধ্যে ফেলতে চান না।"

(নিম্নরেখা বর্তমান নিবন্ধকারের)

"পড়ে-পাওয়া" কথাটায় হয়ত দুটি অর্থের ব্যঞ্জনা লুকিয়ে আছে। পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা বা (বই) পড়ে পাওয়া বোধও অনুভব — যেটা কোনও কোনও লেখক আত্মস্থ করে নিয়ে নিজের সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ সাহিত্যের ধরা বাঁধা ফর্মুলার খাপে-খাপে এঁটে দিয়েই কোনও কোনও লেখক তাঁদের গল্প বা কাহিনি ফাঁদেন। তার থাকে আরম্ভ, মাঝখানের ঝক্কিঝামেলা সাড়ে-সর্বনাশের ইঙ্গিত, শেষটায় কোনও একটা শেষ বাক্যে সেটাকে খতম করে দেবার চেষ্টা — একটা বাঁধা খোপ, ধরাছোঁয়া যায় গণ্ডি। কিন্তু কোনও লেখক যদি তা না-হন — তিনি যদি সেটাকে সচেতনভাবেই এড়িয়ে যান, তা' হলে?

তা' হলে যা হয়, তা হল গল্পটা শেষ হয়েও শেষ হয় না। সেটা চলতেই থাকে, শেষ বাক্যের পরেও, কোনও শাদা পাতায়, পাঠকের মনের মধ্যে। কোনও ছকের গল্পে সেটা কখনও সম্ভব হতে পারে না। "মিলির হাতে স্টেনগান" গল্পে পাগল ভাল হ'য়ে গেল, কিন্তু মিলি — সে তো একটা উড়ান দেবার জন্য পা ঝাপটায়, কিন্তু সে যেখানে উড়বে সেটা কি শূন্য, সেটা কি পাতাল — সেটা কি মুক্তির যুদ্ধ? তার বাঁধা ছক? বা ধরা যাক, "রেইনকোট" — কী হয় শেষ অব্দি? এই রেইনকোট কি ভোজবাজির 'কোনও রেইনকোট নাকি? কোনও কুহক? কোনও প্রতীক? কোনও নির্দিষ্ট অর্থে সীমাবদ্ধ? পেছনের পটে সামরিক শাসন, তার জুলুম, তার সৃষ্টি করা আতঙ্ক আছে বলেই কি সেটা মুক্তিযুদ্ধের গল্প? না কি এ এক এমন রেইনকোট যেটা গায়ে দিয়েই পা তলায় মুখু ওপরে ঝুলতে-ঝুলতে কেউ আদ্যোপান্ত বদলে যায় — কলেজের ম্যাদামারা ভীরু মাস্টার থেকে হ'য়ে যায় গল্পের মধ্যে গরহাজির মিস্টুর মতো কেউ?

কিন্তু কেন এ-রকম ভাগ-ভাগ করে খোপ সাজিয়ে তাদের মধ্যে গল্পগুলোকে ফেলতেই হবে — কবে কখন লেখা হয়েছিল তার হদিশ না-দিয়ে? হদিশ যদি কিছু থাকেই তবে তা আছে বইয়ের শেষে — কবে কোন গল্পের বই বেরিয়েছিল। তাতে কী-কী গল্প ছিল, এই নির্দেশপঞ্জিতে। কিন্তু কেন কোনও পাঠক পড়তে পড়তেই আবিষ্কার করতে পারবে না ইলিয়াসের রচনা বছর থেকে বছরে আদৌ বদলে যাচ্ছে কি না, বদলালে কীভাবে বদলাচ্ছে? রচনা কোন সালে? এক থিমের মধ্যে হাতসাফাই করে অন্য অনেক আবেশ, মূর্ছনা, কাব্যজ্ঞান এবং কাব্যজ্ঞানহীনতা পুরে দেয়ায়? ভাষা — যেটা ইলিয়াস খুব ভেবেচিন্তে তৈরি করেন, কোথায় নেই থাকবে কোথায় নাই, কোথায় ইফতিকার হবে কোথায় ইফতেকার, কোথায় কলকাতা হবে আর কোনখানেই বা কোলকাতা — এগুলো কি কোনও ইঙ্গিতই দেখায় না একেকটা শব্দ নিয়ে তিনি কী ভাবেন, লোকের মুখের কথা আর কথকের বয়ানের সঙ্গে কী তফাৎ তৈরি করে দেন? কী নিয়ে লিখছি সেটা যেমন জানা জরুরি, তেমন এটাও ভেবেচিন্তে ঠিক করে নেয়া জরুরি কেমন ভাবে লিখব। ভাষাকে দিয়ে আমি কোন কাজ করাব? অনেক দিন আগে কোলোম্বিয়ার একজন লেখক, তখন সে সদ্যোযুবা, ফ্রান্‌ৎস কাফকার "রূপবদল" গল্পের প্রথম লাইনটা পড়ে চমকে উঠেছিল, না, চমকে নয়, তাজ্জব হ'য়ে গিয়েছিল, অভিভূত ও আচ্ছন্ন হ'য়ে গিয়েছিল, বুঝেছিল শুধু কতগুলি শব্দ বসিয়ে দিয়ে একটা বাক্য রচনা করে কী অভূতপূর্ব সব লৌকিক-অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে দেয়া যায়। সেখানে গল্পের ছকটা কী, বিন্যাস কেমন হল, কী সব কারদানি করা হল, কলাকৌশলই বা কী — এ সব প্রশ্ন অবান্তর। কোনও ম্যাজিশিয়ান খেলা দেখাতে এসে কখনও ফাঁক করে দেয় না তার হাত সাফাইয়ের কৌশলগুলো কী। সে কখনও বলে না, আচ্ছা, এবারে তো মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে কী ভাবি তা বলে দিলুম, এখন সংখ্যালঘুদের কণ্ঠস্বর কী শোনাই — দেখাই তাদের খোঁয়ারিটা কী রকম; এ-সব তো অনেক হল, এবার না-হয় প্রেম যৌনতা নিঃসঙ্গতা রিরংসা নিয়ে, সঙ্গে জনি ওয়াকার বা চা-কফি কিংবা ব্রা-র হুক নিয়ে বসা যাক। তা এতক্ষণ মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, ধানমণ্ডি, গুলশান অনেক হল এবার শুনুন হাভাতেদের অসুখবিসুখ কী চিজ। দুধভাতে উৎপাতই শুধু নয়, ভালবাসার কশাঘাতও সমান মারাত্মক।

ইলিয়াস কথাসাহিত্যে কোনও এক ধরনের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন — স্বাধীনতা মানে কিন্তু যথেচ্ছাচার নয়। একের ভেতরে অনেককে কীভাবে পুরে দেয়া যায়, কোনও থিমের গোলাম হ'য়ে ওভার টাইম খাটার বদলে, সেটাই বরং হাতে-কলমে করে

দেখানো যাক। না-হলে পায়ের নীচে মাটির বদলে জল খলবল করে ছুটবে কী ক'রে? এ তো আর সমাজতাত্ত্বিকের প্রবন্ধ নয় যে সোজাসাপটা ভাষায় ব'লে দেব গ্রাম-শহরের দ্বন্দ্ব, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের তফাত, গাঁয়ের জমি আর গুলশান বা ধানমন্ডির প্রাসাদের প্রতিতুলনা। শুধু এ-ওর যুগলবন্দিতেই গল্প গড়ে ওঠে না, অন্য ঘরে অন্য স্বরও শোনা যায়, অন্য অনেক রকম স্বর। এ মোটেই ট্রুম্যান ড্যাপোটের 'আদার ভয়েসেস আদার রুমস্' নয়, তারও চেয়ে অনেক বেশি কিছু।

কেননা কোথাও কোথাও তো যুগলবন্দি তৈরি হয়ে যাচ্ছে এর ওর সঙ্গে হুকুম তাঁবেদারি যোগসাজশের জন্যই। শুধু পোষা কুকুরকে ঘড়ি ধরে হাগাতে নিয়ে যাওয়াই তো নয় — স্কচের পরে রাত বিরেতে কমলালেবু কিনতে যাওয়াও তো বটে। কিংবা এই জোড়কলম উপস্থিতি যদি না-ই থাকে তবে থাকে 'প্রেমের গল্পো'র অনুপস্থিতিই — কোনটা মনগড়া অলীক বানানো আর কোনটা ডাহা বাস্তব এর মধ্যেও উপস্থিতি অনুপস্থিতির যুগলবন্দি তৈরি হয়ে যায়। বড় নোকের দুলালী বা সিনেমার নধর নায়িকাদের দেখে রিরংসা চেতিয়ে উঠলে কীই বা করার থাকে কুকুর-কুকুরীর জোড়কলম যোগসাজশ দেখে-যাওয়া ছাড়া।

আশ্চর্যও বটে, আবার ভেবে দেখলে তেমন আশ্চর্যও নয়। ইলিয়াসের প্রথম গল্পের বই পড়ে কারা ইলিয়াস সম্বন্ধে গোড়াতেই উৎসুক হয়েছিলেন — সহমর্মী বদরুদ্দিন উমর ছাড়া? সৈয়দ শামসুল হক, হাসান আজিজুল হক, আল মাহমুদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়, মুনতাসীর মামুন, আবুল হাসনাত, মাজহারুল ইসলাম, মাহবুবুল আলম। আমার নিজের কাছে প্রথম এসেছিল খোঁয়ারি আর চিলেকোঠার সেপাই — এক সঙ্গে। আর আমি বই দুটি পড়ে সত্যি চমক উঠেছিলাম, কত জনকে পড়িয়েছিলাম বই দুটি, সুবীর রায়চৌধুরীর সঙ্গে কত আলোচনাই যে হয়েছিল। তখন অন্তত আমার পক্ষে বাংলাদেশ থেকে বই জোগাড় করা সহজ ছিল না — অন্য অনেকের পক্ষেও সেই অসুবিধে ছিল। কিন্তু আখতারুজ্জামান ইলিয়াস নামে যে এক জন কথাসাহিত্যিক আছেন — এটা লোককে জানাবার জন্য বই দুটি লোককে ধার দিতে দিতে শেখটায় এক সময় বই দুটি উধাও হয়ে গেল। আমার চেয়েও ইলিয়াসের গুণগ্রাহী কেউ সে-দুটিকে তাঁর নিজের কাছে রেখে দেয়াই শ্রেয়-বলে বিবেচনা করেছেন। যে-রকম দশা ঘটতে যাচ্ছে মাহমুদুল হকের বইগুলোরও — তার একটা দুটো এখনই উধাও হয়ে গেছে। কোন কুহকে যে বইয়ের পাখা গজায়, আর স্টেনগান হাতে নিয়ে তারা যে কোন শূন্যে উড়াল দেয়!

তাই এটা ভাল যে নয়া উদ্যোগ অন্তত আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পগুলো পড়বার একটা সুযোগ করে দিয়েছেন। ইলিয়াস মারা গেছেন ১৯৯৭ এর ৪ জানুয়ারি। ১২ ফেব্রুয়ারি — যেটা তাঁর জন্মদিন ছিল — সে দিন কলকাতা থেকেই নয়া উদ্যোগের সৌজন্যে বেরিয়েছিল তাঁর এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত এক মাত্র প্রবন্ধের বই (গল্পসমগ্র-র কোথাও তার উল্লেখ নেই)। তাতে ইলিয়াসেরই আগ্রহে ভূমিকা লিখেছিলেন শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, সেই ভূমিকাটি ইলিয়াসকে জানবার পক্ষে জরুরি — মাঝখানে কোনও পর্দার আড়াল না তুলে সে বরং কতগুলো খেই ধরিয়ে দেয়। সংস্কৃতির ভাঙা সেতু কিন্তু অন্য কারণেও জরুরি — তাতে এমন কতগুলো লেখা আছে যা ইলিয়াসের সাহিত্যবোধের কথাই শুধু বলে না — অন্য যা যা বিষয়ে তাঁর ঔৎসুক্য ছিল তার কথাও বলে। ইলিয়াসের ওপর একটা তথ্যচিত্রও তুলেছিলেন অমিতাভ মালাকার — তো মুস্থইতে চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃতও হয়েছিল। ছবি যখন তোলা হয় তখন ইলিয়াসের পা কাটা গেছে — রোগের প্রকোপ সামলানোও কঠিন হয়ে পড়েছে। কিন্তু ইলিয়াসের অফুরন্ত জীবনীশক্তির প্রমাণ তবুও পাওয়া যায় যখন তাঁর গলায় আমরা নানা কথা শুনি। 'লিরিক'-এ যা শুনেছি, তারই মতো, কিন্তু তার চেয়েও বেশি, কারণ সেখানে শুধু ছাপা হরফই আমাদের সম্বল ছিল না। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে স্নাতকোত্তর স্তরে চিলেকোঠার সেপাই পড়া হয়, (শিগগিরই খোয়াবনামা পড়ানো হবে বলে শুনেছি।) ক্যানাডার টরোন্টো থেকে বেরয় বাংলা জর্নাল নামে একটি কাগজ — তাতে খোয়াবনামার প্রথম দুটি অংশের ইংরেজি তর্জমাও বেরিয়েছে। শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রায় একাট আকর গ্রন্থই প্রকাশ করেছেন ইলিয়াসকে নিয়ে, ইংরেজিতে। হাসান আজিজুল হকের মনে হয়েছিল মহাশ্বেতা দেবী বা দেবেশ রায় যেমন, খোয়াবনামা-র পর অবিসংবাদিত ভাবে মনে হয় আখতারুজ্জামান ইলিয়াস "সমকালীন পৃথিবীর প্রধান লেখকদের একজন।"

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পসংগ্রহ এমন একটা বই যা বারে-বারে পড়ার মতো — সম্পাদনার কথা ভুলে গিয়েই বারে-বারে পড়ার মতো।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পসমগ্র / নয়া উদ্যোগ — কলকাতা — ৬/ ২২৫.০০।

গ্রন্থসমালোচনা

বাঙালি মনস্বিতার এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

শিবনারায়ণ রায় আধুনিক বাঙালি মনস্বিতার এক বিশিষ্ট জ্যোতিষ্ক এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় যে রেনেসাঁস হয় একবিংশ শতাব্দীতেও তারই এক শ্রেষ্ঠ ধারাবাহী। ২০০১এর ২০ জানুয়ারিতে তাঁর আশি বছর পূর্তি উপলক্ষে তাঁর অনুরাগী ও গুণগ্রাহী ব্যক্তিবর্গ 'মনস্বী বিপ্লবী শিবনারায়ণ রায়' নামে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এতে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও আধুনিক সংস্কৃতি চর্চায় তাঁর অবদান সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়, অম্লান দত্ত, গৌরী আইয়ুব, হাসান আজিজুল হক, ভবতোষ দত্ত, মানসী দাশগুপ্ত প্রমুখ বুদ্ধিজীবী। এই সব রচনার সঙ্গে শিবনারায়ণের 'র‍্যাডিক্যালিজম' গ্রন্থটির জন্য স্বয়ং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের লেখা ভূমিকা, শিবনারায়ণের একাধিক প্রবন্ধ গ্রন্থের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কৃত সমালোচনা এবং সৃষ্টিশীল সাহিত্য হিসাবে শিবনারায়ণের কবিতার আনন্দ ঘোষ হাজরা ও উর্মিলা চক্রবর্তী লিখিত মূল্য-নির্ণায়ক আলোচনা এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এগুলির উপরে আছে শিবনারায়ণকে লেখা বার্ট্রান্ড রাসেল, এরিখ ফ্রোম, এডিথ সিটওয়েল প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসু, তৃপ্তি মিত্র, শামসুর রাহমান, নির্মলেন্দু গুণ, জয় গোস্বামী, তসলিমা নাসরিনের মতো বাঙালির বিশেষ প্রিয়জনদের মোট পঁচিশখানি পত্রগুচ্ছ। এই চিঠিগুলির উদ্দিষ্ট এক বিশেষ ব্যক্তি হলেও এগুলি সামগ্রিকভাবে এক মনস্বিতার ও সংস্কৃতিচেতনার বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। আরও আছে শিবনারায়ণের লেখা 'আত্মকথা'র প্রথমাংশের খসড়া যার প্রাতিস্বিক আধারে বিধৃত হয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। এগুলি ছাড়া কালীকৃষ্ণ গুহ কর্তৃক গৃহীত শিবনারায়ণের একটি সাক্ষাৎকার — এখানে কালীকৃষ্ণের দূরগামী প্রশ্নাবলির উত্তরে পরিস্ফুট হয়েছে শিবনারায়ণের বিশ্বতোমুখী চেতনা এবং সমকালীন বিশ্বের দার্শনিক সাংস্কৃতিক রাজনীতিক সামরিক প্রভৃতি ক্ষেত্র সম্বন্ধে শিবনারায়ণের উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ। সব শেষে আছে শিবনারায়ণের জীবন, গ্রন্থাবলি, প্রবন্ধ ও রচনাবলি সম্বন্ধে তথ্যপঞ্জি। কোনও বৃহৎ ও ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের পরিচয়কে একটি গ্রন্থের দুই মলাটের ভেতরে ধরে দেওয়ার এমন আয়োজন বাংলায় অতিশয় বিরল এ কথাটা অবশ্য স্বীকার্য। গ্রন্থের ছাপা-বাঁধাইও খুবই উচ্চাঙ্গের। শিবনারায়ণের প্রতি কৌতূহলী ও সচেতন সমাজ নিশ্চয়ই এমন একটি গ্রন্থ ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখতে উৎসুক হবেন।

কিন্তু যাঁরা শিবনারায়ণ রায়ের সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত নন, অথবা যাঁরা তাঁর সম্বন্ধে উদাসীন — যাঁদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় এই তথ্য থেকেই যে শিবনারায়ণ মৌলিক চিন্তায় সমৃদ্ধ ইংরেজি এবং বাংলায় পৃথকভাবে অন্তত চোদ্দটি করে প্রবন্ধগ্রন্থ ও ছয়টি কাব্যগ্রন্থ এবং ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে তেইশটি চিন্তা-উদ্দীপক গ্রন্থ সম্পাদনা করলেও আজ পর্যন্ত কোনও পুরস্কারে সম্মানিত হননি — তাঁরা কি আলোচ্য গ্রন্থখানির প্রতি মনোযোগী হবার সংগত কারণ পাবেন? আমি বলব, অবশ্যই পাওয়া উচিত। কারণ এই গ্রন্থখানির বিষয় শুধুই মানুষ শিবনারায়ণ নয়, মানুষটিকে উপলক্ষ করে আরও অনেক বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে, অনেক আধুনিক বিষয়ের উপর অভাবিত অবস্থান থেকে আলোকপাত হয়েছে, যে সব বিষয় আধুনিক বিশ্বে জীবনধারণের সঙ্গে অনিবার্যভাবে সম্পৃক্ত। এবং এই জীবনধারণ বিশ্বাস ও সংস্কারের অন্ধ অনুবৃত্তি নয়, নতুন নতুন পরিস্থিতির স্বরূপ সন্ধানের উত্তেজনায়, নতুন নতুন প্রতিসন্ধকতা ও প্রথাবদ্ধতার সম্মুখীন হবার যুক্তিবাদিতার প্রতিস্পর্ধায় পরিপূর্ণ। অবশ্য এই গ্রন্থটির কেন্দ্রিক বিষয় মানুষ ও তার অস্তিত্ব, তাই শিবনারায়ণের কথা বলতে গিয়ে প্রথম রচনাতেই অগ্রজ অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন, 'শিবনারায়ণবাবু যদি ঈশ্বর না মানেন তবে কিছু এসে যায় না। তিনি মানুষকে মানেন। সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'

অতঃপর অম্লান দত্ত, হাসান আজিজুল হক, স্বরাজ সেনগুপ্ত, ভবতোষ দত্ত, অতীন্দ্রিয় পাঠক, অশোকদেব চৌধুরী, রাজলক্ষ্মী দেবী প্রমুখ তাঁদের আলোচনায় শিবনারায়ণের ব্যক্তিত্বের সূত্রে মানবিক অস্তিত্বের বহুকৌণিক ব্যঞ্জনাকে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেছেন এবং এই লেখাগুলি কোনও-না-কোনওভাবে বিংশ শতাব্দীর সান্ধ্যলগ্নে বাঙালি মনীষার স্বরূপ অনুধাবনে অশেষ মূল্যবান। বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে মার্কসবাদের পরাক্রান্ত প্রভাব ক্রমশ মানবেন্দ্রনাথ রায়ের স্বৈপ্লবিক মানবতন্ত্রে কীভাবে রূপান্তরিত হয় এবং সেই প্রক্রিয়া কীভাবে শিবনারায়ণকে প্রভাবিত করে তার বৃত্তান্তের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে 'মনস্বী বিপ্লবী' শব্দবন্ধের যথার্থতা। মার্কসবাদ ও মানববাদের প্রেরণায় ধর্মীয় বা বংশীয় বা দেশীয় সংস্কার থেকে নিরপেক্ষভাবে বৈপ্লবিক

মনস্বিতার পথে মৌল মানবিক সত্তার সন্ধানে শিবনারায়ণের দুঃসাহসিক পর্যটনের দৃষ্টান্তকে এই সব লেখক নিখুঁত নানা কোণ থেকে অবলোকন ও উপস্থাপন করেছেন। স্বভাবতই রেনেশাঁস-ও-মানবতন্ত্র-নিষ্ঠ এই রচনাগুলিতে আছে পাঠক পাঠিকার প্রতি প্রথাসিদ্ধ চিন্তাবৃত্তের বাইরে পদার্পণে উৎসাহদান এবং প্রাপ্ত প্রত্যয়গুলি যুক্তির নিরিখে যাথার্থ্য বিচারে প্রবৃত্তিকরণ অর্থাৎ শিবনারায়ণের উদাহরণে উদ্বুদ্ধ হবার প্ররোচনা।

আর-এক ধরনের রচনায় গীতা রায়, শুভাপ্রসন্ন, প্রকাশ কর্মকার, গৌরী আইয়ুব, মানসী দাশগুপ্ত, গৌরকিশোর ঘোষ, মাধুরী সিংহ, শাঁওলী মিত্র প্রমুখেরা স্মৃতিচারণের প্রসঙ্গে শিবনারায়ণের ব্যক্তিচরিত্রের বিবরণ দিয়েছেন। শুভাপ্রসন্নর স্মৃতিতাধান ছোট্ট রচনাটির একটি হঠাৎ-আসা মূল্যনির্ণায়ক মন্তব্য আমার কাছে উদ্ধৃতিযোগ্য মনে হয়েছে ঃ 'যিনি শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, যিনি ব্যক্তিজীবনে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলেন, সর্বোপরি একজন প্রকৃত মানবপ্রেমী যিনি — তিনি নিঃসন্দেহে ধার্মিক।' এই গ্রন্থের মানবিক মাত্রা এক অভিনব বর্ণাঢ্যতা লাভ করেছে স্বয়ং শিবনারায়ণের 'যে আলোকে অনেক আঁধার' নামক আত্মকথার প্রথমাংশের খসড়ায়। এখানে তাঁর জ্ঞানচর্চায় ও চরিত্রগঠনে বাবা-মায়ের, সাহিত্য সংস্কৃতির অনুরাগে বন্ধুদের, জিজ্ঞাসু ও বিদ্রোহী চেতনার বিকাশে অনাত্মীয় অগ্রজদের প্রভাব কীভাবে কাজ করেছে তার কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ আছে। শিবনারায়ণের ভাষায় সরসতার অপেক্ষা স্বতন্ত্রতা বেশি, বিস্ময়কর তাঁর শব্দের ঐশ্বর্য, অবশ্য তার ফলে তাঁর ভাষা সহমর্মী পাঠকের কাছেও কখনও কখনও দুর্বোধ্য ঠেকে। তাঁর কাছে এই সুবাদে আমাদের অনুরোধ জানাই যে আরদ্ধ আত্মকথা তিনি সম্পূর্ণ করুন, কারণ এই খসড়া রচনাতেও তাঁর আবিষ্কৃত শব্দাবলির দুরধিগম্যতার ওপারে বিস্তৃত আধুনিক মানবসত্তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

মনস্বী বিপ্লবী শিবনারায়ণ রায় — সম্পাদক স্বরাজ সেনগুপ্ত ও কানাই পাল/প্রকাশক শিবনারায়ণ রায় অশীতিতম জন্মদিন উদ্‌যাপন সমিতি, কলকাতা-৭৩/২২৫.০০।

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি অনুবাদ

দিলীপ মুস্তাফি

নিজের লেখা কবিতার বেশ কিছু নিজেই ইংরেজিতে অনুবাদ করে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমি পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন তাঁর কাব্যভাবনা, Gitanjali বা Offering of songs প্রথম প্রকাশেই বিস্মিত, মুগ্ধ করেছিল যাঁদের তাঁরা অনেকেই প্রতিষ্ঠিত কবি অথবা লেখক, ডব্লিউ বি য়েটস্ যাঁদের অন্যতম।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভের আগে পরেই কিন্তু উল্টো হাওয়া বইতে শুরু করে ;আরম্ভ হয়ে যায় পুর্নমুল্যায়ণের পালা। ভাব ও ভাবনার ক্ষেত্রে ওঠে অনতিস্পষ্টতার অভিযোগ। চোখে পড়তে থাকে ভাষান্তরের ইংরেজি-জনিত ত্রুটি।

প্রয়াত অধ্যাপক সৌরীন্দ্রনাথ মিত্র 'খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে' নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের প্রথমার্জিত কবিখ্যাতির অবতরণরেখা নির্দেশ করেছিলেন সযত্ন তথ্যনিষ্ঠায়। সৌরীনবাবুর বাস্তব বিশ্লেষণ সম্পর্কে কঠোর উদাসীনতার মনোভাব নিয়ে শ্রীযুক্ত চঞ্চল ব্রহ্মরচিত "ইংল্যাণ্ডের দিকপ্রান্তে : রবির উদয়, রবির অস্ত"।

চঞ্চলবাবু কবির ইংরেজি অনুবাদের মূল্যবিচারে একক নন। ভারতবর্ষে এবং পশ্চিমবঙ্গে (বাংলাদেশ এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম) কোনও কোনও লেখক-লেখিকা রবীন্দ্রনাথের ভাষান্তরে ইংরেজি-জনিত ত্রুটি নির্ণয় করার ব্যাপারে সযত্ন। যেন রবীন্দ্রকাব্যের অসামান্য আবেদন নিখুঁত ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমেই চিরকালীন স্বীকৃতি পেতে পারত ইংরাজ-চিত্তে।

চঞ্চলবাবুর কথায় আসি। গবেষণা-সুলভ নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে নিজ বক্তব্যের সপক্ষে তিনি সওয়াল করেছেন। লেখকের পাঠের পরিধি বিস্তৃত। ইংরাজি সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে ফরাসি ও অন্য ইউরোপীয় সাহিত্যেরও উল্লেখ আমরা পাই। এই দিক থেকে "ইংল্যাণ্ডের দিকপ্রান্তে রবির উদয়, রবির অস্ত" প্রায় একটি আকর গ্রন্থ বলা চলে।

অনেকখানি জায়গা নিয়ে ছড়ানো পশ্চাৎপটে লেখকের আলোচনার আওতায় নানা আঙ্গিকের সমাবেশ। রবীন্দ্র কাব্যরচনার ইংরাজি-অনুবাদ প্রসঙ্গে অন্যান্যদের পাশাপাশি কবি নিজেও আছেন সেখানে; রোমান্টিকও ভিক্টোরীয় ইংরাজি কবিতার স্মৃতি-বাহিত অনুষঙ্গ রবীন্দ্রনাথের ভাষান্তরে, ইংরাজি সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায়ের কাব্যরীতি-বিশ্লেষণ, বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের ইংরাজি কাব্যের মনন, দর্শন, অধ্যাত্মভাবনার পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের আকস্মিকভাবে অনুকূল ও সুসমঞ্জস অবস্থান কিছুই বাদ পড়েনি। সমস্যার শুরু এইখানে। বহুবিধ বিষয়ের অবতারণায় লেখকের বক্তব্যসূত্র কোথাও কোথাও আচ্ছন্ন The wood is lost among the trees.

আরও একটি কথা, হয়ত ফেলে দেওয়ার মতো নয়। সমস্ত বৈদগ্ধ্য ও কাব্যমনস্কতা সত্ত্বেও কোথায় যেন অপূর্ণ মনে হয় লেখকের উদ্যোগ, সাহিত্য-সমালোচনার সাবলীল আকর্ষণ, কেন জানি না, অনুপস্থিত লেখকের বহু-প্রমার্জিত সত্যসন্ধানে।

বাংলা শব্দের একনিষ্ঠ প্রয়োগ সহজ অবগতির পথে কখনও কখনও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে 'প্রস্বর', 'শ্বাসাঘাত'; ব্যাহত হয়েছে অনুধাবন অপরিচিত বাক্যবন্ধে, যেমন 'অস্ফল নৈপুণ্য' 'সান্দ্র বিশ্বাস'।

এতদসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ সম্পর্কে চঞ্চলবাবুর একান্ত অনুভব আমাদের স্পর্শ করে একাধিকবার। উপলব্ধির যাথার্থ্যে আমরা আনন্দিত হই — "ইংরিজি গীতাঞ্জলিতে অনুবাদের অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে অনুবাদ হতে চায় মূলের প্রতিবিম্ব, তার প্রতিলিপি কখনই নয়।" (পৃ. ৪৩)

সার্থক অনুবাদের দৃষ্টান্ত হিসাবে গীতাঞ্জলির ৩৪ নং কবিতাটি তিনি বেছেছেন যার আরম্ভ হল "Let only that little be left of me whereby I may name thee my all". লেখককে সাধুবাদ জানাই।

কিন্তু উপরিউক্ত উদাহরণের পাশাপাশি অথবা পূর্বাপর, ছড়িয়ে ছিটিয়ে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি অনুবাদ সম্পর্কে লেখকের অজস্র অনুযোগ। ইংরেজ কবিদের কবিতা হতে সমান্তরাল উদ্ধৃতির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের উপর চঞ্চলবাবু বার বার চাপিয়েছেন অকারণ স্মৃতি-নির্ভরতার দায়ভার। নান্দনিকভাবে আমরা যার কয়েকটাই অযথার্থ বলে মনে করি। 'গীতাঞ্জলি'-র "If the day is done if the birds sing no more if the wind has flazzed tired then draw the veil of darkness thick upon me."

আন্তর আকুতির সঙ্গে কিটস্ এর "লা বেল দাম শাঁ মেরসি'র (LaBelle Dam Sans Merci) মেলবন্ধন খুঁজেছেন শ্রীযুক্ত

ব্রহ্ম। রবীন্দ্রনাথের 'বেলাশেষের অবসাদ' (লেখকের নিজের ভাষা) আর কিটস-এ সান্ত্বনা-বিরহিত বিত্তক্ত নৈরাশ্যকে এক জায়গায় আনা যায় কি?

তেমনই গীতাঞ্জলির প্রথম কবিতার "This little flute of a reed thou hast carried over hills and dales, এর শুধু over hills and dales বাক্যাংশের মধ্যে চঞ্চলবাবু Wordsworth এর সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের The Daffodils কবিতার our vales and hills শব্দ চতুষ্টয়ের ঋণযোগ্য উত্তরাধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন। কোনও মিল থাকলে, সেটা নিতান্তই আকস্মিক ও অকিঞ্চিৎকর, পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত সমার্থবোধক ক'টি শব্দের মধ্যে গূঢ় কিংবা অনিবার্য কোনও সাদৃশ্য সন্ধান করায় কোনও প্রয়োজন সাধিত হবে না, অকারণ পরিশ্রম হবে খানিকটা। এতদ্‌ভিন্ন রবীন্দ্রনাথের লেখা পংক্তির মূল সুরটি ধরা আছে This little flute of a reed I have carried বাক্যবন্ধে This little flute of a reed কী? জীবন, হৃদয়, স্মৃতি অথবা অব্যক্ত কোনও উপলব্ধি?

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি অনুবাদের শব্দসারল্য ও ধ্বনিব্যঞ্জনার পাশে শ্রীযুক্ত ব্রহ্ম উপস্থাপিত করেছেন আলেকজান্ডার পোপের কবিতার ছত্র, আশ্চর্য সংযমে সীমিত বদ্ধপক্ষ কোনও বিহঙ্গম। লেখকের প্রতিপাদ্য সারল্যের উন্নততর নিদর্শন পোপের কবিতায়, রবীন্দ্রনাথের নির্ধরপ্রতিম স্বচ্ছ শব্দপ্রবাহে নয়।

চঞ্চলবাবুর গ্রন্থের উৎকর্ষ ব্যাহত হয়েছে স্বীয় প্রতিপাদ্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রে একদেশদর্শী ব্যগ্রতায়। তবু বলতে বাধা নেই ভাবার মতো, ভাবানোর মতো উপাদানে গ্রন্থটি সমৃদ্ধ, বিতর্কিত হলেও।

ইংল্যেণ্ডের দিকপ্রান্তে রবির উদয়, রবির অস্ত — চঞ্চলকুমার ব্রহ্ম/এষণা, কলকাতা — ৭৫/১০০.০০

সাংবাদিকের চোখে সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ

মুকুল গুহ

কোনও একজন লেখক-সম্পাদকের সাংবাদিকতার জীবন নিয়ে লেখার চল আমাদের দেশে বিরল। তার চাইতে বিরলতর বোধহয় ওই রকমের বিষয় নিয়ে একজন সাংবাদিকের উৎসাহ এবং একটি গ্রন্থরচনার পরিশ্রম স্বীকার। মনে পড়ে না শেষ কবে এ রকম একটি গ্রন্থ হাতে পেয়েছি। তাই আলোচ্য গ্রন্থটি পেয়ে যৎপরোনাস্তি কৌতূহলী হয়েছি। কৌতূহলের আর একটি কারণ গ্রন্থটির বিষয় রবীন্দ্রনাথ। এবং লিখেছেন এই সময়ের একটি দৈনিক সংবাদপত্রের একজন সাংবাদিক পবিত্রকুমার সরকার। সাংবাদিকের একটি অতিরিক্ত দায়বদ্ধতা আছে। সেই দায়বদ্ধতার পালনে যত্নবান হওয়াটাও জরুরি। সম্ভবত সেটা মনে রেখেই পবিত্র গ্রন্থটি রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। এ রকম একটি দায়িত্ব পালনের পরিশ্রমের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারার জন্য সাংবাদিক হিসাবে পবিত্রকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই।

অবশ্য আরও কয়েকটি কারণে পবিত্র নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ। বিংশ শতাব্দীর উত্তরাধিকার সূত্রে একবিংশ শতাব্দীতে আমরা মূল্যবোধের নবমূল্যায়নের যে পরিণতি লক্ষ করে শিউরে উঠছি, সেই পরিণতিতে 'অ্যাগ্রেসিভ', 'গো গেটার' কিংবা 'মি অ্যালোন' — ইত্যাদির পশ্চাদপটে 'ডাবলস্পিক'-এর স্বীকৃতি সহজলভ্য। মিডিয়ালভ্যও তো বটেই। সেখানে সাংবাদিকতার দায়বদ্ধতা যে 'ডাবলস্পিক'-এর ব্যঞ্জনবর্ণই একমাত্র নয় তার প্রমাণ হিসাবে 'রবীন্দ্রনাথ'-কে স্মরণ করার মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে। কৃতিত্ব তো অবশ্যই রয়েছে। বিষয়টির প্রাসঙ্গিকতা উপেক্ষা করার কোনও সুযোগই আর নেই। গ্রন্থটি ১৫টি অধ্যায়ে বিস্তৃত: সাময়িকপত্র সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ও তার সাংবাদিকতা; সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও রবীন্দ্রনাথ; সম্পাদনার কালপর্ব ও সামাজিক - রাজনৈতিক প্রেক্ষিত; সাধনা; ভারতী; বঙ্গদর্শন; ভাণ্ডার; তত্ত্ববোধিনী শান্তিনিকেতন ও অন্যান্য পত্র; পরিশিষ্ট ১-৬ ইত্যাদি। লেখকের কথা ছাড়াও গ্রন্থটির মুখবন্ধ রচনা করেছেন ইতিহাসবিদ অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থটি পাঠ করার সূচনাপর্বে আগ্রহী পাঠকদের নজর করা দরকার, এমন কয়েকটি ইঙ্গিতবহ মন্তব্য করতে গিয়ে ড. চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন — "পবিত্র সরকার খুব সংক্ষেপে ব্রিটিশ শাসিত ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সপক্ষে সংগ্রামের ইতিহাসকেই প্রধানত বিবৃত করেছেন। অ্যাডামের ফতোয়ার বিরুদ্ধে রামমোহন ও তার বন্ধুদের বলিষ্ঠ প্রতিবাদকে তিনি ইংলিশ বিপ্লবের প্রাক্কালে স্বৈরাচারী রাজা প্রথম চার্লসের বিরুদ্ধে ইংরেজ মহাকবি জন মিলটন রচিত 'অ্যারিওপ্যাজটিকা'-র সঙ্গে তুলনা করেছেন। উনিশ শতকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও উৎপীড়নে দুর্ভিক্ষে, অর্ধাহারে, অনাহারে দারিদ্রে ভারতের মানুষ কি রকম দুর্গতির মধ্যে পড়েছিলেন, মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা ও ইংরেজ সরকারের অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করে তিলকের প্রবন্ধ — এবং তার জবাবে ইংরেজ সরকার তিলককে যে কারাদণ্ড দিয়েছিলেন — এসব কথাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। তিলকের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে বাংলাদেশেও তার মামলাতে অর্থ সাহায্য করার জন্য যারা উদ্যোগ নেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ... এবং ভবিষ্যতে মৌলবাদীদের উত্থান ভয়ে চিন্তিত রবীন্দ্রনাথ যখন লিখলেন, — ... আমাদের একটা মস্ত কাজ আছে হিন্দু মুসলমান সখ্য বন্ধন দৃঢ় করা। অন্য দেশের কথা জানিনা, কিন্তু বাংলাদেশে যে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সৌহার্দ্য ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন হিন্দুয়ানী অকস্মাৎ নারদের ঢেঁকি অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে....।" ইত্যাদি।

এখনকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোতে এই দুটি প্রেক্ষিতই গুরুত্বপূর্ণ। একটি অবিসম্বাদিত কারণ - ঔপনিবেশিকতার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন হওয়া, তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রসারিত হাতে হাত রাখার চেষ্টা করা অন্যটি ধর্মীয় সহিষ্ণুতা — যে দুটিই স্পষ্ট ভাষায় রবীন্দ্রনাথের সাংবাদিকতার একদা বিষয় হয়ে প্রমাণ করেছিল যে সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ উল্লিখিত সামাজিক দায়বদ্ধতা আর জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে কতটা সনিষ্ঠ। কতটা আগ্রহী ছিলেন। পবিত্র ঠিকই লিখেছেন যে, - '... পত্রিকা সম্পাদনা ছাড়া সাংবাদিকতা নিয়েও রবীন্দ্রনাথ বেশ তলিয়ে ভেবেছেন। চটুল ও তরল সাংবাদিকতার সমালোচনাও করেছেন। তিনি সৎ, নির্ভীক সাংবাদিকতার পক্ষে ছিলেন। একথা ঠিক, কবিকে কোনোদিন সংবাদপত্র দপ্তরে বসে সংবাদ রচনা করতে হয়নি বা তিনি কোনোদিন নোটবই, পেন্সিল, ভয়েস রেকর্ডার নিয়ে সংবাদের পিছনে ছুটে বেড়ানি। কিন্তু দেশবিদেশের সংবাদ ও পত্রপত্রিকার জগতটি তার আয়ত্তে ছিল।'

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনা কিংবা সাংবাদিকতা তেমন নতুন খবর কিছু নয়। রবীন্দ্রচর্চা এবং রবীন্দ্রঅচর্চা কোনওটাতেই আমাদের ঘাটতি নেই। পঞ্চাশের দশকে পায়ের ধাক্কায় রবীন্দ্র রচনাবলি পড়ে যাওয়ার কবিতা আমরা যেমন পাঠ করে ব্যথিত হয়েছি, তেমনিই ব্যথিত হয়েছি সেই তাদেরই নতুন সমীকরণে দেবতার আসনে রবীন্দ্রনাথের ছবি টাঙিয়ে পুজো করার প্রহসন দেখে। রবীন্দ্রনাথকে ভাঙিয়ে গায়ের গয়না গড়ানোর গল্পও কম নেই। এহো বাহ্য। যে কথা বলছিলাম যে রবীন্দ্রনাথের সাংবাদিকতার কাহিনি নতুন না হলেও, পবিত্র যে দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন সেটার প্রয়োজন ছিল। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের সাহসী প্রতিবাদ আর এক বার মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। পবিত্র সেটাই করার চেষ্টা করেছেন। এবং সেই ব্যাপারে তাঁর উদ্দেশ্যও সহজ এবং স্পষ্ট। জোর করে শত ব্যাখ্যানের মাধ্যমে 'অ্যা'-ও হয়, 'ও'-ও হয় এ রকম স্টাইলে মাস্তুলহীন রচনা নয়। সে সব ভেবেই হয়ত পবিত্র লিখেছেন, "...এমন দুরন্ত ভাষায় ইংরেজ সরকারের এমন নির্ভীক সমালোচনা সে আমলের পত্র পত্রিকার পাতায় আর চোখে পড়েনি (কণ্ঠরোধ)। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সপক্ষে কবির ঐ জোরালো বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা আজও সমভাবে বিদ্যমান।..." রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেন ইংরেজ না চাইলেও ইংরেজ শাসনেই ভারতের অখণ্ড স্বদেশ রূপটি ফুটে উঠেছে। কিন্তু ইংরেজ যখন বুঝল তাদের শাসনের পরোক্ষ ফল আর যাই হোক তাদের দেশশাসনের সহায়ক নয়। তখন থেকেই তাদের একটিমাত্র প্রচেষ্টা হল ভারতের এই জাতীয় ঐক্যসূত্রটিকে ছিন্ন করা। এ উদ্দেশ্যে নানান বিভেদমূলক পন্থা গ্রহণ করেছিল ব্রিটিশ সরকার। সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল ভাষা বিচ্ছেদ। অসম, ওড়িশা ও

বাংলার মধ্যে সুস্পষ্ট ভাষাগত মিল লক্ষ করেছিলেন কবি। এক সময়ে তিনটি অঞ্চলের শিক্ষিতদের ভাষা ছিল বাংলা। ইংরেজ সরকার যখন এই ভাষাগত যোগসূত্রটি অত্যন্ত অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে ছিন্ন করতে চাইল তখন তার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'-র পাতায় লিখছেন 'ভাষাবিচ্ছেদ' প্রবন্ধ। বলা বাহুল্য এই তিনটি বিষয়েই বিষবৃক্ষ আজ মহীরূহ হয়ে আমাদের সূর্যস্নাত হতে বাধা দিচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সাংবাদিকতার জীবন সব মিলিয়ে খুব বেশি দিনের নয়। কিন্তু সেই স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি – পুরনো পত্রিকাগুলির কয়েকটিকে নতুন জীবনদান করেছিলেন এবং নতুন পত্রিকার উদ্বোধন করেছিলেন। কবির নির্দেশিত মূল্যবোধের অভিধা স্পষ্ট হয়েছিল প্রমথ চৌধুরী এবং 'সবুজপত্র' পত্রিকায়। একজন সাংবাদিকের জীবনে এর সার্থকতা অপরিসীম। ওই তিন বিষবৃক্ষের বিপরীতে রবীন্দ্রনাথের রোপন করা আদর্শ, দায়বদ্ধতা ও মূল্যবোধের বীজগুলিও আজ পল্লবিত হয়েছে। সেই পল্লবিত সম্ভাবনাই ছিল সম্ভবত পবিত্র-র এই গ্রন্থটি রচনার উৎস এবং প্রেরণাও। সেই কাজে পবিত্র নিঃসন্দেহে সফল।

গ্রন্থটিতে সম্পাদনার সুযোগ রয়েছে। রয়েছে একই বানানরীতি অনুসরণ না করার অসুবিধা। তবু এ সব সত্ত্বেও গ্রন্থটি সচেতন মানুষদের আকর্ষণ করবে বলেই মনে হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে নিশ্চয়ই লেখক এই সব গৌণ ত্রুটিগুলি শুধরে নেবেন।

সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ – পবিত্রকুমার সরকার/বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা – ৬/৬০.০০।

বিধ্বস্ত স্বাধীনতা

ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একদা দুঃখ করে লিখেছিলেন, "প্রাচীন চীন, অসভ্য জাপান/তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান/ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।" চিন তো প্রাচীন বটেই, কিন্তু জাপান কেন অসভ্য বোঝা কঠিন। তা, সে যাই হোক, প্রাচীন কিংবা অর্বাচীন, সুসভ্য কিংবা অসভ্য, যে কোনও জাতিই স্বাধীনও হতে পারে, আবার নানা ঐতিহাসিক কারণে পরাধীনও হতে পারে। এবং পরাধীন জাতি যখন স্বাধীন হয়, সে স্বাধীনতাও নানা ভাবে আসতে পারে। সব ক্ষেত্রেই যে তার জন্য প্রবল সংগ্রাম করতে হয়, অনেক দেশপ্রেমিককে আত্মবলিদান দিতে হয়, ইতিহাস তা বলে না। যে-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে একদা সূর্য অস্ত যেত না, তার বিলোপের কাহিনি কোনও সরলরেখা ধরে এগোয়নি।

এই গেল একটি অনস্বীকার্য সত্য; তেমনই আরেকটি সত্য হল, স্বাধীনতা পেলেই যে চতুর্বর্গ লাভ হয়, অন্তত হওয়া উচিত, এবং তা না হয়ে থাকলে স্বাধীনতাটাই মেকি সেকেন্ড-হ্যান্ড গাড়ির মতো ভাঙা ঝরঝরে, অচল, এমন ধারণা, বহুল প্রচলিত হলেও, ভ্রান্ত। আসলে স্বাধীনতা শব্দটি ঘিরে আমরা যতই স্বর্গ পরাধীনতার কালে রচনা করে থাকি, (তাতে অস্বাভাবিকতাও কিছু ছিল না, কেন না পরাধীনতায় মনুষ্যত্বের এমন অপমান যে তা থেকে মুক্তিলাভের চেয়ে বড় কাম্য আর কিছু থাকতে পারে সেই অবস্থায় মানুষের পক্ষে কল্পনা করা কঠিন) এত দিনে অন্তত বুঝবার সময় এসেছে যে স্বাধীন হওয়া মানে হাতি-ঘোড়া কিছু নয়, তাতে শুধু এইটুকুই বোঝায় যে একটি দেশ নিজেদের শাসনের ভার নিজেদের হাতে পেল। তারপরে? Every country get the government it deserves. সিয়েরা লিওনও স্বাধীন, শ্রীলঙ্কাও স্বাধীন, সিঙ্গাপুরও স্বাধীন। ফিলিপিনস স্বাধীন, আবার সে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের একটি সন্ত্রাসবাদীগোষ্ঠী আলাদা করে স্বাধীনতা চাইছে। যেমন দাবি ইন্দোনেশিয়াতে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের কারণ, স্পেনেও অনেকদিনের পুরনো। ভারতে তো আছেই। অবিভক্ত অবস্থায় যদি ভারত স্বাধীন হত, তারপরেও পাকিস্তানের দাবি উঠত না এবং পাকিস্তানের জোরালো দাবির দেখাদেখি গোর্খাল্যান্ডের এবং শিখিস্তানের দাবিও আরও প্রবল হত না কে বলতে পারে? প্রশ্নটা এখানে স্বাধীনতা-পরাধীনতার নয়, কোন জাতি গোষ্ঠী-চেতনা, গ্রাম্য-মনোবৃত্তি, parochialism পেছনে ফেলে আধুনিকতার পথে কতদূর এগোতে পেরেছে, তার। পরাধীন ভারতেই বঙ্গদেশ এ পথে যতটা এগিয়েছিল, অন্য কোনও কোনও প্রদেশ পারেনি, তাই, বিচ্ছিন্নতাবাদ না হলেও, বর্ণভেদচেতনা, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি বিচ্ছিন্নতাবোধের যে-সব ইন্ধন, তার সরবরাহ এখনও পশ্চিমবঙ্গে অপেক্ষাকৃত কম।

কল্যাণ মিরবর ভারতের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির রাজনৈতিক প্রক্রিয়াটার যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে এমন তথ্য কিছু নেই যা আমাদের জানা ছিল না। মোটামুটি সে-ইতিহাস খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে এই রকম :

১৯৪৪ সালে স্বাস্থ্যের কারণে বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়েই গান্ধী জিন্নার সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। বিফল আলোচনা, মুসলিম লিগের পাকিস্তানই চাই, ১৯৪৫-এর মার্চে ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেল লন্ডন থেকে একটি প্রস্তাব নিয়ে ফিরে এলেন :

তাঁর কাউন্সিলের একমাত্র কমান্ডার-ইন-চিফ ছাড়া আর সব সদস্য ভারতীয় হবেন, তাদের নির্বাচন করবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, তাতে মুসলিম এবং "বর্ণ-হিন্দু"দের সংখ্যা হবে সমান সমান। ১৯৪৫-এ সিমলা সম্মেলন কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগের মধ্যে মতভেদের কারণে ভেস্তে গেল। অল্প কাল পরেই ব্রিটেনে শ্রমিক সরকার ক্ষমতায় এসে ঘোষণা করল ১৯৪৬-এর গোড়ায় ভারতে নির্বাচন হবে। সেই নির্বাচনে সাধারণ আসনে বিপুল জয় লাভ করল কংগ্রেস এবং মুসলিম আসনে মুসলিম লিগ। ১৯শে ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্ট জানালেন মন্ত্রীসভার একটি দল ভারতে যাবে। ক্যাবিনেট মিশন মার্চ মাসে ভারতে পৌঁছেই কংগ্রেস এবং লিগ নেতাদের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করল। কোনও বোঝাপড়া দু'দলে হল না, ১৬ই মার্চ কমিশন তার সুপারিশ ঘোষণা করল। স্পষ্টই দেখা গেল তাঁরা ভারত বিভাগ চাননি। চেয়েছিলেন (১) কেন্দ্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার (২) প্রদেশগুলি হবে তিনভাগে বিভক্ত, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু-বেলুচিস্তান ও পাঞ্জাব; বঙ্গদেশ ও আসাম; অবশিষ্ট ভারত (৩) বিভিন্ন প্রাদেশিক আইনসভা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে একটি সংবিধান পরিষদ গঠন করবে (৪) প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনের পরে কোনও প্রদেশ চাইলে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করতে পারবে এবং (৫) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের মধ্যে থেকে একটি অন্তবর্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠিত হবে।

মুসলিম লিগ এ প্রস্তাব গ্রহণ করল, কিন্তু কংগ্রেস করল না, যদিও সে বলল নতুন সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে সংবিধান পরিষদে সে যোগ দেবে। ক্যাবিনেট মিশন স্বদেশে ফিরে গেল। তখন মুসলিম লিগ দাবি করল কংগ্রেসকে বাদ দিয়েই ভাইসরয় প্রাদেশিক সরকার গঠন করুক। তাতে কাজ হল না। লিগ ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবে তার সম্মতি ফিরিয়ে নিল। ভাইসরয় শুধুমাত্র কংগ্রেস সদস্যদের নিয়ে তার কাউনসিল পুনর্গঠিত করলেন। মুসলিম লিগ ঘোষণা করল ১৬ই আগস্ট তাদের ডিরেকট অ্যাকশনের দিন হবে। প্রথমে কলকাতায়, তারপর দেশের নানা জায়গায় সাম্প্রদায়িক খুনোখুনি শুরু হল।

১৯৪৭-এর ২০ শে ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করল জুন ১৯৪৮-এর মধ্যে তারা ভারত ছেড়ে চলে যেতে চায়, এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ভাইসরয় হিসাবে ভারতে পাঠাল লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে। আবার মুসলিম লিগের "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" আবার পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ খুন অগ্নিকাণ্ড হিংসায় উত্তাল। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে কংগ্রেস দেশের স্বাধীনতার জন্য দেশ বিভাগ মেনে নিতে বাধ্য হল।

কল্যাণ মিরবর এই ঘটনাক্রমের ইতিহাস যে যথাযথ দেননি তা নয়। এবং তিনি আরম্ভও করেছেন ১৮৫৭ থেকে, বাদ দেননি কোনও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই। তবে এত দিনে ভারতের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির অর্ধশতাব্দীরও বেশি অতিক্রান্ত হওয়ার পরে, অতীত ইতিহাসের প্রতি এক জন ঐতিহাসিক গবেষকের, ইতিহাসের ছাত্রের, যে মতাদর্শমুক্ত মনোভাব গ্রহণ করা উচিত, তার পরিচয় তিনি সর্বত্র দিতে পারেননি। গান্ধীর সম্পর্কে তিনি বলছেন :

"শ্রেণীভিত্তিক না হয়ে আবেগসর্বস্বতার মোড়কে ধর্মীয় দৃষ্টিতে পশ্চাৎপদতাকে তিনি অবলম্বন করেছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে, বিশ্লেষণের মাধ্যমে শ্রেণীচরিত্রের উন্মেষ ঘটিয়ে যদি তিনি গণ আন্দোলন পরিচালনা করতেন তবে হয়তো মিঃ জিন্নার 'হৃদকম্প' উপস্থিত হতো না এবং ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস আমরা অন্যভাবে দেখতে পেতাম।"

কিন্তু সে কাজ গান্ধী কী করে করবেন? আসলে তিনি কী ছিলেন, কী তিনি চেয়েছিলেন, সে বিষয়ে লেখক কোনও সন্দেহের অবকাশ রাখেননি :

"[গান্ধী এবং জিন্না] উভয়েই যে প্রতিনিধিত্ব করছেন ভারতীয় উঠতি পুঁজিপতিদের। ১৯৪৫-এ এসেও আমরা দেখবো মিঃ গান্ধী এবং মিঃ জিন্না রকমফেরে স্বাতন্ত্র বজায় রাখলেও মূল লক্ষ্য কিন্তু সেই গোষ্ঠীরই স্বার্থ রক্ষা করা।"

চিন্তায় স্বকীয়তার অভাব যেমন থেকে থেকেই প্রকট হয়ে উঠেছে, ভাষাও তেমনই থেকে থেকে এমন অপরিচ্ছন্ন যে অর্থ উদ্ধারই দায় হয়ে পড়েছে :

"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে ভারত এবং ভারতের নেতৃবৃন্দ (অবশ্যই কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি) এক আপাত সংকল্প গ্রহণের দ্বিধায় জড়িয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তৎপর হলো।"

সবচেয়ে বড় যে ঘাটতি এই বহুপরিশ্রমে রচিত বইখানিতে চোখে পড়ে, তা হল, আমাদের স্বাধীনতা কী করে সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা বিধ্বস্ত হল তা কোথাও স্পষ্ট হয়নি। আমরা ভালমন্দ যা কিছু করছি, হিন্দু মুসলমান পরস্পরের মাথাই ফাটাই আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য রাস্তায় মিছিলই বের করি, সবই স্বাধীন ভাবে করছি।

আসলে স্বাধীনতা আমাদের যে পথেই এসে থাক, হিন্দু-মুসলমানে এখনও যে এত দূরত্ব, তার কারণ রাজনীতি নয়। রাজনীতি নিজের স্বার্থে যখনই দরকার হবে সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দেবে, কাজে লাগাবে। দায়ী আমাদের নাগরিক সমাজে, যাকে civil society বলে তার মধ্যে মানুষকে মানুষের কাছে টেনে আনবার তাগিদের অভাব। স্বাধীনতা তাতে কোনও ব্যত্যয় হয়নি, ক্ষতি হয়েছে সভ্যতার, সংস্কৃতির, মৌলিক মানবিক গুণাবলির।

সাম্প্রদায়িকতা : বিধ্বস্ত স্বাধীনতা/কল্যাণ মিরবর/পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ৯/১২৫.০০

বাংলাদেশ : সংখ্যালঘুসংকটের স্বরূপ

রণেন্দ্রনাথ দেব

বাংলাদেশে মুদ্রিত অনেক বই পশ্চিমবঙ্গের বাজারে দুর্লভ। বিশেষ করে কোনও হিন্দুর লেখা, হিন্দুর স্বার্থ, অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে বই কদাচিৎ আমাদের হাতে পড়ে। কঙ্কর সিংহের 'সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু সংকট' ও 'রাষ্ট্র সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়' বই দুটি সে কারণে আমাদের আগ্রহ জগিয়েছে এবং অনেক জিজ্ঞাসার উত্তরও পাওয়া গেছে। দু'টি বই পরস্পরের পরিপূরক, একই বিষয়ের অনুবৃত্তি। প্রথমে, বই দু'টিতে লেখকদের প্রতিপাদ্য বিষয় তাদেরই চিন্তাধারার অনুসরণে উপস্থাপিত করব।

'সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘুসংকট' বইটির শুরু পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে। মুসলমান মানসে পাকিস্তান সৃষ্টির তাগিদ দেখা দিল কেন? লেখক মনে করেন ১৯০৫এর বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে এর বীজ নিহিত ছিল। হিন্দু উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কায় বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন এবং মুসলমান সম্প্রদায় বুঝতে পারেন তাঁদের উন্নতির পথ রোধ করা ছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতার প্রধান লক্ষ্য। স্বদেশি আন্দোলনে কোনও মুসলমান যোগ দিতে পারেননি। দেশবন্ধু হিন্দু মুসলমানের ভেদ দূর করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে ও কাজ অসমাপ্ত রয়ে যায়। "মুসলিমলীগের ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা অত্যন্ত নেতিবাচক। সে ভূমিকা তারা কোন সময় গোপন করেনি। তাদের পাকিস্তান দাবি ছিল হিন্দুদের কাছ থেকে স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবি, বৃটিশের কাছ থেকে ভারতের স্বাধীনতা নয়।" (পৃ.৪০)। ইংরাজ ভারত ত্যাগের সংকল্প গ্রহণ করলেও ভারত বিভাগ তাদের অনেকের মনঃপূত ছিল না। লর্ড ওয়াভেল ধর্মকে দেশবিভাগের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করার বিরোধী ছিলেন। মরিয়া মুসলিম লিগ ১৯৪৬এর ১৬ অগাস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয়। স্টেটসম্যান লিখেছিল, ছেচল্লিশের দাঙ্গার জন্য মুখ্যত মুসলিম লিগ দায়ী। সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদ তাঁর "আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর" বইটিতে লিখেছেন "প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে আমার নিজের বিবেচনায় এর প্রাথমিক দায়িত্ব মুসলিম লীগ নেতৃত্বের।" মুসলিমলিগ নেতা খাজা নাজিমুদ্দীন কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউটের এক সভায় ঘোষণা করেন "আমাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ইংরাজের বিরুদ্ধে নয়। হিন্দুদের বিরুদ্ধে।" আবুল মনসুর আহমদ একে হিন্দুদের বিরুদ্ধে "সুস্পষ্ট যুদ্ধ ঘোষণা" বলে বর্ণনা করেছেন। আলি মাহাদ "বাংলা-দেশের রাজনীতি, ১৯৪৫-৭৫" বইটিতে বলেছেন, "মুসলিমলীগের বড় ঘাঁটি ঢাকায় সেদিন কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় নি অথচ ঢাকা শহর হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার জন্য ব্যাপকভাবে নিন্দিত। পাকিস্তানের সব নেতাই পরবর্তীকালে গর্বের সাথে বলতেন যে, কলকাতার দাঙ্গাই পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিল। তাদের সেই অহঙ্কার মিথ্যে নয়" (পৃ. ৫২)। লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারত বিভাগ সম্পূর্ণ করেন। মওলানা আজাদ বলেছেন "ভেবে আমি অবাক হই কী করে এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল, কিভাবে মাউন্টব্যাটেন নেহরুর চিত্তকে জয় করে নিয়েছিলেন। বস্তুত একাধিক কারণ ছিল এবং এগুলোর মধ্যে লেডি মাউন্টব্যাটেন নিঃসন্দেহে একটা কারণ।" (পৃ.৫৯)।

এর মধ্যে স্বাধীন বাংলার পরিকল্পনা করেন সোহরাওয়ার্দি, শরৎ বসু, আবুল হাসিম। হিন্দুরা প্রবলভাবে এর বিরোধিতা করেন। হিন্দু মহাসভা দাবি করে বাংলা বিভাগ। খণ্ডিত ভারতে সেনাবাহিনীও বিভক্ত হয়। জিন্নাহ এবং জওহরলাল ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বেই দ্বিখণ্ডিত সেনাবাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চেয়েছিলেন (পৃ. ৬৯)। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ ঘোষিত হল। সিলেটের মৌলবি বাজার মহকুমার বারোটি হিন্দুপ্রধান থানা সংশ্লিষ্ট ত্রিপুরারাজ্যে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে রইল।

"পার্বত্য চট্টগ্রাম চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তরঙ্গা, মুরোং প্রভৃতি উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর আবাসভূমি। পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে এদের কোনো রায় নেওয়া হয় নি। (পৃ. ৭৬)। দেশ বিভাগের পর হিন্দুরা ব্যাপক হারে পাকিস্তান ত্যাগ করতে থাকেন। তা সব চেয়ে গুরুতর আকার ধারণ করে পঞ্চাশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরে। নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তিতে সংখ্যালঘুর সম অধিকার সম্বন্ধে অনেক সাধু বাক্য থাকলেও পাকিস্তানে এর কোনও আনুকূল্য ছিল না। পাকিস্তান গণপরিষদে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে যে মূলনীতি (Objective Resolutions) গৃহীত হয় (৭.৩.৪৯) তাতে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে

"Wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam, shall be fully observed"

(পৃ. ৯৫তে উদ্‌ধৃত)।

অর্থাৎ পাকিস্তানে সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং মৌলিক অধিকার স্বীকৃতি পাবে যা ইসলামধর্ম কর্তৃক স্বীকৃত। লেখক শ্রী সিংহ মন্তব্য করেছেন "পূর্ববাংলায় সংখ্যালঘুদের অবস্থা করুণ হওয়ার জন্য শুধু পূর্ববাংলা মুসলিম লীগ দায়ী ছিল না, বেশি দায়ী ছিল এ প্রদেশের অবাঙালি আমলাতন্ত্র" (পৃ.৯৬)। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় একজন মাত্র হিন্দু মন্ত্রী ছিলেন — তপশিলি জাতির এক স্বঘোষিত নায়ক যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। ইনি ছিলেন মুসলিম লিগের পুরনো বন্ধু। দাঙ্গার পর তিনিও পদত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।

দেশভাগ এবং পাকিস্তান তত্ত্বের সমর্থক ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। সশস্ত্র কর্মসূচি গ্রহণ করে তারা আন্দোলন শুরু করলে পাকিস্তান সরকার তা কঠোর ভাবে দমন করে।

পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান চালু হয় ২৩ মার্চ ১৯৫৬। এ সংবিধানে দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের পদ বিশেষভাবে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হল। পাকিস্তানের গতিপ্রকৃতি যাই হোক হিন্দুদের দাবিতে যুক্ত নির্বাচন গৃহীত হয়।

ইতিমধ্যে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির পর বাংলাভাষার মর্যাদা নিয়ে লড়াই শুরু হয়ে যায়। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেন। মোহাম্মদ গোলাম কবির তদীয় "Minority Politics in Bangladesh" গ্রন্থে বলেছেন "Of all regimes in Pakistan, it was Ayyub's Martial Law regime which was most resented by the minitory community" (১৫৯ পৃষ্ঠা) আইয়ুবের আমলে ১৯৬৪ তে সংঘটিত হয় ভয়াবহ দাঙ্গা। "ঢাকার কাছাকাছি নরসিংহী থেকে লাঙ্গলবন্ধ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ তাঁত শিল্প এলাকাই ছিল দাঙ্গার প্রথম লক্ষ্যস্থল। বংশানুক্রমিকভাবে হিন্দুরা ছিল এই শিল্পের সাথে জড়িত।.... আইয়ুব সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় আদমজী প্রকাশ্যে দাঙ্গা করার জন্য লেলিয়ে দিয়েছিল তার অবাঙালি শ্রমিকদের।" (পৃ. ১৫৬)। আইয়ুব সরকারের আর এক কীর্তি পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করা। এ কাজে তাঁকে মদত দিয়েছিলেন কিছু কিছু বাঙালি কবি সাহিত্যিক। কবি গোলাম মোস্তাফা লেখেন "দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষাও বিভক্ত হয়ে গেছে এবং পরিণতিতে একদিন পূর্ববঙ্গের ভাষা হবে ইসলামি বাংলাভাষা" (পৃ.১৬৩)।

কবি গোলাম মোস্তাফা আইয়ুব বন্দনা করে কবিতাও লিখেছিলেন —

"খুশ আমদিদ, পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়ক আইয়ুব খান
মরণ আহত জাতির জীবনে নয়া জিন্দেগী মূর্তিমান।"

জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ শেষ পর্যন্ত মুক্তিসংগ্রামে পরিণত হয়। সে ইতিহাস সবার জানা। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু হিন্দুদের পক্ষে এ স্বাধীনতাও আশীর্বাদ হয়ে আসেনি। ভারত থেকে যে শরণার্থীরা বাংলাদেশে ফিরে এলেন তাদের ৯০ শতাংশই হিন্দু। শরণার্থী পুনর্বাসন নিয়েই বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ফের মাথা চাড়া দিল। ১৯৭২ সালে দুর্গাপূজার দ্বিতীয় দিনেই ঢাকায় লাঞ্ছিত হল মাতৃপ্রতিমা। তা ছড়িয়ে গেল চট্টগ্রামেও। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে যে নতুন সংবিধান চালু হয় তাতে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগঠন নিষিদ্ধ হল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ সব দল কখনও নিষ্ক্রিয় হয়নি। "১৯৭২ সালের আগস্ট মাসেই মওলানা ভাসানী সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ঘোষণা করলেন ভারত বাংলাদেশের বৃহত্তম শত্রু" (পৃ. ১৮৩)। মুক্তিসংগ্রাম শুরু হতেই কিন্তু মওলানা ভাসানি ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। হিন্দুদের দেবস্থানের উপর আক্রমণ পুনরায় শুরু হয়ে যায়। "স্বাধীন বাংলাদেশে রেসকোর্স ময়দানের নতুন নামকরণ হল। কিন্তু সেখানে কালী মন্দির পুনর্নির্মাণের আদেশ দেওয়া হল না" (পৃ.১৮৮)। ১৯৭৫ এর ২৫ জানুয়ারি সংবিধান সংশোধন হল। মুজিব হলেন সর্বময় কর্তৃত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রপতি। সূত্রপাত হল এক দলীয় শাসনের। তবু বিপর্যয় ঠেকানো গেল না। ১৫ই আগস্ট মুজিব নিহত হবার পর খোন্দকার মুশতাক হলেন নতুন রাষ্ট্রপতি। তিনি ঘোষণা করলেন ইসলামি মূল্যবোধের ভিত্তিতে চলবে দেশ। পাকিস্তানি আমলে ১৯৬৫ সালে যে শত্রু সম্পত্তি আইন চালু হয়েছিল হিন্দুরা বারবার দাবি জানিয়েছেন তা বাতিল করার। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ওই আইন নব কলেবর লাভ করেছে অর্পিত সম্পত্তি আইনে। এই আইনটির বিশদ আলোচনা করেছেন লেখক বইটির শেষাংশে।

লেখকের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'রাষ্ট্র, সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়' শুরু হয়েছে ২৩ জুন ১৯৯৬ শেখ হাসিনার মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ উৎসব থেকে। ২১ বছর পরে আওয়ামি লিগ আবার ক্ষমতায় এল। শেখ হাসিনা কিন্তু তাঁর মন্ত্রীসভাকে আওয়ামি লিগ মন্ত্রীসভা বলেন না। বলেন ঐকমত্যের সরকার। লেখক প্রশ্ন করেছেন, কোন ভিত্তিতে কিসের ঐকমত্য হল? কাদের সাথে ঐকমত্য? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে অনেক অপ্রিয় সত্যের সম্মুখীন হতে হয়। বাংলাদেশে যে পিছু হটা শুরু হয়েছিল তা কি এখনও অব্যাহত নয়? ভাষা আন্দোলনের প্রেরণা কি স্তিমিত? সংবিধানের সাম্প্রদায়িকীকরণ কি রুদ্ধ হয়েছে? শেখ হাসিনার আমলেও কোনও অসাম্প্রদায়িক বাতাবরণ সৃষ্ট না হওয়ায় লেখক ক্ষুব্ধ। একটি প্রবন্ধে শত্রুসম্পত্তি আইন বিষয়ে পুনরায় আলোচনা করেছেন। আর একটি প্রবন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল বার বার আক্রান্ত হয় কেন? বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে দ্বিচারিতা দেখা যায় তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তুলে ধরেছেন অধ্যাপক আবুল ফজলকে এবং

বাবরার ভোল পালটানো সৈয়দ আলি আহসানকে। এরশাদ এবং খালেদা জিয়ার আমলে হিন্দু নিপীড়নের অজস্র উদাহরণ দিয়েছেন শ্রীসিংহ। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে যে তাণ্ডব শুরু হয় তাতে "সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মন্দির ও উপাসনাস্থল ভাঙা হয়েছে ৩৫০০টি, অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠনকৃত বাড়ির সংখ্যা ২৮০০, ক্ষতিগ্রস্ত অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে সংখ্যালঘুদের ২৫০০ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, নিহত হয়েছেন ২৫ জন, আহত হয়েছে অসংখ্য। তাছাড়া ধর্ষিত হয়েছে ২৪০০ সংখ্যালঘু নারী" (পৃ. ৯২)। এর আগে থেকেই এরকম হিন্দু নির্যাতনের প্রস্তুতি চলছিল। "১৯৯০ এর অক্টোবর-নভেম্বরে ভারতের বাবরী মসজিদ ভাঙা সংক্রান্ত কাল্পনিক সংবাদ পরিবেশন করে জিয়া-এরশাদের প্রাক্তন মন্ত্রী মাওলানা মান্নানের দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকা" (পৃ.৯১)।

হিন্দুদের ব্যাপক দেশত্যাগ সম্বন্ধে লেখক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সমীক্ষায় লব্ধ তথ্যের উল্লেখ করেছেন (পৃ. ১৩৪) "১৯৬৪ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত ৫৩ লক্ষ হিন্দু নরনারী দেশত্যাগ করেছে। অর্থাৎ ১৯৬৪ সাল থেকে গড়ে ৫৩৮ জন হিন্দু নরনারী প্রতিদিন দেশত্যাগ করেছে। এই দেশত্যাগের নানাবিধ কারণ থাকলেও গবেষণাপত্রটির মতানুসারে মাতৃভূমি থেকে হিন্দু সংখ্যালঘুদের উচ্ছেদের ক্ষেত্রে কার্যকর পদ্ধতিরূপে কাজ করেছে শত্রু/ অর্পিত আইনের ফলে উদ্ভূত সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এবং নিরাপত্তাহীনতা।"

চাকুরির ক্ষেত্রে হিন্দুদের শোচনীয় অবস্থার কথা বিশদভাবে বলার অপেক্ষা রাখে না। খালেদা জিয়ার শাসনকালে ১৯৯২ সালে পুলিশ বিভাগে নিযুক্ত ৩০০ জন সাবইনস্পেকটরের মধ্যে একজন হিন্দুও ছিলেন না (পৃ. ৯২)।

দু'টি বইয়ে লেখক যে বিস্তৃত তথ্য দিয়েছেন তার সামান্য অংশের উল্লেখ করলাম। বইগুলি প্রবন্ধের আকারে লেখা নয়। চিঠির ঢঙে সহজভাবে বলেছেন লেখক; তবে সর্বত্রই তাঁর মতামতের সমর্থনে যথেষ্ট তথ্য উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর নিজস্ব মতামতের মধ্যে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখের যোগ্য তা হল জিন্নাহ্‌র চরিত্র ও কৃতিত্ব। আজকাল অনেক লেখক জিন্নাকে দেশভাগের ক্ষেত্রে নিরপরাধ ও সেকুলার প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করছেন। লেখকের প্রশ্ন সত্যই কি তাই? শ্রীসিংহ বলছেন, পাকিস্তান সৃষ্টির পর জিন্না এক বছর বেঁচেছিলেন। এই এক বছরে তাঁর আচরণে কোনও নতুন ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় কি? ঢাকায় অবস্থানকালে জিন্নাহ প্রতিনিধিস্থানীয় ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করলে একটি ছাত্র প্রতিনিধিদল তাঁর সাথে সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়। কিন্তু এ প্রতিনিধিদলে দু'জন হিন্দু ছাত্রের উপস্থিতি টের পেয়ে কুশল বিনিময়ের পরই তিনি সাক্ষাৎকার শেষ করেছেন। (পৃ. ১১৭) শ্রী সিংহ আরও বলছেন, "প্রদেশের জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশেরও বেশি যে হিন্দু সম্প্রদায়, রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে তাঁর সেই প্রদেশ সফরের কোনও পর্যায়েই তিনি হিন্দুদের সম্বন্ধে একটা কথাও বলেন নি। বরঞ্চ এই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের চরম সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে গেছেন" (পৃ.৮২)। অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের বর্তমান অবস্থার কোনও বাস্তব চিত্র পশ্চিমবঙ্গে আমরা পাই না। সত্য কথা, সালাম আজাদ লিখিত "হিন্দু সম্প্রদায় কেন দেশত্যাগ করছে" এবং মোহাম্মদ গোলাম কবির রচিত 'Minority Politics in Bangladesh' বই দুটিতে হিন্দুসম্প্রদায়ের দুর্দশা ও সংকট সম্বন্ধে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা আছে। কিন্তু শ্রীসিংহের বইয়ে যে বিস্তৃত বিরবণ আছে তা অন্যত্র পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের "হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য সমিতি' যে সব পুস্তিকা ও গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন এপার বাংলায় তা পৌঁছয় না। শ্রীসিংহের বই দু'টিই আমাদের কৌতূহল নিরসনের একমাত্র উপায়। তিনি সত্য কথা নির্ভীকভাবে বলেছেন। জিন্নার স্বভাবগত একনায়কত্ব পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে গণতন্ত্রের ভিত্তি দুর্বল করে দিয়ে সামরিক শাসনের পথ প্রশস্ত করেছিল। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতিতে অশুভ শক্তির ক্রমবিস্তারও ও দেশের বৃহত্তর বিপদের সংকেত দিচ্ছে। লেখকের এই সাবধানবাণী আশা করি বাংলাদেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কর্ণগোচর হবে। প্রথম বইটির ভূমিকায় কবি শামসুর রাহমান লিখেছেন — "এ বই বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘু সকল সম্প্রদায়ের অবশ্যপাঠ্য। কেননা, বইটি একজন ভুক্তভোগী, সত্যনিষ্ঠ, তথ্যান্বেষী বেদনার্ত মানুষের লেখা এক মূল্যবান দলিল।" দ্বিতীয় গ্রন্থের ভূমিকায় কবীর চৌধুরী লিখেছেন "সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দিক থেকে বিষয়গুলি প্রধানত আলোচনা করলেও তার দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্প্রদায়নিরপেক্ষ মানবতাবাদী মুক্তচিন্তাই প্রতিফলিত হয়েছে।"

আমরা এই দুটি অভিমতের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু সংকট — কঙ্কর সিংহ/অনন্যা, বাংলাবাজার, ঢাকা/১৩০.০০

রাষ্ট্র, সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘুসম্প্রদায় — কঙ্কর সিংহ/অনন্যা, বাংলাবাজার, ঢাকা/১২০.০০

সংস্কারের আগে ও পরে — অর্থনীতির দুটি মূল্যায়ন

অভিজিৎ দত্ত

সুহৃদ্দের শেষ দশকের শুরুতে এই দেশে নয়া আর্থিক নীতির একটি স্পষ্ট বাঁক বিস্তর বিতর্ক ও তাত্ত্বিক সংঘাতের সূত্রপাত করেছে। একটি দশক পার হয়ে এসেও ঘটনা পরম্পরার ঘূর্ণিঝড় যে ধুলো উড়িয়েছিল তা পুরোপুরি থিতিয়ে যায়নি। এই উপমহাদেশের আর্থিক কর্মকাণ্ডের বিশালত্ব, বিভিন্নতা এবং সামগ্রিকভাবে উন্নয়নাভিমুখী চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ফলাফলের অন্তিম মূল্যায়নের জন্য একটি দশক সম্ভবত যথেষ্ট সময় নয়। যদিও এই পর্যায়কালে দীর্ঘকালীন উন্নয়ন সম্ভাবনার একটি প্রক্ষিপ্ত মূল্যানুমান আমরা করতে পারি। একই সঙ্গে নয়া আর্থিক নীতির কয়েকটি মূল অনুষঙ্গের আর্থিক প্রতিক্রিয়া ও ফলাফলের একটি অন্তর্বর্তীকালীন মূল্যায়নও করা সম্ভব। এই বিতর্কের তাত্ত্বিক আবহে প্রাসঙ্গিকভাবেই পরিকল্পিত অর্থনীতি ও বাজার নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির আপেক্ষিক তুলনা এসেছে। যদিও বিশুদ্ধ অর্থে একটি বিশেষ অর্থব্যবস্থা এখন বিশ্বের কোথাও কার্যকর নয়, (চিনে বাজার অর্থনীতির ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ) বরঞ্চ কোনও একটি ব্যবস্থার প্রতি প্রবণতা ও তার প্রয়োগমাত্রাটিই বিবেচ্য। এ ছাড়াও এই বিতর্কে যুক্ত হয়েছে উন্নয়ন-অর্থনীতির বিভিন্ন তাত্ত্বিক ধারা-উপধারা যা একটি উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ণ সম্ভাবনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে।

আমাদের দেশে "প্রথাগত" পরিকল্পনার চার দশক (১৯৫০-৯০) এবং "নয়া আর্থিক নীতির" এক দশক তার মধ্যবর্তী আর্থিক বাঁক সত্ত্বেও একটি উন্নয়নকামী দেশের সুষম আর্থিক উন্নয়নের চেষ্টা, দুর্বিষহ দারিদ্র নিরাকরণের আশু প্রয়োজনীয়তা, বিশাল মানবসম্পদের উন্নয়ন ও যথাযথ ব্যবহার এবং রাষ্ট্র ও বাজারের তুলনামূলক অর্থনৈতিক দক্ষতার ও প্রয়োগ-সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি নিরবচ্ছিন্ন আর্থিক ইতিহাস হিসাবে মূল্যায়ন করা উচিত। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার নেতৃত্বে প্রায় বদ্ধ মিশ্র অর্থনীতির সাফল্য ও ব্যর্থতার পর্যালোচনার জের টেনে শেষ দশকে নয়া আর্থিক নীতির ছত্রছায়ায় বাজার অর্থনীতির হাতে নেতৃত্ব বদল এবং একই সঙ্গে মুক্ত করে দেওয়া অর্থনীতিকে বিশ্ব অর্থনীতির দোলাচলের সঙ্গে সংলগ্নকরণের ফলাফল একটি অবিচ্ছিন্ন তাত্ত্বিক মূল্যায়নের পথ খুলে দিয়েছে।

অনিন্দ্য ভুক্তর আলোচ্য বই দুটির (ভারতীয় পরিকল্পনার চার দশক এবং এই দেশ, এই দশক) শিরোনামে এই পর্যালোচনা অর্ন্তভুক্ত হয়েছে তা স্পষ্ট। 'ভারতীয় পরিকল্পনার চার দশক' বইটিতে নবম পরিকল্পনা (১৯৯৭/৯৮—২০০১/২) অবধি একটি ক্রমানুসারী পর্যালোচনা করা হয়েছে। ফলে পরিকল্পনা-নিয়ন্ত্রিত প্রাক-আর্থিক সংস্কার পর্যায়ের চারটি দশকের সঙ্গে নয়া আর্থিক নীতির প্রেক্ষাপটে গৃহীত অষ্টম ও চলতি নবম পরিকল্পনার বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। পনেরোটি অধ্যায়, দুটি পরিশিষ্ট সম্বলিত বইটি ভারতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি তথ্যপূর্ণ লেখ্য হিসাবে অর্থনীতির ছাত্র ছাত্রীদের আকৃষ্ট করবে ও একই সঙ্গে আগ্রহী পাঠকের সামনে পরিকল্পনার একটি নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাসের রূপরেখা তুলে ধরবে। প্রতিটি পরিকল্পনার লক্ষ্য ব্যয়বরাদ্দ, ব্যয়সংস্থান ও মূল্যায়ন একটি সামগ্রিক তথ্যভিত্তি প্রস্তুত করে দিয়েছে। একই সঙ্গে পরিকল্পনাগুলির সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে আলোচনাগুলিতে বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি উত্থাপিত হয়েছে।

১৯৯১ সালের জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় সরকার আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (IMF) ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের (WB) সহায়তায় সমষ্টিগত অর্থনৈতিক সুস্থিতি ও কাঠামোগত সংস্কারসূচির সূত্রপাত করে। এটি আসলে একটি নীতিগুচ্ছ—বাণিজ্য, শিল্প, বিনিময়হার, মূলধন বাজার, আর্থিক ক্ষেত্র এবং রাজস্ব নীতির সংস্কার — যা 'নয়া আর্থিক নীতি' বলে পরিচিত। এই আলোচনায় উঠে এসেছে ভারতীয় অর্থনীতির কয়েকটি সাম্প্রতিক বিতর্ক — নীতিগুচ্ছের প্রকৃতি, ক্রমপরম্পরা, মাত্রাগত তীব্রতা ও প্রয়োগ এবং দেশের আর্থিক সূচকগুলির (যেমন জাতীয় আয়, কর্মসংস্থান, মূল্যস্তর, বৈদেশিক বাণিজ্য ভারসাম্য, বাজেট ভারসাম্য, আয় ও সম্পদের বন্টন এবং দারিদ্র) উপর নীতিগুচ্ছের প্রভাব প্রসঙ্গ। এই বিতর্কের স্পষ্ট মেরুকরণ ঘটে গেছে। এক দিকে রয়েছেন সংস্কারপন্থী অর্থনীতিবিদেরা যাঁরা বিশ্বঅর্থনীতির সঙ্গে দেশীয় অর্থনীতির সংলগ্নকরণ, আর্থিক উদারীকরণ ও তার সাফল্যের সপক্ষে যুক্তি রেখেছেন। অপরদিকে রয়েছেন সংশয়বাদীরা যাঁরা মূলত আর্থিকভাবে দুর্বল জনগোষ্ঠীর উপরে সংস্কারের ক্ষতিকর প্রভাব ও একই সঙ্গে সংস্কারগুচ্ছ ও তার ফলে অর্জিত আর্থিক উন্নতির ধারণযোগ্যতা ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দিহান। এ প্রসঙ্গে সুরেশ তেণ্ডুলকার বিতর্কের মূলসূত্রটি এইভাবে তুলে ধরেছেন —

"the favourable impact of economic reforms on reduction in poverty can reasonably taken for granted once the economy shifts to a higher growth path ... the critical question relates to the period of transition before the economy shifts to a higher growth path"

দ্বিতীয় আলোচ্য বই 'এই দেশ, এই দশক' এগারোটি প্রবন্ধের সংকলন। এগুলির মধ্যে রয়েছে বাণিজ্য, বিনিময় হার, শিল্প, আর্থিক ও রাজস্ব নীতির উপর আলোচনা ও একই সঙ্গে দারিদ্রের অভিঘাত, বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠন (WTO) ও ১৯৯৯/২০০০ বাজেটের বিশ্লেষণ। যদিও এইরকম শ্রেণীবদ্ধকরণ যথেষ্ট অস্পষ্ট কেননা বিষয়গুলি পরস্পর অনুবদ্ধ ও প্রায়শ অধিক্রান্ত। প্রবন্ধগুলি একটি সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ প্রতিফলিত করেছে যা নিশ্চিতভাবেই 'নয়া আর্থিক নীতির' প্রতি অনাস্থা আরোপ করেছে। সংস্কার প্রক্রিয়ার প্রতি লেখকের সাধারণ প্রশ্ন ছিল চার দশকের বিভিন্ন সরকারি নিয়ন্ত্রণের ঘেরাটোপে আবদ্ধ দেশীয় ক্ষেত্রগুলি আচমকা আন্তর্জাতিক খোলা হাওয়ার ঝড়ঝাপটা কতটা সামলে উঠতে পারবে? এই সংস্কার কর্মসূচির আদৌ প্রয়োজন ছিল কি না এবং তার প্রয়োগ আরও মসৃর করা উচিত ছিল কি না এই প্রশ্নগুলিও উঠেছে। একই সঙ্গে নতুন নীতির পাশাপাশি ক্রমহ্রসমান সরকারি ভূমিকাকে ও তিনি সমালোচনা করেছেন। অথচ বিগত চার দশকে নিয়ন্ত্রিত ও বদ্ধ অর্থনীতি যে একের পর এক প্রমাদ ঘটিয়ে চলেছে 'শেয়ার কেলেঙ্কারি' 'রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির অদক্ষতা'(পৃঃ ১২,) 'রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলির ধারাবাহিক ব্যর্থতা' ও 'কর্মসংস্কৃতির অভাব' (পৃঃ২৬/২৭), 'পেট্রোপণ্যে ভরতুকি তুলে দেওয়ার যথার্থতা (পৃঃ ৩৮), 'দারিদ্রমোচন প্রকল্পগুলির গণব্যর্থতা (পৃঃ ৮২) এও তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। এই উভয়সংকট মোচনের পথ হিসাবে তিনি অবশ্যই প্রশাসনিক সংস্কার ও দুর্নীতি দূরীকরণের বিকল্প সমাধানসূত্র তুলে ধরেছেন।

সাময়িকভাবে প্রবন্ধগুলির যুক্তিতর্কের আবর্তে লেখক দুটি স্ববিরোধিতায় জড়িয়ে পড়েছেন। প্রথমত, প্রাকসংস্কার পরিকল্পিত অর্থনীতির সময়কালে রুদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি কয়েকটি দুরারোগ্য আর্থিক অসুখে স্থায়ীভাবে জর্জরিত হয়েছে এটা মেনে নিয়েও সংস্কারের বিশেষত উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্ররচনার প্রতি গভীর সংশয় ব্যক্ত করেছেন। দ্বিতীয়ত, বিগত চার দশকের আর্থিক ব্যধিগুলির মুখ্য কারণ হিসাবে সরকারি ব্যর্থতাকে চিহ্নিত করেও সংস্কারের বিকল্প হিসাবে সরকারি হস্তক্ষেপ ও তত্ত্বাবধানের পথটিই আবার সামনে তুলে ধরেছেন। অন্যথায় তথ্যসমৃদ্ধ এই প্রবন্ধ সংগ্রহটি লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে আর্থিক সংস্কারের বিভিন্ন দিকগুলির বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরেছে যা অর্থনীতিবিদ ছাড়াও কৌতূহলী পাঠকদের ভাবনাচিন্তা ও বিতর্কের রসদ যোগাবে।

ভারতীয় পরিকল্পনার চার দশক — অনিন্দ্য ভুক্ত/প্রগেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা—৭৩/১২০.০০।

এই দেশ, এই দশক — অনিন্দ্য ভুক্ত/প্রগেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা — ৭৩/৯০.০০।

'মধুপর্ণী'-র বাছাই গল্প

পার্থ ঘোষ

একটি পত্রিকা হল অজস্র ব্যক্তিগত সম্পর্ক, অসামান্য ধৈর্য, কঠোর শ্রম আর অতুলনীয় অধ্যবসায়ের নিট ফল। সাড়ে তিন দশক ধরে যার ধারাবাহিকতা, কালের বিচারে সে হয়ত বা তুচ্ছাতিতুচ্ছ, কিন্তু একটি জীবনের নিরিখে কিংবা সৃষ্টিশীলতার প্রেক্ষিতে? সেখানেই তার অনন্যতা। সাহিত্যপত্রিকা হল ধাত্রীস্বরূপা, লেখকের গোপন আঁতুড়ঘরে যে সব একান্ত আপন রচনার জন্ম, পত্রিকাই তাদের লোকসমাজে টেনে এনে পরিচিতি দেয়। সেই হিসাবে পত্রিকার দায়িত্ব বিরাট, কিন্তু তার ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখার কর্তব্যটা, হায়, প্রায়শই সম্পাদক নামধারী বেচারির ওপরে পড়ে। যতদিন তাঁর, বা ক্ষেত্রবিশেষে তাঁদের সাধ্যে কুলোয়, তত দিনই পত্রিকার আয়ু, সম্পাদক অক্ষমতা প্রকাশ করে রণে ভঙ্গ দেবার আগেই কিন্তু লেখককুলের পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ হয়ে যায়। সব পত্রিকার ক্ষেত্রেই যে এ কথা সত্যি তা হয়ত নয়। কিন্তু এই বাংলার অধিকাংশ বিশিষ্ট সাহিত্যপত্রিকার ললাটলিখনই তাই। মধুপর্ণী হল মুষ্টিমেয় সেই কয়েকটি পত্রিকার অন্যতম যারা শত অসুবিধা সত্ত্বেও ধারাবাহিকতার দীপশিখাটি আজও জাগিয়ে রেখেছে প্রায় অম্লানভাবে। তার এই দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের পথ চলার প্রাপ্তি থেকে নানারঙের ফুলে গাঁথা এক খানি মালা পাঠক এবার উপহার পেল — মধুপর্ণী বাছাই গল্প ২০০০।

উত্তরবাংলার এই পত্রিকাটির স্বাতন্ত্র্য আর আভিজাত্য অহংবোধকে সুড়সুড়ি দেবার মতোই। সুদূর বালুরঘাট শহর থেকে আপনাকে মেলে ধরার যে প্রয়াস মধুপর্ণীর মধ্যে দেখা যায় তার তুলনা বোধহয় সে নিজেই। গোটা উত্তরবঙ্গের সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরার শ্রমসাধ্য ও দুরূহ কর্মে আত্মনিয়োগ করায় মধুপর্ণী-র দায় বেড়েছে। বেড়েছে দায়িত্বও।

এই বঙ্গের অন্যান্য অংশের সঙ্গে উত্তরবাংলার যোগসূত্র রচনা করার জন্যই মধুপর্ণী ১৯৭৭ থেকে ১৯৯৭ এই কুড়ি বছরে পাঁচটি জেলা সংখ্যা প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত হয়েছে একটি পৃথক উত্তরবঙ্গ সংখ্যাও। তবে এগুলো মূলত উত্তরবঙ্গের নিজস্ব আর্থসামাজিক সম্পদ ও সমস্যা বিষয়ক। এবারের 'বাছাই গল্প' সংখ্যা হল সাহিত্যের আসরে উত্তরবঙ্গকে পরিচিত করিয়ে দেবার এক সযত্ন প্রয়াস। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের অভিযাত্রার সঞ্চয় থেকে বেছে নেওয়া ৩৮টি মৌলিক গল্প এবং পাঁচটি অনুবাদ এই সংকলনে ঠাঁই পেয়েছে। লেখকদের সকলেই যে উত্তরবঙ্গের তা নয়। এঁদের কেউ কেউ রচনাকালে কিংবা আগে-পরে উত্তরবঙ্গে ছিলেন কর্মসূত্রে অথবা অন্য কোনও প্রয়োজনে — তাঁদের রচনাও তাই এই গল্প-সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য গুরুতেই বলে রেখেছেন মধুপর্ণীর সমৃদ্ধ এবং বিচিত্র গল্পসম্ভার থেকে মাত্রই ৪৩টি গল্প নির্বাচন অত্যন্ত দুরূহ। এ কথা জেনে সত্যিই আনন্দ হয় কেন না এটা উত্তরবাংলার সাহিত্য জগতের সম্পদ ও সম্ভাবনার ইঙ্গিতবাহী।

না, ধান ভানতে শিবের গীত গেয়ে আর লাভ নেই। এবারে বরং সরাসরি এই সংকলনটির কথায়ই আসা যাক। মধুপর্ণী বাছাই গল্প ২০০০ শীর্ষক সংখ্যাটি হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে গিয়ে গোড়াতেই যে কথা মনে এল সেটা হল এই সংখ্যার লেখকদের ক্রমবিন্যাস। ঠিক কী বিচারে এই বিন্যাস সেটা বোধগম্য হল না। প্রথমে মনে হল সম্পাদক বোধ হয় বর্ণানুক্রমে সাজাতে চেয়েছেন কিন্তু তা হলে তো অমিত গুপ্ত, অভিজিৎ সেন-এর আগে আসতে পারেন না, প্রথম স্থানটি সে ক্ষেত্রে নামের বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসের দরুন স্বয়ং সম্পাদকেরই প্রাপ্য হয়। এ ক্ষেত্রে হয়ত বা নিছক সংকোচবশতই সম্পাদক নিজেকে একটু পিছিয়ে রেখেছেন। বরং পত্রিকায় প্রকাশের কাল অনুসারে সাজালেই বোধ হয় ভাল হত কেননা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য, বিশেষত ছোট গল্পের শৈলী এবং তার অন্যান্য উপকরণ সবই কিছুটা পালটে যায়। কালানুক্রমিকভাবে লেখাগুলো সাজানো হলে দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের এক বিবর্তনের ধারা উৎসাহী পাঠকের চোখে ধরা পড়ত — গবেষকের কাজটা আরও একটু সহজ হত। পাঠক ১৩৭২-এর 'মহুয়া মৌসুম' এর পরেই ১৩৮৭-তে প্রকাশিত 'জলবন্দী' পড়তে গিয়ে নিজের অজান্তেই যে ধাক্কাটা খান সেটা শুধুই বিষয় বৈচিত্র্যের জন্য নয়, ওই পনেরো বছরে এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক জীবনে যে পরিবর্তনটা ঘটে গেছে, সেটাও তার অন্যতম কারণ।

এহ বাহ্য। ৩৮টি গল্পের যে সম্ভার পাঠককে উপহার দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে অনেকগুলোই উল্লেখের দাবিদার। প্রথম গল্পটি, অমিত গুপ্তের 'একবাঙ্গ সুখ' যদিও আদলে রাঢ়বঙ্গের নানা কথাকারের রচনার সাদৃশ্য বহন করে তথাচ তার আবেদনের ভিন্নতা মনকে ছুঁয়ে যায়। একই ভাবে অভিজিৎ সেনের 'চোর' চিত্তস্পর্শী। লেখকের শ্রেষ্ঠতর রচনা পড়ার সুযোগ ঘটেছে ঠিকই কিন্তু এই শশী চোরও যে বাংলাসাহিত্যের নানা বিচিত্রকর্মা তস্করদের মধ্যে স্থান পাবে সে কথা নিশ্চিন্তভাবেই চলা যায়।

পরবর্তীটি অর্থাৎ দিগিন লাহিড়ীর গল্পের লেখক অজিতেশ ভট্টাচার্য। 'সাম্রাজ্যবাদের বুর্জোয়া দালাল' দিগিন লাহিড়ী আর প্রতিবাদী বিমলের এই গল্পের বিষয়বস্তু নতুন না হলেও আঙ্গিক আর প্রকাশভঙ্গি সত্যিই উল্লেখযোগ্য। শেষ ছত্র ক'টি বহু দিন মনে থাকবে। মনে রাখার মতো ইঙ্গিত দিয়ে শুরু হয়েছিল অনিন্দ্য ভট্টাচার্যের 'বিশ্বরূপ'-ও — তবে সূচনার অঙ্গীকার সমাপ্তিতে কেমন যেন ফিকে হয়ে গেল, মনে হল শেষটা নিয়ে কী করা যায়, লেখক যেন ঠিক খুঁজে পাচ্ছিলেন না সেটাই। অসীম রেজের 'চেয়ার' মধ্যবিত্ত কেরানির দৈনন্দিনের গ্লানিকে তুলে ধরে — ভয়ংকর সেই একঘেয়েমির স্বাদ আর অভিজ্ঞতার শরিক হওয়া যায় এই গল্পের মাধ্যমে। অলোক গোস্বামীর 'অভিযোজন কথা'ও ভাল তবে গল্পটি আকারে আরও ছোট হতে পারত। উৎপল ঝা-র 'একা সনাতন' এই মরপৃথিবীর সনাতন সমস্যাই তুলে ধরে মাত্র তবে তার প্রকাশভঙ্গি ও ভাষা উত্তর বাংলার নিজস্ব বলেই বোধহয় এত ভাল লাগে! একই ভাল লাগায় বুঁদ হয়ে যেতে হয় জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তীর 'ভাটিয়ালী' পড়তে পড়তে। হাওড়ের বর্ণনা মন কেড়ে নেয়। তবে ১৩৮৫ বঙ্গাব্দের ওই গল্পটি বুঝিয়ে দেয় লেখক তখনও ছোট গল্পের নির্মাণ সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হননি।

পীযূষ ভট্টাচার্যর 'খুনী' ছোট গল্প হিসাবে যথেষ্ট পরিণত। সহজ সরল ভাষা আর গতির জোরে পাঠককে বাধ্য করেন প্রায় এক নিঃশ্বাসে আখ্যায়িকাটি পড়ে ফেলতে। গল্পকারের কৃতিত্ব ঈর্ষণীয়।

প্রতিভা সরকারের 'ভাসান'-এর গতি আছে, আছে বিষয়ের চমক আর ভাষার স্বচ্ছতা। যে তীব্রতার সঙ্গে লেখিকা অমোঘ প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন তার ঝাঁঝ আমাদেরও ছুঁয়ে যায় বলে গল্পটি উল্লেখনীয় হয়ে ওঠে সহজেই। ড. বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচীর 'রিসার্চ' এক ভিন্ন স্বাদের গল্প। দাম্পত্য সম্পর্ককে এক নতুন মাত্রায় তুলে ধরেছেন লেখক — একে ভাল বা খারাপ, কিছুই বলা যাবে না ঠিকই কিন্তু মনে ছাপ রেখে যাবে। ব্রততী ঘোষ রায়ের 'নবীন সরকারের জীবন পাঁচালীতে' কেমন যেন চেনা গন্ধ। সাদা কেবলই সাদা আর কালো মানেই নিকষ আঁধার — এমনতর জীবনবোধে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের এ গল্পটি ভাল লাগবে। 'কদমডালির সাধু' ভগীরথ মিশ্র-র বাস্তবধর্মী রচনা। উপোসি বাংলার নিখুঁত একখানি ছবি আঁকায় লেখক যথেষ্ট মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। ঠিক একই রকম সাধুবাণ প্রাপ্য ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়ের, শিখ উগ্রপন্থী সমস্যা নিয়ে গল্প-উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে তেমন চোখে পড়ে

না — দিব্যেন্দু পালিতের একটি উপন্যাস ছাড়া আর কিছু এ ক্ষেত্রে মনেও পড়ছে না। এ রকম ভিন্নধর্মী একটি বিষয়কে এমনই দক্ষতার সঙ্গে লেখক তাঁর 'বিন না বাজাও' গল্পে তুলে ধরেছেন যে প্রশংসা না করে পারা যায় না। তবে একটা কথা, বিন-এর বানান কি 'বীণ' হওয়াই বাঞ্ছনীয় নয়?

শিবানী রায়-এর 'পাখি মানুষ'ও অনন্য। কচি গলার ডাক যেন কানে বাজে, 'কাকু, তোমাদের কি মা নেই?' সুমনা ঘোষ-এর 'শিকড়' পারিবারিক সম্পর্কের বিচিত্র টানাপোড়েনের এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। হাম দো হামারা দো—এর এই যুগে পরিবার, বংশ ও তার লতাতন্তুজাল ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে বলেও এ রকম কাহিনি আমাদের শিকড়ের দিকে ফেরায়। বাজুন কিসকুর কথা বলা হয়নি। 'একটি জীবন্ত মানুষের জন্য' যে 'তার বউকে অন্ধকারে জলের স্রোতে ভাসায় দেয়' সেই বাজুন কিসকু যে একটু অন্য রকমের মানুষ, সে কথা বোধ হয় বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে শেষ যে ছত্রের উদ্ধৃতি দেওয়া হল, ওই বাক্যটিতে বউ যে মৃত সে কথাটার উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। যাই হোক, এমন একটি প্রচেষ্টার জন্য সুগত চট্টোপাধ্যায়ের অবশ্যই সাধুবাদ প্রাপ্য।

'অশ্বমেধ' গল্পে তেমন কিছু নতুনত্ব নেই। তবে প্রায় দু'দশক আগের যে সময়ে এই গল্পটি রচিত বলে প্রকাশকাল থেকে ধরে নেওয়া যায়, তার কয়েক বছর আগে অবশ্য আমরা এ জাতীয় বেশ কিছু অসাধারণ লেখা বাংলাসাহিত্যে পেয়েছি। তবে রাজনৈতিক গন্ধ মাখানো গল্প লেখাটা যে ক্ষুরধার অসির ওপর দিয়ে হাঁটা সে কথা হয়ত এবার লেখকের উপলব্ধি হয়েছে।

সম্পাদক মশাইকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এই সংখ্যাটিতে অনুবাদ-গল্প রাখার কি খুব প্রয়োজন ছিল? বরং বারান্তরে মধুপর্ণীতে প্রকাশিত অনুবাদ গল্পগুলি নিয়ে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করলে ভাল হত।

পরিশেষে বলি, এই সংখ্যাটিতে প্রকাশিত গল্প সম্পর্কে সম্পাদক স্বয়ং সাফাই গেয়েই গেয়েছেন এই বলে যে "একই গল্প তার বিষয়বস্তু ও রচনারীতির জন্য বিভিন্ন পাঠকের কাছে মোটামুটি, বেশ ভাল এবং গল্পই হয়নি — এইরকম বিভিন্ন মতামতের সম্মুখীন হতে পারে।" তবে তাঁর মতামত নিশ্চয়ই তাঁর নিজস্ব, কেননা একই গল্প যে কি করে পাঠকভেদে 'বেশ ভাল' এবং 'গল্পই হয়নি' অভিধা পায়, তা বোঝা গেল না। গল্পের উৎকর্ষের বিচার তো পরে হবে, আগে দেখা দরকার সেটি গল্প ন্যূটো হল কি না। একটি রচনাকে ছোট গল্প বলে ধরে নেওয়ার যে সব শর্ত আছে তা যদি পাঠক আদৌ না জানেন সে বাবদে লেখককে দোষী করা চলে কি? 'মধুপর্ণী বাছাই গল্প'র মুদ্রণ-পারিপাট্য ও অঙ্গসৌষ্ঠব ভালই তবে দামটা কিছুটা বেশিই।

মধুপর্ণী বাছাই গল্প ১৯৬৫-২০০০ — সম্পাঃ অজিতেশ ভট্টাচার্য/বালুরঘাট/৮০.০০

আনসারউদ্দিন ও বীরেন শাসমলের গল্প

রুচিরা সেনগুপ্ত

আধুনিক জীবন ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে। নগরজীবনে মানুষকে দ্রুত গ্রাস করছে আশ্রয়হীনতার আতঙ্ক, ক্রমশ একা হয়ে যাচ্ছি আমরা। গ্রামীণ জীবনও শহরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার নিজস্বতা হারাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এখনও সেখানকার আকাশ-মাটি-জীবন আমাদের শহুরে মানুষদের অনেকটাই অচেনা।

'আনসারউদ্দিনের ছোটগল্প' এবং বীরেন শাসমলের 'মাছেরা' গল্প সংকলন দুটি মোটামুটি গ্রাম-মফস্বল শহর এবং কলকাতা ও তার মানুষজনদের নিয়ে লেখা। দু'জন লেখকই তাঁদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, রচনাকৌশল ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিজস্বতা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাঁদের উভয়ের লেখার মূল বিষয় অবশ্যই মানুষ এবং প্রায়শই সমকাল। এই কারণেই দু'জনে ভিন্নগোত্রের শিল্পী হয়েও জীবনবোধে কোথায় যেন এক হয়ে যান।

প্রতিক্ষণ প্রকাশিত আধুনিক ছোটগল্প গ্রন্থমালার এক বিশেষ সংযোজন আনসারউদ্দিনের ছোটগল্প। গ্রন্থের প্রাক কথন অংশে লেখক আমাদের জানিয়ে দেন তাঁর গল্পের মূল সুরটি গ্রামীণ। আজন্মকাল গ্রামে লালিত বলেই তিনি বলতে চেয়েছেন সেই সব মানুষের কথা যাদের বাস আমাদের অভ্যস্ত নাগরিক জীবন থেকে বেশ কিছুটা দূরে। কংক্রিটের শহর কলকাতায় দু'কামরার সাজানো ফ্ল্যাটে অধিকাংশ মানুষ যখন জানালার ফ্রেমে আটকানো একফালি আকাশ দেখতে দেখতে ক্লান্ত তখন এই ধরনের গল্প আমাদের ছোট গণ্ডির বাইরে ছড়িয়ে থাকা বিশাল অজানা জীবনকে অন্তত কিছুটা হলেও চিনতে সাহায্য করে।

সংকলনে প্রকাশিত এগারোটি গল্পের প্রত্যেকটিতেই উঠে এসেছে সাধারণ গ্রাম্য মানুষ এবং তাদের নানান সমস্যা। তাদের চাওয়া-পাওয়া, সুখ-দুঃখ অর্থাৎ অকৃতার্থ জীবনকথা। কয়েকটি গল্পে সংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমান মানুষকে তুলে ধরেছেন লেখক (ফারায়েজ, ফরজ গোসল, আকিকা ইত্যাদি)। এদের সম্বন্ধে আমরা অনেকেই বিশেষ কিছু জানি না। তাদের ভিন্নধরনের

প্রাত্যহিক দিনযাপনের বর্ণনা সচেতন পাঠককে টানবে, ভাবাবে। হাজি গোলাম নবী, ওসমান সাহেব প্রভৃতি চরিত্রের ঈশ্বরভীতি, অন্ধবিশ্বাস সমস্তই আনসারউদ্দিনের হাতে অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। বেহস্তে যাবার কী তীব্র আকাঙ্ক্ষা এদের, তাই জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মেপে চলেন এঁরা। কিন্তু এরই মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে জীবনের অন্তঃসারশূন্যতার কথা। তাই 'ফারায়েজ' গল্পে বৃদ্ধ হাজি সাহেব পুত্রের মৃত্যুর পর অসহায় পুত্রবধূ এবং বালক নাতির জন্য কিছু করা উচিত এ কথা উপলব্ধি করেও থেমে যান, 'ভাবেন হায়াতের কথা। এই যে ছেলেটা তাঁর নিত্য সহচর একেই বা কি দিয়ে যেতে পারবেন তিনি। যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির এক কানাকড়িরও হকদার নয় সে। ইসলামি ফারায়েজ বলে, পিতার আগে পুত্রের মৃত্যু হলে সেই পুত্রের ঔরসজাতরা ওয়ারিশ হিশাবে গণ্য নয়। হাদিশ কি এমনই নির্মম।'

কয়েকটি গল্পে লেখক নাগরিক জীবন থেকে লুপ্তপ্রায় কিছু শ্রেণীর কথা বলেছেন। বেশ কয়েক বছর আগেও শহরের অলিতে গলিতে নিস্তব্ধ দুপুরের বুক চিরে শোনা যেত চিৎকার, 'শিল কোটাবেন শি-ল।' আজ এই ডাক কমই কানে আসে আমাদের। 'শিল্পী' গল্পে গাঁ-গঞ্জের এক শিল-কোটানির কাহিনি বলা হয়েছে। সে শিলের উপর আঁকে কখনও বাবরি মসজিদ আবার কখনও রামমন্দিরের ছবি। এই মানুষটির মধ্যে এক শিল্পী-মন লুকিয়ে আছে। শিল-কোটানির সামান্য ভুলে যখন হিন্দু বাড়ির শিলে আঁকা হয় বাবরি মসজিদের ছবি, এবং মুসলমান পরিবারে চলে আসে রামমন্দিরের চিত্র তখন দুই দলের টানাপোড়েনের মাঝখানে অসহায় নামহীন শিল্পীর বেদনা আমাদের স্পর্শ করে। 'বাস্তু উদ্বাস্তু' গল্পে পাই ফটিক কামারের কথা। যার মধ্যেও রয়েছে এক খাঁটি কারিগর। গল্প দুটিতে অত্যন্ত বাস্তবভাবে উঠে এসেছে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ছবি।

সম্পর্কের জটিলতার নানা দিক 'প্রতীক্ষা', 'আল' প্রভৃতি গল্পে ফুটে উঠেছে। মনে দাগ কাটে প্রবাসী বি-এস-এফ জওয়ানের যুবতী স্ত্রী শিলাবতীর নিঃসঙ্গতা, সদ্য পত্নীহারা মুবার এবং নিরুজানির মানসিক টানাপোড়েন কিংবা গরিব মেঘনাথ ও তার স্ত্রী কাজলির রাগ-অনুরাগের সহজ ছবিগুলি। এদের নিঃসঙ্গ, উপোসি জীবনের গল্প বলার ফাঁকে ফাঁকে আনসারউদ্দিন বলে চলেন গ্রামসমাজের বিভিন্ন সংস্কার এবং রীতি নিয়মের কথা।

সাম্প্রতিক বাংলা গদ্যসাহিত্যে আনসারউদ্দিনের ছোটগল্প এক ভিন্নতর মাত্রা আনবে সন্দেহ নেই। তার অন্যতম একটি কারণ হল তিনি তাঁর সৃষ্ট-চারত্রগুলিকে অত্যন্ত ভাল করে চেনেন। ব্রাত্য মানুষ — যাদের অনেকের জীবন এই এককিংশ শতাব্দীতেও ডুবে আছে ঘন অন্ধকারে — তাদের কথা আমরা কতটা ভাবি? আনসার এই খানেই আমাদের একটু নাড়া দিতে চেয়েছেন এবং সে ক্ষেত্রে তিনি অনেকটাই সফল। এই মানুষদের শরীরের উষ্ণতা, তাদের গায়ের ধুলোমাটি স্পর্শ করে আমাদেরও। নিজের সম্প্রদায়ের সমালোচনাও তিনি অত্যন্ত সৎসাহসের সঙ্গে করেছেন। যৌনতা তাঁর গল্পে অনিবার্যভাবে এসেছে, কিন্তু তার বর্ণনা সংক্ষিপ্ত, সংযত। এ কথা মনে রাখতে হবে অলস দুপুরে ভাতঘুমের সঙ্গী হবে না এই গল্পগুলি। কারণ লেখক মিষ্টি প্রেম বা ইচ্ছাপূরণের কাহিনি লিখতে বসেননি। কিন্তু যারা বলিষ্ঠ গল্প চান, চান ভাল গদ্য — তাঁদের টানবে এই গল্প।

আনসারউদ্দিনের কয়েকটি গল্পের কোনও কোনও শব্দের অর্থ সাধারণ পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হতে পারে। পড়তে পড়তে অনেক সময় হোঁচট খাই আমরা। কেবলমাত্র 'ফরজ গোসল' গল্পটিতে তিনি শব্দের অর্থ বলে দিয়েছেন। দুরূহ শব্দগুলির অর্থের একটি তালিকা বইয়ের শেষে পাওয়া গেলে ভাল হত।

বর্তমান বিশ্বে আমাদের গমনাগমন আলো থেকে কেবলই অন্ধকারে, অনেকসময়ে আমাদের মন 'তিমিরবিনাশী' হতে চাইলেও পারে না — বীরেন শাসমলের 'মাছেরা' গল্প সংকলনে এই বেদনা স্পষ্ট। গল্পসংগ্রহের তেরোটি গল্পের উপজীব্য হল পচনশীল সমাজ। যেখানে দাদুর মুখে রূপকথা শুনলে শিশুর কপালে জোটে মায়ের বকুনি, কিশোরীর প্রথম প্রেম অর্থলোভী প্রেমিকের আঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় কিংবা বেকার যুবক শুধুমাত্র যে কোনও কাজের আশায় থাকতে থাকতে স্বপ্ন দেখতেই ভুলে যায়, আর প্রেমহীন দাম্পত্য কেবলই বহন করে আনে গ্লানি।

'মাছেরা' বইটিতে উঠে এসেছে আমাদের চেনা মানুষজন। তাদের কেউ নাগরিক, আবার কেউ মফস্বল-আধা মফস্বলের বাসিন্দা। চেনা-অচেনা নানান ঘটনা অর্থাৎ মানুষের জীবন নিয়ে কাহিনি বুনতে চেয়েছেন লেখক। জেনারেশন গ্যাপ কয়েকটি গল্পের বিষয়বস্তু। এ ক্ষেত্রে লেখক সাবলীল। গল্পগুলিতে সমকালীন নগরকেন্দ্রিক সমাজ-সমস্যার বাস্তব ছবি পাই। ভুবনবাবু যেন আমাদেরই একজন। পত্নীবিয়োগের পর নিঃসঙ্গ মানুষটি আঁকড়ে ধরতে চান ছোট্ট নাতিকে। পুত্রবধূ মেঘনা টুকাইকে বানাতে চায় সব বিষয়ে এক্সপার্ট। কিন্তু টুকাইকে টানে দাদুর বলা কলম্বাসের গল্প। আর মেঘনার সঙ্গে ভুবনবাবুর দ্বন্দ্ব বাধে সেখানেই। ঘটনা চূড়ান্ত রূপ পায় যখন একদিন ভোর চারটেয় ব্রাহ্মমুহূর্তে ভুবনবাবু গৃহত্যাগ করেন (ভুবনবাবু বাড়ি ছাড়ছেন)।

'আঠারো বছর বয়স' গল্পে স্কুলের বীথি ম্যাম তাঁর ছাত্রছাত্রীদের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে থমকে যান। এ যুগের ছেলেমেয়েদের চিন্তাভাবনার সঙ্গে মেলাতে পারেন না নিজেকে। ধাক্কা খায় তাঁর স্বপ্ন, আদর্শ। কোনও এক দূরতর দ্বীপের বাসিন্দা

বলে মনে হয় নিজের সন্তানকে, এমনকী কখনও কখনও স্বামীকেও। যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে স্বামী বিজনের পরিবর্তন বীথির সঙ্গে বিস্কত করে পাঠককেও।

'বজ্রকীট' গল্পে হরিমোহনের কাছে অচেনা বলে মনে হয় নতুন পৃথিবী। বৃদ্ধের মনে হয় এই জগৎ কিছু দিন বাদেই ধ্বংস হয়ে যাবে। ছেলের সঙ্গে দূরত্ব ক্রমশ বাড়ে, স্বপ্নগুলি ধূসর হয়ে যায়। শুকনো নীতিকথায় যে এখন আর 'টিঁড়ে ভেজে না' — তা ছেলের মুখ থেকে জানার পর তার বেদনা ছুঁয়ে যায় আমাদেরও, 'ঈশ্বর, তুমি এদের ক্ষমা করো। কিন্তু এ অজ্ঞানতায় এদের জীবনটাই কুরে কুরে খেয়ে নেবে শূককীট।'

শহর কলকাতার নিঃসঙ্গ মানুষজনের ছবি লেখক আঁকতে চেষ্টা করেছেন 'কিটিপার্টি' গল্পে। 'আসলে সব কিছুর মূলে থাকে ভালোবাসা, এখন প্রতিদিন যা করছি, এ শুধু প্রতিদিনের অভ্যাস। এই দেখ, হতে চেয়েছিলাম কবি, হয়ে গেলাম আইনজীবীর বউ। ইন্ডিয়ান পেনাল কোড কবিতাকে খেয়ে ফেললো।' প্রাত্যহিক নাগরিক জীবনের গ্লানি হয়ত এই ভাবেই মনের গভীরে নিয়ে আসে ক্লান্তি। কখন যেন দূরত্ব তৈরি হয়ে যায় দীর্ঘ দিন এক সঙ্গে বসবাসকারী দু'জন মানুষের মধ্যে। দিন যাপন পরিণত হয় অভ্যাসে। 'কিটিপার্টি' গল্পের গৃহবধূ অঞ্জু, মীনাক্ষী, রীতা, কেয়া সকলেই শহরের ভিড়ের মধ্যে বড় একা, হাজার স্কোয়ার ফিট ফ্ল্যাটে মেলাতে পারে না নিজেদের। ছেলেকে স্কুল থেকে আনতে যাওয়া যাদের কাছে একটা রিলিফ। এই মায়েরা মিলে মাঝে মাঝে মেতে ওঠে কিটিপার্টিতে। যেখানে অনিবার্যভাবে যৌবনের রঙিন স্মৃতিরোমন্থনের সঙ্গে সংঘাত বাধে বাস্তবজীবনের।

মনে দাগ কাটে লেখাপড়া জানা বেকার নীরেনের গল্প (দিন তো গেল)। নীরেনের মধ্যে আমরা অনেকেই নিজেকে খুঁজে পাব। তবে এই কাহিনি রুক্ষ বাস্তব জীবনের হলেও লেখার স্টাইলের মধ্যে হালকা কাব্যময়তা লুকিয়ে আছে। নীরেনের মস্তিষ্কে যে চেতনার স্রোত বয়ে যায় তার বর্ণনা উল্লেখের দাবি রাখে। স্বপ্ন আর বাস্তবের টানাপোড়েনে গল্পটি আলাদা মাত্রা পেয়েছে। 'হালিমা', 'আগুনের রং', 'কানাই এখন জোয়ান হয়েছে'

জাতীয় গল্পে বীরেন শাসমল তথাকথিত সাধারণ মানুষকে ধরার চেষ্টা করেছেন। বছর তেইশেক বয়েসের ফর্সা রোগা হালিমার 'শরীরের শুধু কাঠামোটা ছাড়া মাংস নেই, শরীরে কোন রেখা নেই, ঢেউ নেই, কেমন সমাস্তরাল।' গল্পটিতে তার স্বপ্ন-আশা-আকাঙ্ক্ষা-হাসি-কান্না, তার মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা—সমস্ত কিছুর বর্ণনাই বেশ জীবন্ত। হালিমার জীবনের উষ্ণতা আমাদের স্পর্শ করে। তার চলমান জীবনের জলছবি বর্ণনায় লেখকের সহানুভূতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর তাই রূঢ় জীবন বর্ণনার সময়েও লেখকের চোখে লেগে থাকে স্বপ্ন। কারণ স্বপ্ন ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব তো অনেকটাই অর্থহীন।

সংকলনের নামগল্প 'মাছেরা'-তে রয়েছে ঘুণধরা বিবর্ণ পৃথিবীর কথা। এখানে শুধুই মানুষের ভিড়, অন্য কারোর স্থান সেখানে নেই বললেই চলে। এই বন্ধ্যা পৃথিবীতে প্রাণিকুল আজ বিপন্ন। তাদের কথা ভাবেন ডাক্তার নীলরতন। তিনি অনুভব করেন এক দিন জলের তলা থেকে উঠে আসবে হাজার হাজার মাছ, ধ্বংস করবে মানুষের গড়া এই সাজানো জগৎ। এখানে লেখকের পরিবেশসচেতনতা প্রশংসনীয় হলেও গল্পরসের অভাবে কাহিনি নিটোল হয়ে উঠতে পারেনি।

গল্পের স্টাইল নিয়ে পরীক্ষা করেছেন তিনি। দু'টি গল্পের বিভিন্ন অধ্যায়ের দীর্ঘ নামকরণে তা প্রকাশিত। কয়েকটি গল্পে নিটোল কাহিনির বদলে চলমান জীবনস্রোতের বর্ণনা আছে। 'কবচকুণ্ডল' গল্পটিতে দ্বেন্দ্ব ও যতি চিহ্নের ব্যতিক্রমী ব্যবহার উল্লেখের দাবি রাখে। তবে তীব্র কুঠার প্রকাশিত 'মাছেরা' গল্পসংকলনের প্রত্যেকটি গল্পের প্রথম কিছু অংশ বড় হরফে ছাপা কেন বোঝা গেল না। নিছকই দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা নাকি নতুনত্ব সৃষ্টির তাগিদ? এ ছাড়া মাঝে মাঝে মুদ্রণপ্রমাদ চোখে পড়ে। স্বতন্ত্র শাসমল-কৃত ধূসর প্রচ্ছদে দেখা যায় পাতালগৃহ থেকে অসংখ্য আলোকসন্ধানী মাছ উপরে উঠে আসছে। প্রচ্ছদটি গ্রন্থের মূল সুরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

আনসারউদ্দিনের ছোটগল্প/প্রতিক্ষণ, কলকাতা-১৩/৩৫.০০

মাছেরা—বীরেন শাসমল/তীব্র কুঠার, কলকাতা-৯৭/৫০.০০

কর্ণ যে-উপন্যাসের নায়ক

তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায়

"কে উ কেউ কামনা করেন মহত্ত্ব — মৃত্যুর মূল্যেও।" আর এভাবেই তাঁরা হয়ে ওঠেন 'মৃত্যুঞ্জয়'। মানুষই মৃত্যুঞ্জয় হতে পারে, দেবতা অমর — সেখানে মৃত্যুর সঙ্গে কোনও দ্বন্দ্ব নেই। মানুষ মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে ওঠে তার কীর্তির মহনীয়তায়। মহাভারতের এমনই এক মৃত্যুজিৎ ব্যক্তিত্ব মহারথী, দানবীর, রাধেয় অথবা কৌন্তেয় বসুসেন — কর্ণ। কর্ণই মারাঠা ঔপন্যাসিক শিবাজী সাবন্তের 'মৃত্যুঞ্জয়' উপন্যাসের নায়ক।

আমাদের প্রাচীন মহাকাব্যদু'টিকে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সমাজের ইতিহাস তথা "বৃহৎসম্প্রদায়ের কথা" বলেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাকাব্যের সৌন্দর্যকে পিরামিডতুল্য আখ্যা

দিয়েছিলেন। কিন্তু আধুনিক স্রষ্টারা যখনই সেই প্রাচীন বৃহৎ গাথার দিকে তাকিয়েছেন তখন তার সামগ্রিক আবেদনের থেকে খণ্ডিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক বক্তব্যের দিকেই আকৃষ্ট হয়েছেন। তাই উনিশ শতকীয় নবযুগের নায়ক হয়ে ওঠেন রাবণ। রবীন্দ্রনাথ নির্বাচন করেন গান্ধারী এবং কুন্তীর যন্ত্রণাকে। ভারতীয় লোক এবং লেখ্য সাহিত্যে বহুকাল ধরেই "ফিরে দেখা" প্রক্রিয়াটি চলছে। বিশেষত দক্ষিণী সাহিত্যে, মারাঠি নাটকে, পাণ্ডবানি লোকগাথায় মহাভারতের দিকপাল চরিত্রগুলি নানা ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত হয়েছেন। শিবাজী সাবন্তের 'মৃত্যুঞ্জয়' সেই ধারায় একটি সংযোজনমাত্র হতে পারত কিন্তু একই স্রোতঃপথে বাহিত হয়েও স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে একাধিক কারণে। যদিও এখানে সমালোচ্য রচনাটি মূল মারাঠি উপন্যাসের সংক্ষেপিত বঙ্গানুবাদ তবু সুপ্রভাত ভট্টাচার্যকৃত সেই "ট্রান্সক্রিয়েসন" থেকে মূলের বৈশিষ্ট্যগুলি চোখে পড়তে অসুবিধে হয় না।

এ রচনার অনন্যতা বহুবিধ এ কারণে যে মহাভারতের কাহিনি নিয়ে রচিত উপন্যাসে সংখ্যা ভারতীয় সাহিত্যে সীমিত। তদুপরি সেই প্রাচীন কথার উপস্থাপনায় ঔপন্যাসিক একেবারে বিংশশতাব্দীর কথাসাহিত্যের নব্য গঠনরীতিটি অবলম্বন করেছেন। কর্ণ, কুন্তি, দুর্যোধন, বৃষলী, শোণ, শ্রীকৃষ্ণ — এই ছ'টি চরিত্রের আত্মকথন গ্রন্থনার মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতকথা আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের চেহারাটি পরিগ্রহ করেছে। একশো বছরেরও অনেক আগে অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র 'ইন্দিরা' আর 'রজনী'-তে বাঙালি লেখক ও পাঠককে আত্মকথন ভঙ্গিটির সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিলেন। তারপর গত শতাব্দীতে 'ঘরে-বাইরে', সমরেশ বসুর 'বিবর', বিমল করের 'অসময়' এ সব পেরিয়ে পাঠক জেনেছেন, এমন এক ভঙ্গি — যা চরিত্রের মনের কল্পালটাকেও চিনতে সাহায্য করে — চেনা মানুষগুলোর ভেতরকার কত অচেনা সত্তা পাঠককে চমৎকৃত করে। আর এইসব প্রাচীন মহাভারতীয় চরিত্র আমাদের চেনাজানার সীমায় প্রবাদপ্রতিম তবু কত রহস্যময়, এখনও কত অধরা। সেই সব অজানিত অন্ধকার কোণগুলিকে আলোময় করতে চেয়েছেন লেখক একটু অন্যধারার আশ্রয়ে।

ন'টি পর্বে গ্রথিত অনূদিত উপন্যাসটি যেহেতু মূল মারাঠি রচনাটির সংক্ষিপ্ত রূপ এবং অনুবাদকের কোনও ব্যাখ্যাও সংযুক্ত নয়, তাই বোঝা যায় না, মূলরচনাটি ক'টি পর্বে বাঁধা। যাই হোক, এই ন'টি পর্বসীমায় কর্ণের আত্মকথা চারটি। বস্তুত যে চারটি আত্মকথা এ উপন্যাসের নাটকীয় পঞ্চসন্ধিকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। চারটি আত্মকথার নামভূমিকায় কর্ণ ধাপে ধাপে সূতপুত্র বসুসেন থেকে 'অঙ্গরাজ' কর্ণ, দুর্যোধন মিত্র ও পাণ্ডবশত্রু কর্ণ থেকে দানবীর দিগ্বিজয়ী কর্ণ, বৃষলী-সুপ্রিয়ার স্বামী, ছয় পুত্রের পিতা কর্ণ থেকে প্রচ্ছন্ন পাঞ্চালীপ্রেমিক, রাধেয় ও কৌন্তেয় সত্তায় বিদীর্ণ কর্ণ হয়ে ওঠেন। কুন্তী, বৃষলী, শোণ, দুর্যোধন এবং শ্রীকৃষ্ণের আত্মকথাগুলি সেই 'হয়ে ওঠা'-র প্রেক্ষাপটটি রচনা করে দেয়। আর এ সবের মাঝে দু'টি অশ্রুসজল মুক্তাবিন্দুর মতো নিটোল শান্ত আলো ছড়িয়ে দিয়েছে মহাকাব্যে উপেক্ষিত কর্ণপত্নী বৃষলী আর কর্ণভ্রাতা শোণ-এর আত্মকথন। যা অবশ্যই লেখকের ঔপন্যাসিক অনুসন্ধিৎসা ও প্রজ্ঞার ফসল।

প্রাচীন মহাভারতকার আমাদের সঙ্গে যে কর্ণের পরিচয় করিয়েছিলেন তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পটভূমিতে আপন জন্মরহস্য জানেন, যন্ত্রণাদগ্ধ হন কিন্তু স্বধর্মচ্যুত হন না, পাণ্ডুপুত্রদের জীবন সম্বন্ধে মা কুন্তীকে আশ্বস্ত করেন। পরবর্তীকালে অনেকেই কর্ণের জীবনের এই খণ্ডপর্বটুকু অবলম্বনে বিবিধ কাব্য, নাটকে কর্ণকে ট্র্যাজিক নায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। 'মৃত্যুঞ্জয়' উপন্যাসে আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্রে উজ্জীবিত কর্ণ কিন্তু জ্ঞানচক্ষু খোলা থেকেই সহজাত কবচ ও কুণ্ডল নিয়ে প্রশ্নাতুর। বাবরবাহন ভাই শোণ, মা রাধাকে জিজ্ঞাসা করেন, পরে নিজ পুত্রদের মধ্যেও বংশপরম্পরার চিহ্নস্বরূপ কবচকুণ্ডল সন্ধান করেন কিন্তু সকলের উত্তরহীনতা তাঁকে আরও বিড়ম্বিত, বিপর্যস্ত করে। এ উপন্যাসের কর্ণ নিজেই বিশ্বাস করেন না যে তিনি সূতপুত্র। যদিও সমস্ত পারিপার্শ্বিকতা, সামাজিক গতিপ্রকৃতি তাঁকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় যে তিনি নীচকুলোদ্ভব। অথচ কবচকুণ্ডলধারী, সূর্যপ্রতিম উজ্জ্বল, স্বর্ণকেশী পুরুষশ্রেষ্ঠ কী করে নীচকুলজাত হন — এই বৈপরীত্যে ক্ষতবিক্ষত কর্ণকে সংকটমুক্তির পথ দেখান প্রিয়বন্ধু অশ্বত্থামা। নীচকুলের দোহাই দিয়ে পাণ্ডবের প্রতি অন্ধত্বে ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষাদানে অসম্মত দ্রোণকে যখন অন্যজ-প্রতিনিধি তুল্য কর্ণ প্রশ্ন করেন, "উচ্চকুলোদ্ভব ছাড়া কেউ কি বিদ্যালাভ করতে পারবে না?" তখন পিতা নিরুত্তর থাকলেও, পুত্র অশ্বত্থামা বন্ধু কর্ণকে এ ভাবে জীবনমুখী মার্গ প্রদর্শন করেন, — "তুমি যদি এখনও অন্তর্দ্বন্দ্বে বিচলিত থাক — তো তার থেকে মুক্ত হয়ে, বাহিরে এসে — আত্মপরীক্ষা করে, বিচার করে, স্থির কর তুমি কে। ... যেদিন তোমার অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘুচবে, সেদিনই সংসার তোমার পদতলে নত হবে।" জন্মরহস্যের অতীতচারণা থেকে বেরিয়ে এসে কর্ণ এবার মুখোমুখি হন বর্তমানের। তাঁর প্রজাবাৎসল্য, ভ্রাতৃপ্রীতি, ন্যায়নিষ্ঠ পত্নীব্রত, দানশীলতা তাঁকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে। পিতা অধীরথ যেভাবে যথার্তীয় বলে কর্ণকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছেন, কর্ণের তার আর প্রয়োজন থাকে না। দিগ্বিজয়ী কর্ণ তখন শোণকে বলতে পারেন, "আমাদের জীবন জন্মের যোগাযোগের চেয়ে সৎকর্মের উপর নির্ভর করে।" এ ভাবে কর্ণ সমাজসংস্কারক-গোষ্ঠীনেতা হয়ে ওঠেন। জন্ম অপেক্ষা কর্মই যে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করে এ কথাই কর্ণ তাঁর সমগ্র জীবনপরিক্রমায় তুলে ধরেছেন। প্রাচীন ভারতকার দেখিয়েছেন, কর্ণ দুর্যোধনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন আর এ যুগের ঔপন্যাসিক সেই প্রতিশ্রুতির সীমাকে আরও প্রসারিত করেছেন। কর্ণ শুধু ব্যক্তির কাছে নন,

সমস্ত গোষ্ঠীর কাছে, শূদ্রসমাজের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন। দুর্যোধন মিত্র হিসাবে, দ্বিধিজ্ঞী রূপে কিংবা দানশীল হিসাবে কখনওই তিনি নিজেকে সূর্যপুত্র মনে করে আত্মশ্লাঘা অনুভব করেননি। অথচ এই প্রতিটি কর্মপ্রণালীতে তাঁর প্রবল অহং জড়িয়ে ছিল কিন্তু সে অহমিকা সূতপুত্রের। এই অহংকারের অর্থ বোঝেন না স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও। যাচক ইন্দ্র সহজাত কবচ গ্রহণ করতে এসে তাই কর্ণের সেই দুর্বল জায়গায় আঘাত করেন। অথচ কর্ণ কৃষ্ণকে কুণ্ডল এবং ইন্দ্রকে কবচ দান করার জন্য নিজেই উদগ্রীব হয়ে প্রতীক্ষারত ছিলেন। কেননা নীচকুলজাত কর্ণ দেবতাকে দান করার দৃষ্টান্ত স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। আর কবচকুণ্ডলের বন্ধনমুক্তি তাঁর সূতপুত্রের পরিচিতিকে আরও প্রশস্ত হতে সাহায্য করে। কর্ণ যথার্থ জনপ্রতিনিধি হয়ে ওঠেন।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরসভায় অর্জুন কর্তৃক কর্ণপুত্র সুদামনের হত্যা, দ্রৌপদীর অপমান, দ্রোণ ও পরশুরামের অবহেলা, ইন্দ্রকে কবচ দানের শরীরীযন্ত্রণা, প্রিয় ভাই শোণের পতন কর্ণকে আরও বেশি ভাগ্যনির্ভরতা থেকে কর্মে বিশ্বাসী করে তোলে। অথচ এই কর্মশক্তিতে বিশ্বাসী মানুষটিকে সারাজীবন কর্মের প্রতিকূলতাকে সহ্য করতে হয়েছে। দুর্যোধনের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কর্ণ সভাস্থলে দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিবাদ করতে না পারার ফলস্বরূপ পাঞ্চালীর শ্রদ্ধার্ঘ্য থেকে বঞ্চিত হন। ভীষ্মকে সেনাপত্যে বরণ করার মহানুভবতা প্রদর্শন করার প্রতিফল হিসাবে বহু প্রতীক্ষিত পাণ্ডববিরোধী যুদ্ধ থেকে ষোলো দিন সরে থাকতে হয়। এমনকী পাণ্ডব সমর্থক রাজা শল্যকে দুর্যোধনের অনুরোধে সারথিরূপে নির্বাচনে উদারতা দেখান যে মানুষটি, সেই শল্যেরই অকর্মণ্যতায় সৈন্যদের দেহাবশেষ ও রক্তে কুরুক্ষেত্রভূমিতে তাঁরই রথের চাকা অনড় হয়।

ভবিষ্যৎদ্রষ্টা কৃষ্ণ কর্ণকে সতর্ক করেছিলেন : "কৌরবের অন্যায়পক্ষ সমর্থন করলে আলোর পুত্র হওয়া সত্ত্বেও তুমি অন্ধকারে সমাপ্ত হবে। এই রূপেই কোটি কোটি আর্যের মনে, লক্ষ বৎসর ধরে, অবজ্ঞায় জীর্ণ করে দেবে তোমার স্মৃতি।" হয়ত এমন আশঙ্কা ছিল রবীন্দ্রনাথের কর্ণেরও, তিনিও অনুভব করেছিলেন, "এই শান্ত স্তব্ধকণে/অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে/জয়হীন চেষ্টার সংগীত, আশাহীন/কর্মের উদ্যম — হেরিতেছি শান্তিময়/শূন্যপরিণাম।" এ উপন্যাসেও কবচকুণ্ডলহীন, অভিসম্পাতে দগ্ধ, পুত্রহারা, ভাইহারা, পরম মিত্র সত্যসেনের মৃত্যুতে কর্ণ উপলব্ধি করেন তিনি এক 'শূন্য পরিণাম'-এর দিকেই এগোচ্ছেন। মহাকাব্যিক প্রাচীন এই নায়ক আবহমানকালের সত্যটি উচ্চারণ করেন: "প্রত্যেকের জীবনই এক প্রকার অজ্ঞাতবাস নয় কি? দুঃখ থেকে দুঃখে যেতে চায় মানুষ, কিন্তু অধিকতর দুঃখে তার জীবন পরিবেষ্টিত হয়। পঁচাত্তর বছরের এই দীর্ঘ জীবনে, কত না মোড় ঘুরেছে, কত ওঠানামা, কত ভালমন্দ -- একের সঙ্গে অন্যের কোনও সংগতি নেই।" পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ কর্ণ এত বছরের রাধেয় সত্তা যাপনকে অজ্ঞাতবাসই ভাবেন, যখন অবহিত হন তাঁর সূর্যপুত্র পরিচিতি সম্বন্ধে। কিন্তু এই নতুন অস্তিত্ব যেন আর এক অজ্ঞাতবাসে তাঁকে ঠেলে দেয়। শেষ পর্যন্ত কর্ণ তাই একজন "বিশুদ্ধ মানুষ" হয়ে উঠতে চান। যেমন চেয়েছিলেন 'প্রথম পার্থ' কাব্যনাটকের কর্ণ, যাঁর ঘোষণা ছিল : "আমি কারোরই নই। কাউকে আমি আমার বলে ভাবি না। / আমি বিশুদ্ধভাবে আমি। তাছাড়া আর কিছু নয়।" বুদ্ধদেবের কর্ণের সঙ্গে মারাঠি লেখকের সৃষ্টির এই সাদৃশ্য সম্ভবত একই সময়জাত ভাবনার মিল।

সারা জীবনের নানা প্রতিকূলতায় পরাজিত বীর কর্ণ লালন করেছিলেন কেবল একটিমাত্র আকাঙ্ক্ষা — "কোটি কোটি কৌরবদের হৃদয়রাজ্যের একতা।" অথচ মৃত্যুতেও নিজে থাকতে চেয়েছিলেন একা — সমস্ত বন্ধনছিন্ন। যুদ্ধ শেষে উন্নবিংশ দিনে কুরুক্ষেত্রের পাশেই কর্ণের শেষ ইচ্ছানুযায়ী এক অনুর্বর শুষ্ক পাথুরে ভূমিতে যেখানে কোনও দিন কোনও বীজ অঙ্কুরিত হবে না সেখানেই ভগবান কৃষ্ণ কর্ণের চিতা রচনা করেন। যে বৃষলীর জন্য কর্ণ কৌন্তেয় হবার, ক্ষত্রিয় হবার সম্মানকে অস্বীকার করেছিলেন সেই বৃষলী চিতারোহন করেন। প্রেমিক চূড়ামণি কৃষ্ণ বৃষলীর বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধা, কর্ণপ্রেমের চিহ্ন ভাঙা কলসির টুকরো আপন উত্তরীয়তে বাঁধেন। মূলকাব্যে পঞ্চপাণ্ডব কর্ণের অন্ত্যেষ্টির "উদকক্রিয়া"(জলদান)-য় যোগ দিয়েছিল কিন্তু এই উপন্যাস শেষ হয়েছে এইভাবে — কর্ণের চিতায় অগ্নিসংযোগের জন্য পঞ্চপাণ্ডব মশাল হাতে সমবেত হয়েছে কিন্তু চিতা তখন ধূমায়িত। বড় বিলম্ব হয়ে গেছে। কর্ণের 'ষষ্ঠ পাণ্ডব' হয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। অবশ্য তার আর প্রয়োজনও থাকে না। কেননা কর্ণ মৃত্যুতেও 'সাধারণ মানুষ' হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন। মহাকবি ব্যাসদেব আমাদের সাধারণ কর্ণের সঙ্গে পরিচয় করাননি, শিবাজী সাবন্ত সেই অপূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করেছেন। একই মানুষের নানা ভাবমূর্তিতে আনাগোনার মধ্য দিয়েই অসাধারণ হয়ে ওঠার কাহিনি এই উপন্যাস। অপার খ্যাতিতে যিনি অলৌকিক ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন আবার তিনিই সেই যশের অসীম প্রলুব্ধতাতে সাধারণের মধ্যে মিশে যান। পরাজয়, অভিশাপ, অপ্রাপ্তি, প্রত্যাশার বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে রাজা, গোষ্ঠীনেতা, সেনাপতির উর্ধ্বে ব্যক্তিমানুষ, একাকী কর্ণই পাঠকের মনোজয়ী হয়ে ওঠেন। এ এক নিঃসঙ্গ পথিকের জীবনপরিক্রমা।

মূল উপন্যাসের পূর্ণস্বাদই সম্ভবত এ অনুবাদে অঙ্কুর রয়েছে। অথবা তা থেকে যদি কোনও বিচ্যুতি ঘটেও থাকে তাতে অনুবাদের কোথাও কোনও ভাবগ্রন্থি ছিন্ন হয়েছে বলে মনে হয় না। যদিও সুপ্রভাত ভট্টাচার্যের অনুবাদকে প্রকাশক পুনঃসৃষ্টিপ্রকরণ বলেই অভিহিত করেছেন এবং পাঠকও এ

ব্যাপারে হয়ত সহমত হবেন কারণ মূল মারাঠি রচনাটির কোনও আঙ্গলিকসুর এই বাংলা রূপান্তরে অবশিষ্ট নেই।

গ্রন্থটির পরিবেশনা বাংলা পুস্তক প্রকাশনা জগতে অবশ্যই কিছুটা অভিনবত্বের ছোঁয়া আনে। স্বর্ণালি অক্ষরে রঞ্জিত, কারুকর্মখচিত কাপড়ে বাঁধাই উচ্ছল আভিজাত্যপূর্ণ প্রচ্ছদটি অবশ্যই পাঠককে উনিশ শতকীয় নস্যাঁ ল্যাজিয়ায় আক্রান্ত করতে পারে তবে আখ্যাপত্রে প্রকাশক পরিচিতি, লেখক ও অনুবাদকের পরিচয়পর্বটি কেন যে ইংরেজিতে দিলেন তা বোঝা যায় না, যেহেতু উপন্যাসটি বাংলা। এমনকী সূচিপত্রের পরিবর্তে 'Contents' সংযুক্ত। শিবাজী সাবন্তের অন্যান্য গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং মূলগ্রন্থটির একটু বিস্তৃতপরিচয় থাকলে 'মৃত্যুঞ্জয়'-এর উৎস সম্পর্কিত নানা অনুসন্ধিৎসা চরিতার্থ হত। তবে এ সব ছোট ছোট বিচ্যুতি সত্ত্বেও গ্রন্থটির সর্বাঙ্গে পরিবেশনগত যে যত্নের ছাপ রয়েছে (প্রায় মুদ্রণপ্রমাদহীন) তা এখনকার দায়সারা কর্মধারায় নিশ্চয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মৃত্যুঞ্জয়–শিবাজী সাবন্ত/অনুবাদ — সুপ্রভাত ভট্টাচার্য/রাইটার্স ওয়ার্কশপ পাবলিকেশন্স/কলকাতা - ৪৫/ ২০০.০০, পেপার ব্যাক ১০০.০০

'জিজ্ঞাসা'-য় ডিরোজিও চর্চা

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

একবিংশ শতাব্দীর সূচনাবর্ষ ডিরোজিও-চর্চার ক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়ে রইল। এক, পৌনে দু'শো বছরের ইতিহাসে এই প্রথম প্রকাশিত হল ডিরোজিও রচনাসমগ্র। দুই, ডিরোজিওকে নিয়ে একটি লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ করল বিশেষ সংখ্যা। এমন ঘটনা আগে ঘটেনি তা নয় তবে এ বারের প্রয়াস পূর্বের সমস্ত প্রকাশকে ছাপিয়ে গেছে মানে ও পরিমাণে। প্রথম কাজটির সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম সুতরাং সে-নিয়ে কিছু বলছি না। আসি শিবনারায়ণ রায় সম্পাদিত 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকার (একবিংশ বর্ষ, দ্বিতীয়-তৃতীয় যুগ্ম সংখ্যা) ডিরোজিও বিশেষ সংখ্যাটির প্রসঙ্গে। সদ্য প্রকাশিত সংখ্যাটি হাতে নিলে চোখ জুড়িয়ে যায়। প্রচ্ছদে পরিচ্ছন্ন বর্ণবৈধ্যযুক্ত ডিরোজিওর প্রতিলিপি। উচ্চমানের পেপার ব্যাক। ছাপাই-বাঁধাই দুই সুন্দর, সম্ভ্রমপূর্ণ।

কী আছে ২১৫ পাতার এই সংখ্যাটিতে? প্রথমত আছে ডিরোজিওর মূল্যায়ন। এগারো জন পণ্ডিত ও ভাবুক এই মূল্যায়নের কাজে হাত লাগিয়েছেন। আছে এডওয়ার্ডসের লেখা ডিরোজিওর প্রথম জীবনী থেকে নির্বাচিত অংশের পুনর্মুদ্রণ। তাঁর কাব্য কবিতার কিছু নিদর্শন। ডিরোজিওর ১৫টি কবিতার মূলসহ বঙ্গানুবাদ। ডিরোজিওর জীবনমহিমা ও বিশিষ্ট ডিরোজিওপন্থীদের পরিচয়। হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিওর বিদায়কে কেন্দ্র করে যে চিঠিপত্র বিনিময় হয়েছিল মূল সহ সেগুলির বঙ্গানুবাদ। পরিশেষে অভিনব পরিকল্পনায় রচিত ডিরোজিও সংক্রান্ত রচনাপঞ্জি। এক কথায় বলা যায় ডিরোজিও-অনুরাগীদের প্রাপ্তির যে আয়োজন এ-সংখ্যায় আছে তা পর্যাপ্ত।

যে সব পণ্ডিত ও ভাবুকদের ডিরোজিও-ভাবনার সঙ্গে পাঠকরা এখানে পরিচিত হবেন তাঁরা হলেন রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, গৌতম নিয়োগী, তরুণ সান্যাল, সরোজ সেনগুপ্ত, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরাতুন নাহার, পল্লব সেনগুপ্ত, চিত্তব্রত পালিত এবং সর্বোপরি শিবনারায়ণ রায়।

বৈদগ্ধ্য ঝলকিত ইতিহাসবোধ, পরিব্যাপ্ত অধ্যয়ন ও বজ্রগর্ভ চিন্তায় সংহত প্রবন্ধ রচনায় রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও শিবনারায়ণ রায় দু'জনেই ওস্তাদ। এঁদের প্রবন্ধে দু'টি ডিরোজিও সংখ্যার উৎকৃষ্ট ফল। সন্দেহবাদী ডেভিড হিউমের কণ্ঠস্বর ডেভিড ড্রামন্ডের পাতন যন্ত্র চুঁইয়ে কীভাবে ডিরোজিওতে এসে পড়েছিল দাশগুপ্ত তা দেখাতে চেয়েছেন। আর শিবনারায়ণ From Derozio to Nazrul নামক অভিসন্দর্ভে দেখাতে চেয়েছেন নব্যবঙ্গে র‍্যাডিকাল মুভমেন্ট ডিরোজিও থেকে উত্থিত হয়ে গৌরবময় নানা বিসর্পিত পথ পেরিয়েও দ্বিভঙ্গ স্বাধীনতা লাভের ভারতীয় দুর্ভাগ্যে কীভাবে অবসিত হল। ঝড়ের পাখি কবি ডিরোজিওকে বাঙালির প্রাণের কবিতে পরিণত করে এবং ইতিহাসের নষ্টকোষ্ঠী থেকে ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ানদের উদ্ধার করে পল্লব সেনগুপ্ত ও গৌতম চট্টোপাধ্যায় অনেক কাল আগেই খ্যাতিমান। এখানে তাঁরা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ডিরোজিওর মৌলবাদ বিরোধী ও তারুণ্যের জয়পতাকাবাহী ভূমিকার কথা। তরুণ সান্যাল একই ফ্রেমে বাঁধা অজ্ঞেয়বাদী ডিরোজিও ও রেভারেন্ড লাল বিহারী দে র উনিশ শতকী দর্পণে বর্তমান সময়ের ঘাড় ধরে টেনে এনে বলেছেন আপনার মুখ আপনি দেখ। ব্রাহ্ম ও ইয়ং বেঙ্গলদের ভিন্ন হাঁড়ি গৌতম নিয়োগী যে ভাবে এক করে দিয়েছেন ভাবা যায় না। ডিরোজিওর সত্য দর্শনের শুদ্ধ স্বরূপটি ধরতে চেয়েছেন নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় আর সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ বিজ্ঞানের জটিল আবর্তময় প্রেক্ষিতে আঁকতে চেয়েছেন স্বাধীনতার ভাষ্যকার এক ফিরিঙ্গির সিল্যুট চিত্র।

পাশ্চাত্য শিক্ষার তরঙ্গকে স্বরাজ সেনগুপ্ত এমন বিক্ষুব্ধ করে তুলেছেন যে ডিরোজিওকে খুঁজতে পাঠকের নুলিয়া হওয়া ছাড়া উপায় নেই। চিত্তরত পালিত ভেঙে পড়ার আগেই ঝড়ের গতিতে পেরিয়ে যেতে চেয়েছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়ান মুভমেন্টের সীমা। সম্পূর্ণ সফল হতে পারেননি। তথ্যবিচ্যুতি ঘটে গেছে। লিখেছেন, 'ধর্মতলা অ্যাকাডেমিতে অঙ্গ্রীষ্টানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে তিনি তাঁর East Indian পত্রিকায় লেখেন' (পৃ. ৮১)। ব্যাপারটা একেবারে উল্টো। বরং ধর্মতলা অ্যাকাডেমি এই অনুদারতা থেকে মুক্ত ছিল বলে সন্তোষ প্রকাশ করে লিখেছিলেন, "It is quite delightful to witness the exertionus of Hindoo and Christian youth, striving together same classes of academical honours...." তথ্যের ভুল সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাতেও আছে। লিখেছেন, 'পর্তুগীজ ডিরোজিও ছিলেন রোমান ক্যাথলিক।' (পৃ. ৬৩) ডিরোজিও পরিবার (ঠাকুর্দা) মাইকেলের আমলেই প্রোটেস্টান্ট মতে সরে এসেছিলেন।

ডিরোজিওকে নিয়ে লিখতে হলে মস্তিষ্কের জটিল কলঘরে ঢুকতেই হবে এমন নয়, সংবেদনশীল হৃদয়ের নির্মল তন্ত্রীতে আঙুল ছোঁয়ালেও তাকে পাওয়া যায়। মীরাতুন নাহারের লেখাটি আমাদের ফিরিয়ে দেয় সেই সংবিৎ। এ ধরনের অ-র‍্যাডিক্যাল লেখা দু'একটি থাকলে ভাল লাগত। ক্যাসাবিয়াঙ্কাকে চিনতে হলে মাঝ সমুদ্রে আগুন ধরে যাওয়া জাহাজের পাটাতনে দেখাই ভাল। মধ্যযুগীয় জিঘাংসা যখন হিন্দু কলেজের ম্যানেজার বর্গের রূপ ধরে ডিরোজিওর মধ্যে জেগে ওঠা তরুণ রেনেশাঁসকে পিষে ফেলছিল তখন তিনি তীব্রভাবে অবিচলিত হৃদয়ে আত্মহত্ব করছিলেন সেই বৈদ্যুতিক প্রহার তা ধরা পড়েছে কলেজ থেকে বিদায়কে কেন্দ্র করে লেখা চিঠিপত্রের মধ্যে। উইলসন ও ডিরোজিওর সেই চিঠিগুলির ভাষান্তর করেছেন অতীন্দ্রমোহন গুণ। পরিকল্পনা সাধু, অনুবাদও সাধু।

১৮৮৪ সালে টমাস এডওয়ার্ডসের লেখা ডিরোজিওর প্রথম জীবনী থেকে নির্বাচিত সামান্য কিছু অংশ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। নির্বাচিত পুনর্মুদ্রণে আসতে পারত ডিরোজিওর মৃত্যুশয্যার মর্মস্পর্শী বিবরণ। ভয়ের উর্ধ্বে উঠে আসা তরুণ ছাত্ররা যেখানে ঘিরে রেখেছে কলেরায় আক্রান্ত মৃত্যুপথযাত্রী তাঁদের প্রিয় শিক্ষককে। "All through the sleepless, weary night and days... sharing the anxiety and fatigue of Derozio's mother and his sister Amelia." হেরে গিয়েছিলেন তাঁরা। দশ দিনের সেই জীবনপণ যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল মৃত্যু। এডওয়ার্ডসের বিবরণ পড়তে পড়তে আজও চোখ ফেটে জল আসে। এটুকু তুলে আনতে ক'টা পাতা আর খরচ হত 'জিজ্ঞাসা'র?

ডিরোজিওর মূল রচনার কিছু নমুনা মুদ্রিত হয়েছে। সামান্যই, সবই কবিতা। গদ্য কিছু আসতে পারত। আনা হয়নি। কবিতা নির্বাচনে সম্পাদকরা প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু এডওয়ার্ডসের জীবনী গ্রন্থে মুদ্রিত কবিতাগুলির বাইরে বের হননি। এডওয়ার্ডসের মুদ্রণে কিছু বিচ্যুতি ছিল। যেমন 'দি ফফির অব ডভণীরা'র 'Canto Second এর XII। উপপর্যায়টির সঙ্গে XVII উপপর্যায় মিশে গিয়ে খিচুড়ি পাকিয়ে গিয়েছিল। মূল বই না দেখার কারণে জিজ্ঞাসার পুনর্মুদ্রণে সেই খিচুড়ি থেকে গেল।

কবিতাগুচ্ছ পর্যায়ে রয়েছে ১৫টি কবিতার মূলপাঠ ও বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ করেছেন শতরূপা সান্যাল (২), তিতাস মিত্র (৩), সুতপা সেনগুপ্ত (১), বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (২), মঞ্জুভাষ মিত্র (২), দেবী রায় (১) গৌতমবুদ্ধ সুরাল (২) স্বরাজ সেনগুপ্ত (১)। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন অনুবাদ হচ্ছে 'মরা বাছুরের মূর্ত্তি'। দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ অনুবাদকই পেরোতে পারেননি রবীন্দ্রনাথের বিদূষণ রেখা। কিন্তু কেউ কেউ যে পেরেছেন তাতে সন্দেহ নেই। 'Lines to an Infant' কবিতার পরিচ্ছন্ন অনুবাদ করেছেন বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

স্বর্গ নেমেছে ধরণীর এক কোণে
বাবা-মার বুকে আনন্দ ভৈরবী;
মুক্তোজ্জ্বল সুখের বার্তাবহ
সে হাসিকে তাই স্বাগত বারবোর
তোমাকে জানাই স্বাগত, সোনার শিশু
স্বাগত তোমায় হৃদয়ের শত মুখে।

মূল পাঠ পাশেই আছে। পাঠকরা মিলিয়ে দেখতে পারবেন। তবে মূল কবিতাগুলি কোন বই থেকে নেওয়া হয়েছে জানিয়ে দিলে সৌজন্য প্রকাশ পেত, সিরিয়াস পাঠকের কৌতূহলও চরিতার্থ হত। যেমন শতরূপা সান্যাল অনূদিত দু'টি কবিতা 'Lines written at a Request of a Young Lady' ও 'The Stars' এর পাদটীকায় লেখা হয়েছে ডিরোজিওর অপ্রকাশিত কবিতা। পাঠক কী বুঝবেন? আসলে কবিতা দুটি নেওয়া হয়েছে এই অভ্যাজন ও অধীর কুমার সম্পাদিত গত বছর বইমেলায় প্রকাশিত 'Unpublished Poems of H.L.V. Derozio' বইটি থেকে। যতদূর বুঝেছি অধিকাংশ কবিতাই নেওয়া হয়েছে ১৯২৩ সালে প্রকাশিত ও ১৯৮০ সালে পুনর্মুদ্রিত ব্রাডলে বার্টের বইটি থেকে। ফলে গোড়ায় গলদ থেকে গেছে। বার্ট খোদার উপর নানারকম খোদকারি করে কবিতার শিরোদেশে ডিরোজিওর ব্যবহৃত 'ইনট্রোকোটেশন' বা পাদটীকা ঝেড়ে বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন। ডিরোজিওর মূল বই না দেখায় কর্তিত অবস্থাতেই কবিতাগুলি 'জিজ্ঞাসা'য় উঠে এসেছে। কবিরা বেহুঁস হতেই পারেন।

সম্পাদককে সাবধানী হতে হত। এ ছাড়া অনূদিত ১৫টির মধ্যে অন্তত ১১টি কবিতার অনুবাদ এর আগেই কেউ না কেউ করেছেন। অধিকাংশই ভাল অনুবাদ। সেগুলির নির্বাচিত পুনর্মুদ্রণের সঙ্গে নতুন কিছু অনুবাদ করালে মন্দ হত না।

ডিরোজিওর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী দাঁড় করানোর কাজ করেছেন উত্তরা রায় এবং ডিরোজিও পন্থীদের কর্ম ও জীবনকথা তুলে আনার দায়িত্ব পালন করেছেন অপর্ণা কুন্ডু, অসিত দে, শম্পা ভট্টাচার্য। সাধু উদ্যোগ কিন্তু সম্পাদনার শৈথিল্যে কাজ দুটি ত্রুটিমুক্ত হতে পারেনি। ডিরোজিও সম্পর্কে এখন নির্ভরযোগ্য উচ্চমানের বইয়ের অভাব নেই। ডিরোজিওর একটি শুদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখার জন্য গবেষক হবার দরকার নেই। উত্তরা রচিত ডিরোজিওর জীবনীতে জন্ম-মৃত্যুর তারিখ কই? সাল তারিখে সব ভুলের দায় 'Printer's Devil' এর উপর চাপানো যায় কি? 'ইস্ট ইন্ডিয়ান' পত্রিকার বিজ্ঞাপন বের হয়েছিল ১৮৩১ খ্রিঃ ১৬ মে। ছাপা হয়েছে '১৮৩৯ খ্রিঃ ৬ মে' (পৃ: ১৬৫)। লেখিকা শিক্ষক ডিরোজিও ও অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা ডিরোজিওর সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের তুলনা করেছেন। এই তুলনা শোভনও নয়, সঙ্গতও নয়। ডিরোজিওর তুলনা ডিরোজিও নিজে। তিনি রেনেশাঁসের অনন্য মানুষ। ডিরোজিও পন্থীদের জীবন ও কর্মকথা অংশটির বেশির ভাগ অংশই অমর দত্তের 'ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ানস' বইটি থেকে টোকা, মায় উল্লেখপঞ্জি পর্যন্ত। আপত্তির কিছু নেই। তবে স্বীকৃতি যেভাবে থাকা উচিত ছিল, নেই। শিবচন্দ্র দেব বা হরচন্দ্র ঘোষ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ অমর দত্ত নির্ভর না হয়ে কোন্নগরে এক দিন গিয়ে শিবচন্দ্র দেব স্থাপিত পাঠাগারে অবিনাশচন্দ্র ঘোষের বইটি দেখে এলে বা লোকনাথ ঘোষ রচিত 'বাবু বৃত্তান্তে' উঁকি দিলে অংশটি সমৃদ্ধ হত।

অশোককুমার রায় সংকলিত রচনাপঞ্জিটি (১৮২৬-২০০০) সত্যি অভিনব। সাল ধরে ধরে ডিরোজিপ্ত চর্চার পাথুরে নিদর্শন সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের বিস্ফারিত প্রকল্পকে ত্রুটিহীন করা দুরূহ। সব চ্যুতি ধরা বা বলা সম্ভব নয়। তিন রকম ত্রুটি দেখতে পাচ্ছি। ক) অনিবার্য কিছু গ্রন্থ বাদ পড়েছে খ) কিছু রচনা ভুল রচনাকারের নামে বা ভুল সালে বসে গেছে গ) পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার উল্লেখে গোলমাল বেশি। ক) ১৮৪০ সালে D.L. Richardson Selections from the British Poets - এ প্রথম ডিরোজিওর ৩টিকবিতা অর্ন্তভুক্ত করেন। ১৮৬১ সালে T.P. Manuel তাঁর গ্রন্থে ৪টি কবিতা ছাপেন। ১৮৭১ সালে O. Aratoon ডিরোজিওর মৃত্যুর পর প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন 'The Poetical Works of H.L.V. Derozio নামে (৭৩টি কবিতা), ১৯৭২ সালে P. Lal ২৬টি কবিতা নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশ করেন। ১৯৮৩ সালে 'বিংশতি কবিতা' নামে রমাপ্রসাদ দে ও মঞ্জুষ দাশগুপ্ত একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ২০০০ সালে S.S. Mukhopadhyay & A. Kumar এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে Unpublished Poems of H.L.V. Derozio ইত্যাদি। এগুলি রচনাপঞ্জি থেকে বাদ পড়েছে।

খ) ১৯৪৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল Amit Sen এর বইটি (১৯৫৭ নয়); ১৮৯৩ সালে Biographical Sketch of Rev. K.M. Banerjee বইটির লেখক Ramchandra Ghosha (Kristo Doss Paul নন), ১৮৩৩ সালে Derozio সম্পর্কিত লেখাটি Dr. John Grant এর (K.M. Banerjee?)।

গ) পৌনে দু'শো বছর ধরে পত্র-পত্রিকায় কোথায় কী প্রকাশিত হয়েছে তা উদ্ধার করা কঠিন কাজ। ফলে অনুচিত বিক্ষিপ্ততা ও ভ্রান্তি এসেছে। ১৮২৬ সালে ডিরোজিওর গদ্য ও কবিতার বিক্ষিপ্ত উল্লেখ কি দরকার ছিল? 'On the Abolition of Suttee' কবিতাটি ডিরোজিও লিখেছিলেন ১৮২৯ সালে সতীদাহ আইন পাশকে অভিনন্দন জানিয়ে। পঞ্জিকার ওটিকে ১৮২৬ সালের মধ্যে দেখিয়েছেন। পঞ্জির শুরুটা ডিরোজিওর প্রথম কাব্য গ্রন্থ প্রকাশ ১৮২৭ থেকে করা যেত। ১৮৩১ সালে কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জির Derozio নামে একটি লেখা নাকি Enquirer, No II, February, 1831 সংখ্যায় ছাপা হয়। কী করে হবে? Enquirer এর প্রথম সংখ্যাই সে বের হয়েছিল ১৮৩১ সালের ১৭ মে। তথাপি বলব একটু মেরামত করে নিতে পারলে এ পর্যন্ত যত রচনাপঞ্জি করা হয়েছে তার মধ্যে এটাই সেরা।

সম্পাদক স্বনামখ্যাত, 'জিজ্ঞাসা'ও বিদগ্ধ পাঠক মহলে সমাদৃত। সেই কারণেই আমাদের মতো জিজ্ঞাসুদের প্রত্যাশা একটু বেশি। ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা একটু বেশি বলা হয়ে গেল, পাঠকরা নিজ গুণে ক্ষমা করবেন। বললাম এই জন্য যে এগুলি রুখে দেওয়া যেত। এ ধরনের উচ্চমানের বিশেষ সংখ্যা রোজ রোজ হয় না। দুঃসাহসিক স্বপ্ন ছিল, সামগ্রিক পরিকল্পনা ছিল, শ্রমনিষ্ঠ সক্রিয়তা ছিল, এমনকী প্রকাশের ব্যয়ভার বহনে সম্মত মোহন গোমেসের মতো শুভানুধ্যায়ীও পাওয়া গিয়েছিল; শুধু মাত্র উপযুক্ত কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানের শৈথিল্যে প্রকল্পটি একশো ভাগ সফল হতে পারল না। তথাপি বলছি 'জিজ্ঞাসা'র এই সংখ্যা ডিরোজিও সম্পর্কিত প্রকাশনার ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক সংখ্যা। সংখ্যাটি অনুরাগী মাত্রেরই সংগ্রহযোগ্য। শুধু একটা কথা মনে হয় 'Song of the Stormy Petrel' নামে ডিরোজিও রচনাসমগ্র ও জিজ্ঞাসার এই ডিরোজিও সংখ্যা — দুটি অমূল্য প্রকাশ ঘটনাক্রমে একই সময়ে ঘটে গেল। বিশেষ সংখ্যাটির প্রকাশ একটু বিলম্বিত হলে ত্রুটিহীন ও সমৃদ্ধতর হতে পারত। ডিরোজিও সংখ্যার কোনও দ্বিতীয় সংস্করণ কি সম্ভব?

'জিজ্ঞাসা' : ডিরোজিও বিশেষ সংখ্যা, একবিংশ বর্ষ, দ্বিতীয়-তৃতীয় যুগ্ম সংখ্যা, সম্পাদক : শিবনারায়ণ রায়/কলকাতা — ৭৩/৪০.০০

চিঠিপত্র

প্রসঙ্গ : 'চৈতন্যদেব, ইতিহাস ও অবদান'

কনস্তান্তিনোপলের পতনের পর সেখানকার সুবিখ্যাত গ্রন্থাগারটিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। হতাশনের আক্রমণে বহুমূল্য পুস্তকগুলির অধিকাংশই বিনষ্ট হয়। কেবল কিছু সংখ্যক ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্প, বিজ্ঞান ও রাজনীতি বিষয়ক অতি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সেই অগ্নিবলয় থেকে উদ্ধার করেন এক গ্রিক পণ্ডিতের দল। এবং সেগুলিকে ভবিষ্যৎ বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ঝটিতি তাঁরা নিয়ে যান অন্যত্র। কনস্তান্তিনোপলের নিকটতম য়ুরোপীয় মহাদেশের অন্তর্গত যে রাজ্য তার নাম ইতালি। ধ্রুপদী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সেই গ্রন্থসম্ভার নিয়ে গ্রিক পণ্ডিতের দলটি পাড়ি দেন ইতালির পথে এবং সেখানেই আরম্ভ হয়ে যায় ধ্রুপদী সাহিত্য, শিল্প ও দর্শন চর্চার পর্ব। ইতালি দেশটিতেই যে প্রথম রেনেশাঁস অথবা পুনর্জাগরণ সম্ভব হয় তার মূলে চতুর্দশ শতকের ওই ঐতিহাসিক ঘটনা। ইতালীয় রেনেশাঁস আন্দোলন ক্রমশ তার পক্ষবিস্তার করতে থাকে য়ুরোপ মহাদেশের অন্যান্য প্রান্তেও। কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে তা য়ুরোপীয় রেনেশাঁস নামে অভিহিত হয়। সুতরাং চতুর্দশ শতক থেকেই ইংরেজি রেনেশাঁসের যাত্রা শুরু হয়নি। কথাগুলি বলার কারণ চতুরঙ্গ-এর বর্ষ ৬০ সংখ্যা ২ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৭-এ প্রকাশিত গ্রন্থসমালোচনামূলক নিবন্ধ 'একটি অসাধারণ সংকলন — চৈতন্যদেব, ইতিহাস ও অবদান'-এ সমালোচক শ্রী অনিল আচার্যের একটি উক্তি, যথা 'এই জন্যই ইংরেজি-রেনেশাঁসকে যদি ১৩০০ বছরের পরবর্তী সময় থেকে ৪০০ বছরের ইতিহাস হিসাবে ধরি'। কিন্তু 'ইংরেজি রেনেশাঁস' বলতে ইংল্যান্ডে যে রেনেশাঁস আন্দোলন হয়েছিল তাকেই তো বোঝায়। অর্থাৎ ইংলিশ রেনেশাঁস, যার সময়কাল ষোড়শ শতক। ইংল্যান্ডে তখন রানি প্রথম এলিজাবেথের রাজত্ব। পুনর্জাগরণের জোয়ারে তখন কানায় কানায় পরিপূর্ণ সেই দ্বীপভূমি। মার্লো, শেকসপিয়ার, কিড, ওয়ালটার র‍্যালে, বেন জনসন প্রমুখ প্রতিভার আবির্ভাবে যুগ পরিবর্তনের সূচনা। অতঃপর সংকলন গ্রন্থখানিতে মুদ্রিত আহমদ শরিফের প্রবন্ধ 'ইসলাম ও গৌড়ীয় মতবাদ' প্রসঙ্গে আলোচনাকালে লেখক এক স্থানে বলেছেন — একই সঙ্গে 'সুফি' মত বৈষ্ণব মতও তার জনপ্রিয়করণের ক্ষেত্রে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে কথাও (আহমদ শরিফ) বলেছেন। এখানে আমাদের মনে পড়ে কিছু মুসলমান পদকর্তার কথা, বৈষ্ণবপদাবলি রচনায় যাঁদের অবদান গৌরববর্ধনকারী। সুফি ও বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে কোনও সাদৃশ্য থাকার কারণেই হয়ত পদ রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁরা।

নমস্কারান্তে
অশোক মৈত্র
৭৭/২৩/১ বি. রোড
হাওড়া — ৬

চতুরঙ্গ পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিবরণী

১। প্রকাশস্থান — ৫৪, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা — ৭০০ ০১৩
২। প্রকাশের ব্যবধানকাল — ত্রৈমাসিক
৩। মুদ্রক — নীরা রহমান, জাতীয়তা — ভারতীয়। ঠিকানা — ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০১৩
৪। প্রকাশক — নীরা রহমান, জাতীয়তা — ভারতীয়। ঠিকানা — ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০১৩
৫। সম্পাদক — আবদুর রউফ, জাতীয়তা — ভারতীয়
৬। স্ব ত্বাধিকারীদের নাম ও ঠিকানা — নীরা রহমান। ঠিকানা — ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০১৩

আমি নীরা রহমান, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উল্লিখিত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য।

নীরা রহমান
স্বাক্ষর

দেখাসাক্ষাতের সময়

চতুরঙ্গের সম্পাদকীয় দপ্তরে প্রতি মঙ্গল, বুধ এবং শুক্রবার বিকাল চারটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত

WITH BEST COMPLIMENTS :

"TO BUILD A BETTER TOMORROW D.T.M. OFFERS A WIDE RANGE OF CIVIL ENGINEERING AND DREDGING & DISILTING SERVICES UNDER ONE ROOF"

SPECIALISED IN THE CONSTRUCTION AND ERECTION OF :—

- MATERIAL HANDLING PLANTS
- LPG BOTTLING PLANTS
- 400 KV SUBSTATION & SWITCHYARD FOUNDATION
- MULTISTORIED BUILDING
- HOUSING COMPLEXES
- BRIDGE & ROADS
- FACTORY BUILDING & SHEDS
- GAS TURBINE PROJECTS
- MANUFACTURING OF PRE-STRESSED CONCRETE POLES
- DREDGING OF LAKES, CANALS, WATER RESERVOIR & RIVER BEDS
- HEAVY EQUIPMENTS FOUNDATION

D. T. M. CONSTRUCTION (INDIA) LIMITED
CIVIL/STRUCTURAL ENGINEERS and MASTER DREDGERS

Registered Office :
59B, HOWRINGHEE ROAD, (3RD FLOOR)
CALCUTTA-700 020
PHONE : 240-3165, 240-3093
TELE FAX 240-4810

35 Years' Dedicated Service to the Nation